আত্মচরিত

ফকীরমোহন সেনাপতি

অনুবাদ

মৈত্রী শুক্ল

সাহিত্য অকাদেমি
নয়া দিল্লী

Atmacharit: An autobiography of Fakirmohan Senapati translated into Bengali by Sm. Maitri Shukla. Sahitya Akademi, New Delhi. 1957.

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্র ভবন, ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক ৫বি, কলিকাতা ৭০০ ০২৯

২১, হ্যাডোস রোড, মাদ্রাজ ৬০০ ০০৬

১৭২, নইগাঁও ক্রশ রোড, বোম্বাই ৭০০ ০১৪

শ্রীপ্রদীপ হাজরা কর্তৃক শ্রীমুদ্রণ, ৪০ শিবনারায়ণ দাস লেন হইতে মুদ্রিত ও সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী দ্বারা প্রকাশিত

এই অনুবাদ গ্রন্থটি আমার স্বর্গগতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্নেহময়ী ও পরম গুণবতী মীরা সেনাপতিকে উৎসর্গ করিলাম।

প্রণতা

মৈত্রী শুক্লা

ভূমিকা

ব্যাসকবি ফকীরমোহন সেনাপতির আত্মজীবনচরিত ওড়িয়া সাহিত্যের একটি সম্পদ। এর বাংলা অনুবাদ যাঁরা পড়বেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে এটি ভারতীয় সাহিত্যেরও একটি সম্পদ। শুনেছি লণ্ডনের অধ্যাপক বোলটন এর একটি ইংরেজি পাঠ প্রস্তুত করেছেন। সেটি প্রকাশের অপেক্ষায়। ইতিমধ্যে শ্রীমতী মৈত্রী শুক্ল ভিন্ন আরো একজন এই গ্রন্থের অন্য একটি বাংলা অনুবাদে হাত দিয়েছেন। শ্রীমান্ দিলীপকুমার বিশ্বাসের অনুবাদ আলেখ্য পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। শ্রীমতী মৈত্রীর পিতা অধ্যাপক মোহিনীমোহন সেনাপতি ছিলেন কটক রেভ্‌ন্‌শ কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ। তাঁর কাছে আমাকে পড়তে হয় নি, তবে লক্ষ্য করেছি তিনি ছিলেন দার্শনিকের মতোই সদাগম্ভীর, সর্বদা চিন্তাশীল। আর শ্রীমান দিলীপের মাতামহ বিশ্বনাথ কর মহাশয় ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ 'উৎকল সাহিত্য' মাসিক-পত্রের স্বনামধন্য সম্পাদক। কলেজের ছাত্রদের তিনি উৎসাহ দিয়ে কাছে টেনে নিতেন। কিন্তু তাঁর সম্পাদনার মান ছিল বরাবরই উচ্চ। তাঁর মাসিকপত্রে সম্মানের স্থান তিনি একটি অখ্যাত তরুণকে বার বার দিয়েছিলেন ও আবার দিতেন, যদি না সে ওড়িয়ায় লেখা একেবারেই ছেড়ে দিত। কমলীকে সে ছাড়লেও কমলী কিন্তু তাকে ছাড়ে নি। মৈত্রীর এই বাংলা অনুবাদ তাকে আগাগোড়া পড়তে হয়েছে, মাঝে মাঝে পাদটীকা লিখে দিতে হয়েছে ও এখন ভূমিকা লিখতে হচ্ছে। সমস্তটা আনন্দের সঙ্গে।

আনন্দের কারণ একাধিক। ফকীরমোহনের বাড়ি বালেশ্বরে। ওড়িশায় জমিদারি লাভ করার পর থেকে আমার পূর্বপুরুষদেরও বসবাস বালেশ্বর জেলায়। ফকীরমোহনের অন্যতম কর্মস্থান ঢেঙ্কানাল রাজ্য। আমার বাবারও কর্মস্থান ঢেঙ্কানাল। সেখানেই আমার জন্ম। কিন্তু আমার বাবা যখন ঢেঙ্কানালে আসেন তার পনেরো-ষোলো বছর

আগেই ফকীরমোহন সেখান থেকে বিদায় নেন। আমার ছেলেবেলায় কেউ আমাকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। কোন্ বাসায় তিনি থাকতেন কেউ আমাকে দেখিয়ে দেয় নি। শুধু আমি নয়, তখনকার দিনের শিক্ষিত মহলের কেউ কি তখন জানতেন যে রাধানাথ রায় ও মধুস্দন রাওয়ের মতো ফকীরমোহন সেনাপতিও ওড়িয়া সাহিত্যের অন্ততম দিক্‌পাল? এটা জানা গেল তাঁর মৃত্যুর ঈষৎ পূর্বে, যখন তিনি সপ্ততি বর্ষ অতিক্রম করেছেন। মহাপ্রয়াণের পরে তাঁর খ্যাতি ক্রমেই বাড়তে থাকে।বিশেষত তাঁর আত্মজীবনচরিত প্রকাশিত হবার পরে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায় ভক্তকবি মধুস্দন রাওয়ের উপরে তো নিশ্চয়ই, কারো কারো মতে কবিবর রাধানাথ রায়েরও ঊর্ধ্বে। গদ্যের বেলা এটা সর্বাংশে সত্য। কিন্তু পদ্যের বেলা বিতর্কসাপেক্ষ। এমন গদ্য ওড়িয়া ভাষায় কেউ কখনো লেখেন নি। চেষ্টা করলেও পারবেন না। ফকীরমোহন অদ্বিতীয় ও অনমুকরণীয়। আর সেইজন্যেই তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প ও আত্মজীবনচরিত অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তার অর্ধেক রসই তো তাঁর জোরালো, ধারালো, অকৃত্রিম, লোক-ভাষায়। যে ভাষা বিদ্যালয়ে শেখায় না। বরং বিদ্যালয়ে গেলে সে ভাষা ভুলে যেতে হয়। ফকীরমোহনের বহু ভাগ্য তিনি বিদ্যালয়ে বেশিদিন পড়েন নি। অর্থাভাবে ও ঘটনাচক্রে তাঁর পড়াশুনা প্রায় পনেরো-আনাই প্রাইভেট। তেইশ বছর বয়সে তিনি ইংরেজি শিখতে শুরু করেন। তার আগে সংস্কৃত। আরো আগে বাংলা। আরো আগে ফারসী। ওড়িয়ার পর বাংলার উপরেই ছিল তাঁর দখল। কিন্তু তাঁর গদ্যে বাংলার ছাপ অদৃশ্য। বরং ফারসীর ছাপ লক্ষণীয়।

শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা করে আর নিজস্ব প্রেস চালিয়ে ফকীরমোহন বালেশ্বরে বসেই জীবিকানির্বাহ করতে পারতেন। তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হত কটকযাত্রা। সেখানেও একই পন্থা অথচ বৃহত্তর পরিসর। কিন্তু সাতাশ-আটাশ বছর বয়সে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। জন বীম্‌সের আগ্রহে ও অনুগ্রহে তিনি হন নীলগিরি রাজ্যের দেওয়ান। ওই রকম ছোট বড় চব্বিশটি রাজ্য মিলে ওড়িশার গড়জাত অঞ্চল। আয়তনে বা লোকসংখ্যায় এক-একটি জেলা বা

মহকুমা বা তহশিলের সমান। সেকালে যাঁরা গড়জাতের হাকিম হতেন তাঁরা এমন এক মর্যাদা পেতেন যা ব্রিটিশ এলাকায় তাঁদের ভাগ্যে অত সহজে জুটত না। রাজার পরেই দেওয়ান। ফকীরমোহন 'না' বলেন কি করে? তবে রাজারাজড়ার মন জুগিয়ে চলা তাঁর মতো স্বাধীনচেতা ব্যক্তির কর্ম নয়। এক রাজার রাজ্য থেকে আরেক রাজার রাজ্যে যান। এক জমিদারের জমিদারি থেকে আরেক জমিদারের জমিদারিতে। তাঁরাও 'রাজা'। তাঁদের রাজধানীকেও বলা হত গড়। ফকীরমোহন এইভাবে জীবনের চব্বিশ-পঁচিশ বছর হাকিমী করে কাটিয়ে দেন। কিছুদিন রাজকর্ম ছেড়ে ব্যবসাও করেন। সেই উপলক্ষ্যে কটকবাস। কটক ছিল ওড়িশা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র। 'উৎকল সাহিত্য' প্রকাশিত হত সেইখান থেকে। সম্পাদক বিশ্বনাথ করও ছিলেন ব্রাহ্ম। কবিবন্ধু মধুসূদন রাও ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যমণি।

জীবনের শেষ বিশ-একুশ বছর ফকীরমোহন বালেশ্বরবাসী। ততদিনে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। পুত্রকন্যা অন্যত্র। তাঁর সেই নিঃসঙ্গ জীবনের নিত্য সাথী হয় তাঁর সাহিত্যকর্ম। তাঁর গল্প, উপন্যাস ও আত্মজীবনচরিত শেষ বয়সেই লেখা। এর আগে তিনি যা লিখেছেন তা দারুণ ব্যস্ততার মাঝখানে। তাই দিয়ে বিচার করলে সাহিত্যে তাঁর স্থান তেমন উচ্চে নয়। যেদিন থেকে তিনি হলেন সারা সময়ের লেখক সেইদিন থেকেই তাঁর সত্যিকার সৃষ্টি। তবে শরীর অসমর্থ বলে নিয়মিত খাটতে পারতেন না। তাই লেখার পরিমাণ খুব বেশি নয়। এই যে আত্মজীবনচরিত এর আরম্ভ সত্তর বছর বয়সে। যখন তিনি নানা রোগে কাতর। সবকিছু যে তাঁর ঠিক-ঠিক স্মরণ ছিল তা বিশ্বাস করা শক্ত। নিশ্চয়ই কল্পনার খাদ মেশাতে হয়েছে। আপনার দুষ্কর্ম তিনি গোপন করেন নি, লঘুও করেন নি, তার জন্য অনুশোচনা করেছেন। এতে তাঁর মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে। অপরাধীর অকপট স্বীকারোক্তি বিচারকের সহানুভূতি লাভ করে। পাঠকরাও ক্ষমাশীল।

বলা বাহুল্য, যে ওড়িশার পটভূমিকায় তাঁর জীবনচর্যা সে ওড়িশা আর নেই। ষাট বছর আগেও ছিল না। ঢেঙ্কানালে আমি তাঁর বর্ণিত যুগের রেশ পাই নি। রাজপরিবারের কর্মচারী ব্রাহ্মণ অথচ তার

পদবী খানসামা। কই এমন কাউকে তো দেখি নি। খানসামা তো মুসলমানরাই হয়। আর ঢেঙ্কানালের রাজবংশ তো আচারনিষ্ঠ হিন্দু। তা হলে কি ওটা ফকীরমোহনের ভ্রম। না, ওটা সাধারণের ভ্রম। মোগল সম্রাটদের গৃহস্থালী দেখাশুনার জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকতেন। তাঁকে বলা হত খান্-ই-সামান্। ইংরেজ রাজাদের যেমন লর্ড চেম্বারলেন। সেই সম্মানিত পুরুষ স্বহস্তে আহার্য পরিবেশন করতেন না। ভৃত্যদের দিয়ে করাতেন। কালক্রমে মোগল বাদশাহদের খান্-ই-সামান্ হয়েছে বিলাতী সাহেবদের খানসামা। তবে ঢেঙ্কানালের রাজপরিবার এটা ব্রিটিশ আমলে সাহেবদের কাছে শেখেন নি। শিখেছেন আরো আগে। এর আদি অর্থে। ব্রাহ্মণ যুবকটির পিতা পিতামহ হয়তো রাজার চেম্বারলেনের কাজ করতেন। পদবীটা সেই সূত্রে কৌলিক পদবী হয়ে দাঁড়ায়। ফকীরমোহন যাকে দেখেছেন সে পদবীটাই ভোগ করত, যে-কাজের জন্য পদবী সে-কাজ করত না।

গড়জাতের উপরেও ফারসী সরকারী ভাষার প্রভাব পড়েছিল 'খানসামা' তার সাক্ষী। ফারসী যতদিন সরকারী ভাষা ছিল ততদিন ওড়িয়া বাঙালীর সদ্ভাব অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু ইংরেজি যখন সরকারী ভাষা হল তখন ইংরেজি শিক্ষায় প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অগ্রণী বাঙালী অনায়াসেই দেশীলোকদের জন্যে খোলা পদগুলি দখল করে নিল। প্রেসিডেন্সীর নাম বেঙ্গল। সুতরাং ওদেরও তো স্বদেশ। তা বলে ওড়িয়া ভাষাকেও কি বাংলার থেকে স্বতন্ত্র নয় বলে বিদ্যালয় থেকে বিদায় করতে হবে? বাংলা ভাষায় লেখাপড়া শিখে বাঙালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাকরির দৌড়ে জেতা কি সম্ভব? ফকীরমোহন দেখলেন ওড়িশা তথা ওড়িয়া উভয়েরই বিপদ। তিনিও যোগ দিলেন আন্দোলনে। ওড়িয়া ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে ছাড়লেন। বাকী রইল উৎকল একীকরণ ও স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দায়। সে দায় বহন করলেন মধুসূদন দাস, বিশ্বনাথ কর, গোপবন্ধু দাস ও আরো অনেকে। সে স্বপ্নও সফল হল, কিন্তু ফকীরমোহনের মৃত্যুর পরে। মধুবাবু, বিশ্বনাথবাবু ও গোপবন্ধু বাবুও ততদিন জীবিত ছিলেন না। যেসব

বাঙালী পরিবার মোগল আমল থেকে ওড়িশাবাসী তাঁদের সহানুভূতি বরাবরই ছিল ওড়িয়াদের পক্ষে। ভাষাঘটিত আন্দোলনের একদিকের নেতা যেমন কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য অপরদিকের নেতা তেমনি গৌরীশঙ্কর রায়। আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। তাঁর ভাই রামশঙ্কর ছিলেন ওড়িয়া ভাষার নাট্যকার তথা ঔপন্যাসিক। উমেশচন্দ্র দত্তের 'পদ্মমালী' ছিল প্রথম ওড়িয়া উপন্যাস। রাধানাথ রায় তো কারো কারো মতে মহাকবি।

কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যিক সেকালে ওড়িশায় বসে সেতুবন্ধনের কাজ করছিলেন। তাঁদের একজন হলেন স্বনামধন্য বিজয়-চন্দ্র মজুমদার। ইনি ভক্তকবি মধুসূদন রাওয়ের কন্যা বাসন্তী দেবীকে বিবাহ করেন। এই নিয়ে একটু কৌতুক করেছিলেন ফকীরমোহন। একটি ব্যক্তিনামাঙ্কিত পদ্যে। এ ধরনের লঘু কবিতায় তাঁর হাত ছিল পাকা। বাঙালী ওড়িয়ার বিবাহের ফলে যেসব সন্তান জন্মাবে তাদের ভাষা কী হবে? এই নিয়ে তাঁর কটাক্ষ। তখন কি তিনি জানতেন যে তাঁর পুত্রবধূ হবেন এক বাঙালীর মেয়ে ও তাঁর জরাজীর্ণ অবস্থায় তিনিই হবেন তাঁর রোগশয্যার সেবিকা? আর এই যে তাঁর নাতনি মৈত্রী তাঁর আত্মজীবনী অনুবাদ করে তাঁকে বাংলাদেশের পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছে এও তো সেই কৌতুক গল্পের লক্ষ্য। ওড়িশার ব্রাহ্ম ও খ্রীস্টানরা পুত্রকন্যার বিবাহের সময় ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। মধুসূদন রাওয়ের পুত্রকন্যার বিবাহ হয় শিবনাথ শাস্ত্রী ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখের পরিবারে। বিশ্বনাথ করের পুত্রকন্যার বিবাহও সেইরূপ বাঙালী পরিবারে। এঁরা ব্রাহ্মসমাজের নেতা। খ্রীস্টান সমাজের নেতা মধুসূদন দাসের বন্ধু ছিলেন হাজরা বলে এক বাঙালী খ্রীস্টান ভদ্রলোক। তাঁর দুই কন্যা শৈলবালা ও সুধাংশুবালাকে মধুবাবু পালন করেন। শৈলবালাকে তো তিনি দত্তক নেন ও সম্পত্তি দিয়ে যান। একবার মধুবাবু পাটনার বাড়িতে যাঁদের ডেকেছিলেন তাঁরা ওড়িশার ছাত্র। তাঁদের দলে আমিও ছিলাম। সারাক্ষণ তিনি বাংলায় কথা বললেন। আর ছাত্ররা কথা বলল ওড়িয়ায়। এরা কি তাঁর চেয়ে খাঁটি দেশপ্রেমিক বা ভাষানুরাগী?

ফকীরমোহনের জীবনের একটা দিককেই ফলাও করে দেখানো হচ্ছে। তাঁর খেটো খাঁটি ওড়িয়া দিক। এই খাঁটিত্বের মর্ম আমি বুঝি নে, যখন মনে রাখি যে তাঁর আসল নামটাই ছিল ব্রজমোহন, মুসলমান পীরদের কৃপায় প্রাণরক্ষা হওয়ায় তাঁর ঠাকুমা তাঁর নাম বদলে দিয়ে রাখেন ফকীরমোহন। ওড়িয়াদের মুখে মুসলমানী বাংলা 'পালা' আমি শুনেছি। মুসলমানী ওড়িয়া নাটকের কথা আমি জানি, কিন্তু পড়ে দেখি নি। ফকীরমোহন একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন, একজন খাঁটি সাহিত্যিক, একজন খাঁটি ধার্মিক। সবার উপরে এটাই সত্য।

ফকীরমোহনকে চিনতে হলে তাঁর দেশের ও তাঁর কালের সঙ্গেও পরিচিত হতে হয়। আত্মজীবনচরিতে এমন অনেক কথা আছে যা তিনি না লিখলে আমরা কেউ কোনোদিন জানতে পেতুম না। কিন্তু এমন অনেক কথা নেই যা আমাদের সকলের জানা উচিত। যেমন প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যের অনুরাগীদের সঙ্গে আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের পক্ষপাতীদের দ্বন্দ্ব। 'ইন্দ্রধনু' আর 'বিজুলি' বলে দুটি পত্রিকা ছিল। একটি প্রাচীনপন্থীদের মুখপত্র, অন্যটি আধুনিকপন্থীদের। একপক্ষের মতে উপেন্দ্র ভঞ্জই ওড়িয়া কাব্যের চরম উৎকর্ষ। তাঁর সঙ্গে রাধানাথের তুলনা! অপরপক্ষের মতে রাধানাথই এ যুগের বাণীমূর্তি। উপেন্দ্র ভঞ্জ কি একালের মানুষের কথা একালের মানুষের ভাষায় বলেছেন! তর্কটা পরিণত হয় শ্লীলতা বনাম অশ্লীলতায়। আধুনিক-পন্থীরা অশ্লীলতা সহ্য করতে পারেন না। দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হলেও তাঁরা তেমনি পিউরিটান। 'ইন্দ্রধনু' আর 'বিজুলি' এই দুটি শিবিরের মধ্যে কোন্‌টিতে ছিলেন ফকীরমোহন? আমি ঠিক জানি নে। শুধু অনুমান করতে পারি যে তিনি ছিলেন রাধানাথের দলে। তিনি ভঞ্জীয় রীতিতে লিখতেন না। তাঁর রীতি রাধানাথ রায় ও মধুসূদন রাওয়ের অনুরূপ। অথচ প্রাচীন সাহিত্যের উপর তাঁর টান না থাকলে তিনি দীনকৃষ্ণ দাসের 'রসকল্লোল' ছাপতে চাইতেন কেন?

ওড়িয়া সাহিত্যের রেনেসাঁস বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁসের মতোই প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে আধুনিকপন্থীদের দ্বন্দ্বমূলক ছিল। সেই দ্বন্দ্বে রাধানাথ, মধুসূদন, ফকীরমোহন প্রমুখ রেনেসাঁস নেতারা প্রাচীনকে

অস্বীকার না করলেও আধুনিককেই বরণ করেন। সংস্কৃত বা প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্য তাঁদের যত না সাহায্য করে তার চেয়ে বেশি করে ইংরেজি তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্য। দেশের বা প্রদেশের বাইরে না তাকালে আধুনিক হওয়া সম্ভব ছিল না। আর রেনেসাঁস তো নব-নবোন্মেষ। যেখানে নবনবোন্মেষ নেই সেখানে নেই রেনেসাঁস। ওড়িয়াদের মনঃস্থির করতে সময় লেগেছে তাঁরা কোন্ পথে যাবেন। তাঁদের পক্ষে মনঃস্থির করা আরো কঠিন হত, যদি না তাঁদের সামনে থাকত বাঙালীদের দৃষ্টান্ত। যদি না বিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হত, যদি না বাঙালীরা ইংরেজি পড়তেন, যদি না ব্রাহ্মসমাজ শাখাপ্রশাখা মেলত, যদি না মিশন স্কুলগুলি ছাত্রদের টানত। আর যদি না কটক শহরে রেভ্‌নশ কলেজের পত্তন হত। বলা বাহুল্য, বিলম্বের বড় একটা কারণ ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি মোগলবন্দী ছিল মারাঠাদের অধিকারে আর ওড়িশার অর্ধেক তো ব্রিটিশ আমলেও দেশীয় রাজ্য।

রেনেসাঁসের অধিনায়কদের মধ্যে ফকীরমোহন শ্রেষ্ঠ কি না বিতর্কসাপেক্ষ। কিন্তু জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা তাঁর গল্পে উপন্যাসে যেমন প্রকট তেমন আর কারো সৃষ্টিতে নয়। সেইখানেই তাঁর অদ্বিতীয়তা।

অন্নদাশঙ্কর রায়-

ফকীরমোহন সেনাপতি

জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

১৮৪৩	জানুয়ারি ; মকরসংক্রান্তি দিবস
১৮৫২	বিদ্যারম্ভ
১৯৫৬	প্রথম বিবাহ
১৮৬২-৬৪	বারবাটি স্কুলে অধ্যয়ন ও শিক্ষকতা
১৮৬৪-৭১	বালেশ্বর মিশনরী স্কুলে কর্ম
১৮৬৫-৬৬	ইংরেজি শিক্ষার ইচ্ছা ও শিক্ষারম্ভ
১৮৬৬	ওড়িশা দুর্ভিক্ষ
১৮৬৭	পিতামহীর মৃত্যু
১৮৬৮	বালেশ্বর প্রেস স্থাপন
১৮৭১	দ্বিতীয় বিবাহ
১৮৭১-৭৫	বালগিরিতে দেওয়ানি
১৮৭৬-৭৭	ডোমপাড়ায় দেওয়ানি
১৮৭৭-৮৩	ঢেঙ্কানালে অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজারি
১৮৮৪-৮৬	দশপল্লায় দেওয়ানি
১৮৮৬-৮৭	পাললহড়ায় দেওয়ানি
১৮৮৭-৯২	কেওনঝরে ম্যানেজারি
১৮৯২	কেওনঝরে প্রজাবিদ্রোহ
১৮৯৪-৯৬	ডোমপাড়ায় দ্বিতীয়বার দেওয়ানি
১৮৯৬-১৯০৫	কটকে অবস্থান
১৯০৫-১৮	বালেশ্বর নিবাস
১৯১৮	জুন ১৮, মৃত্যু

ফকীরমোহনের হস্তাক্ষর

বংশ পরিচয়

কটক জেলায় কেন্দ্রাপড়া মহকুমার অন্তর্গত কুশিন্দা নামক গ্রামে এক ক্ষমতাপন্ন খণ্ডায়েত বংশের অধীনে একটি চৌপাঢ়ী[১] ছিল। সেই খণ্ডায়েত বংশ উৎকলের পূর্বতন স্বাধীন রাজাপ্রদত্ত বহু পরিমাণ ভূসম্পত্তি সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভোগ দখল করছিলেন। উৎকলে মহারাষ্ট্র অধিকারের সময় এই সম্পত্তি ছারখার হয়ে যাবার কথা শোনা যায়।

মহারাষ্ট্র রাজত্বের সময় উক্ত খণ্ডায়েত বংশের হনুমল্ল নামক এক যুবক মহারাষ্ট্র সেনাপতির অধীনে পাইক[২] পদে নিযুক্ত হয়ে প্রথমে বালেশ্বরে আসেন। পাঠান সেনাদের অগ্রসর হওয়ায় বাধা দেবার উদ্দেশ্যে ফলবার[৩] ঘাটে পাহারাদার হয়ে থাকা তাঁর কাজ ছিল। তিনি আপন কার্যে বেতনস্বরূপ পঁয়তাল্লিশ বাটি[৪] ভূমি নিষ্কর হিসাবে পেয়েছিলেন। দলপতি হনুমল্লের অধীনে অনেক পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত ছিল। তাদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সামরিক বৃত্তি হিসাবে নিষ্কর জমি দান করা হয়। গত ১২৫০ সালে প্রথম বন্দোবস্তের সময় অবধি পাইক বংশধরেরা নির্বিবাদে এই জমি ভোগ দখল করে আসছিলেন। তখনকার বন্দোবস্তের সময় কতক পাইক বংশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যারা দলিল দেখাতে পারল তাদের জমি মজুত রইল। দলিলহীন পাইকদের দখলি জমি নিম্পি[৫] বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

হনুমল্লের মারাঠাদত্ত উপাধি ছিল সেনাপতি। তাঁর অযোগ্য বংশধরগণ আপন বংশ পদবী পরিত্যাগ করে ভূমিশূন্য সেনাশূন্য হয়ে সেনাপতি উপাধি

১ চতুষ্পাঠী হতে চৌপাঢ়ী। তিনদিক বন্ধ একদিক খোলা দালান ঘর। সেখানে শাস্ত্র আলোচনা, শাসনকার্য পরিচালনা প্রভৃতি হত।

২ পদাতিক হতে পাইক, উচ্চারণ পাইক-অ।

৩ বালেশ্বর হতে দুই মাইল দূরে।

৪ জমির মাপ ১ বাটি অর্থে বাট বিঘা।

৫ জমির স্বত্ব, ইংরাজ সরকার ক্ষমতাবলে জমি বাজেয়াপ্ত করে অর্ধেক খাজনা ধার্য করে।

উপভোগ করে আসছেন। কেবল পিতৃশ্রাদ্ধ কিংবা সেইরূপ কোন ধর্মানুষ্ঠানের সময় মল্ল পদবীর উল্লেখ করা হয় মাত্র।

এই বংশের মারাঠাদত্ত জায়গীর জমির অধিকারচ্যুত হওয়ার মধ্যে নিহিত আছে একটি রহস্যজনক ঘটনা। মহামান্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বালেশ্বর অধিকার কালে (সন ১৮০৩ খ্রীঃ অঃ) লেখকের পিতামহী কুচিলা দেবী ছিলেন যুবতী বিধবা ও ক্রোড়ে তাঁর চার ও দুই বর্ষ বয়ঃক্রমের দুটি শিশু সন্তান।

ঠাকুরমা গল্প করতেন, কোম্পানির ফৌজ দক্ষিণ ও পূর্ব দুই দিক হতে বালেশ্বরে এসেছিল। নদী-মোহনায় অবস্থিত বালেশ্বরের পূর্বাঞ্চল বলরাম গড় নামক স্থানে ফৌজগণের উপস্থিতি সংবাদ শোনা মাত্র গ্রামবাসীরা প্রাণভয়ে ঘরদোর পরিত্যাগ করে কেবল স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বনের মধ্যে পালিয়ে যায়। অল্পদিনের মধ্যে দেশে শান্তি স্থাপিত হয়। কোম্পানি বাহাদুরের অভয় বাণী ঘোষণা শুনে গ্রামবাসীরা আপন আপন গৃহে ফিরে আসে। অনেকে এমন ত্রস্তভাবে পালিয়ে গিয়েছিল যে নিজগৃহের কপাটটি অবধি ভেজিয়ে দেবার সময় পায় নি। লোকে গৃহে ফিরে এসে দেখে নিজ নিজ সবজি বাগানে ফল পক্ক অবস্থায় তলায় পড়ে আছে। সকলে আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, জিনিস চুরি করার চোর কোথায়।

লেখক বাল্যকালে প্রত্যক্ষদর্শী অতিবৃদ্ধ গ্রামবাসীদের মুখে শুনেছে মারাঠা রাজত্বের অবসান সময় দেশে এমন অরাজকতা শুরু হয়েছিল যে চোর ডাকাত, নাগা সন্ন্যাসীদের উপদ্রবে সোনা, রূপা এমনকি কাঁসা পিতলের দ্রব্য অবধি লোকে নিজ নিজ গৃহে প্রকাশ্যভাবে রাখার সাহস করত না। লোক সাধারণ নিতান্ত দরিদ্র ও ভয়াকুল ছিল। সে সময়ের তুলনায় বর্তমানে আমরা স্বর্গরাজ্যে বাস করছি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সুশাসন ওড়িশা অর্থাৎ বালেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক মাস পরে সরকার বাহাদুর দেশের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন 'মারাঠা রাজত্বের সময় যার যেরূপ জমির স্বত্ব অধিকার ছিল ঠিক সেইরূপ থাকবে কারো সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা হবে না। স্বত্বাধিকারীরা নির্ধারিত দিনে আপন আপন সনন্দ নিয়ে কাছারিতে উপস্থিত হয়ে কলেক্টর সাহেবের সম্মুখে নাম লিখিয়ে যাবে।' রাজকীয় ঘোষণার মর্ম বুঝতে না পেরে অথবা বিপদের আশঙ্কা করে

অধিকাংশ স্বত্বাধিকারী কাছারিতে উপস্থিত হলেন না। ফলে তাঁদের উপস্থিত করাবার জন্য পরওয়ানা নিয়ে কাছারির পেয়াদারা বেরিয়ে পড়েন। এমনি একজন পেয়াদা পরওয়ানা নিয়ে আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হল। সে সময় ঠাকুরমা ছিলেন অল্পবয়স্কা বিধবা। সরকারি পেয়াদাকে উপস্থিত দেখে ঠাকুরমা গ্রামবাসীদের শরণাপন্ন হলেন। নির্বোধ গ্রামবাসীদের মতে স্থির হল মারাঠা পক্ষের লোকেদের মেরে ফেলবার জন্য কোম্পানি ডেকে পাঠিয়েছে। ঠাকুরমা ত্রস্তভাবে সন্তান দুটিকে গৃহকোণে শুইয়ে মাদুর দিয়ে ঢেকে দিলেন ও কপাটের ফাঁক হতে জবাব দিলেন, 'এ গৃহে পুরুষ ছেলে কেউ নেই, জমিতে আমাদের প্রয়োজন নেই।' উপস্থিত গ্রামবাসীরা ঠাকুরমার উক্তি সমর্থন করায় পেয়াদা ফিরে গেল ও আমাদের বংশের জায়গীর জমি বিলুপ্ত হল।

পূর্বোক্ত হনুমল্লর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিম্নোক্ত বংশ তালিকা হতে অনুমিত হবে।
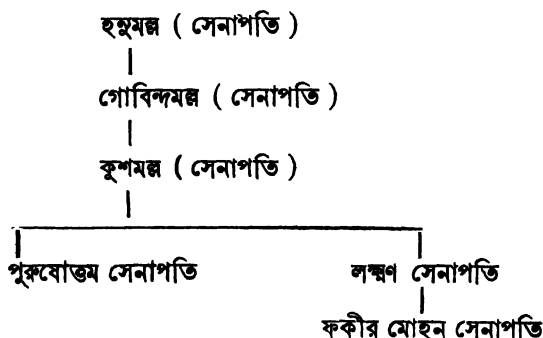
শৈশবের কথা

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ জানুয়ারি মাসে অথবা ১২৫০ সাল মকর সংক্রান্তি শুক্রবার দিন বালেশ্বর শহরের অন্তর্গত মল্লিকাশপুর নামক গ্রামে আমার জন্ম হয়। মাতার নাম তুলসী দেঈ[1] পিতার নাম লক্ষ্মণচরণ সেনাপতি। জ্যোতিষীরা আমার জন্ম পত্রিকা এইরূপ করেছেন :
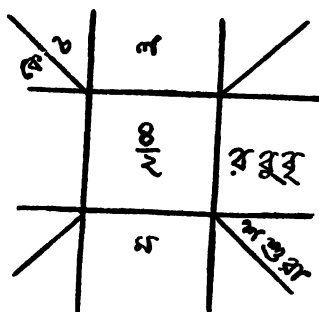
শুনেছি জন্ম হওয়া মাত্র আমার বাম কর্ণের উপরিভাগ বিদ্ধ করে একটি সোনার মাকড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার বড়ভাই চৈতন্যচরণ আমার জন্মের পূর্বে পরলোক গমন করে। লোকের সংস্কার ছিল জ্যেষ্ঠপুত্র মারা গেলে তার পরেরটি জন্মান মাত্র তার কান বিঁধিয়ে দিলে যম তাকে অগ্রাহ্য করে গ্রহণ করে না। বাল্যকালে আমি এ প্রকার শত শত কান বেঁধানো দেখেছি।

আমার একবছর পাঁচ মাস বয়সের সময় পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দেখতে পুরী যাত্রা করেন, উল্টোরথের সময় ভুবনেশ্বরে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন। সঙ্গী যাত্রী ছিলেন গ্রামের কতক লোক ও তাঁর জননী (আমার ঠাকুরমা)। ঠাকুরমার কাছে শুনেছি ভুবনেশ্বর মন্দির সমীপস্থ বিন্দুসাগর পুষ্করিণীর পাথরের ঘাটের উপর পিতা প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর পরলোকগমনের সংবাদ শুনে গ্রামের লোক কাঁদতে লাগল। বাবার একটি পোষা কুকুর ছিল, সেও সকলের সঙ্গে মিলে আর্তনাদ করতে লাগল। লোকে শাস্ত

১ দেবী শব্দের অপভ্রংশ দেঈ। ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ানীয়া দেবী। অন্যান্যরা দেঈ।

হল কিন্তু সে নিবৃত্ত হল না। পিতা যে যে স্থানে যেতেন ও গাঁয়ের যেখানে যেখানে বসতেন সেই স্থানগুলিতে বারংবার গিয়ে আঘ্রাণ নিয়ে আসত, আট-দিন অবধি অনাহারে থেকে সে মরে গেল।

পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে মা সেই যে শয্যা গ্রহণ করলেন সে শয্যা আর ত্যাগ করেন নি। চৌদ্দ মাস অবধি শারীরিক ও মানসিক ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করে ১২৫২ সাল ভাদ্র মাসের শুক্ল অষ্টমীর দিন তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

সেইদিন হতে আমি নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়লাম। আমার সমবয়স্ক সহায় সম্পন্ন, বহু পরিমাণে সুস্থ শরীর, বলিষ্ঠ ও সৌভাগ্যবান অনেক পুরুষ পৃথিবী ত্যাগ করে চলে গেছেন অথচ মাতৃপিতৃহীন চিররোগী আমি, জীবনে' নানারকম ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল অবস্থা অতিক্রম করে সম্প্রতি জরাজীর্ণ দুর্বল হাতে আমার দীর্ঘ জীবনের অসার চরিত লিখতে বসেছি। এ কার আদেশ, কার অনুগ্রহ ও সহায়তা? একটি ক্ষুদ্রতম দুর্বাদলের সৃষ্টিও উদ্দেশ্যবিহীন নয়। কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিধাতা আমাকে এতকাল জীবিত রেখেছেন?

পিতা-মাতার বিয়োগের পর যেন প্রভুর আদেশে পিতামহী কুচিলাদেঈ আমাকে কোলে তুলে নিলেন। দেশে প্রবাদ আছে 'পালে ত বাপের মা পালে ত মায়ের মা।' আমার জীবনরক্ষার জন্য ঠাকুরমা যে কত প্রয়াস করেছেন, কি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, বর্ত্তমানে ছায়ার ন্যায় সে সব কথা আমার মনে উদিত হলে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। হায়, সে উপকারের আমি কিছুই প্রতিদান দিতে পারিনি।

জননীর পরলোকগমনের পর সাত-আট বছর বয়স অবধি গ্রহণী, অর্শ ইত্যাদি যন্ত্রণাদায়ক রোগে শয্যাগত হয়ে থাকতাম। ঠাকুরমা দিবানিশি আমার শয্যা-পার্শ্বে জেগে বসে থাকতেন। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কতকাল এইভাবে অতিবাহিত হয়েছে। অনিদ্রা অনাহারে ঠাকুরমার সে সময় কত দিবানিশি কেটে গেছে। মৃত্যু যেন আমার একটি হাত ও ঠাকুরমা অন্য হাত ধরে টানছিলেন। অবশেষে ঠাকুরমা জয়ী হলেন এবং আমি নিরাময় হতে আরম্ভ করলাম।

আমার পীড়ার সময় ঠাকুরমা করজোড়ে সকল দেবদেবীর কাছে আমার জীবন ভিক্ষা করছিলেন। বালেশ্বরে দুজন পীর ছিলেন। অবশেষে ঠাকুরমা সেই দুই পীরের শরণ নিলেন। তাদের কাছে তিনি মানত করলেন, 'আমার বাছা ব্রজ ভাল হয়ে গেলে আমি তাকে তোমাদের ফকীর বা গোলাম করে দেব।' প্রথমে

আমার নাম রাখা হয়েছিল ব্রজমোহন। পীরদের মনস্তুষ্টির জন্য ঠাকুরমা আমার এই মুসলমানী নাম রেখেছিলেন। কিন্তু ঠাকুরমা সর্বস্ব ত্যাগ করে আমাকে পীরদের হাতে তুলে দিতে পারলেন না। কেবল প্রতিবছর মহরমের সময় আটদিনের জন্য আমাকে ফকীর করে দিতেন। সেই কটা দিন আমি ফকীরের পোষাক পরে থাকতাম, হাঁটু অবধি একটি জাঙ্গিয়া দেহে হরেক রঙের কাপড়ের তৈরি একটি আচকান, মাথায় ফকীরি টুপি, কাঁধে নানা রঙের একটি ঝোলা এবং হাতে গালার প্রলেপ দেওয়া লাল রঙের একটি লাঠি। সেই পোষাক পরে মুখময় খড়ির গুঁড়ো মেখে সকালে বিকেলে গ্রামের মধ্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে ফিরি, সন্ধ্যার সময় সেই ভিক্ষালব্ধ সমস্ত চাল বিক্রী করে যা পয়সা পেতাম পীরদের সিন্নির জন্য সে সমস্ত পাঠিয়ে দেওয়া হত।

বিদ্যারম্ভ

পাঠশালার শিক্ষা আরম্ভের সময় আমার বয়স ছিল প্রায় নয়। শহরের মধ্যে প্রত্যেক বড় গ্রামে একটি ও গ্রাম ছোট হলে দুই তিনটি গ্রাম নিয়ে একটি করে পাঠশালা ছিল। সচ্ছল অবস্থার লোকের গৃহে স্বতন্ত্রভাবে এক একজন অবধান[১] নিযুক্ত ছিলেন। গ্রামের বাউরি, কণ্ডরা প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির ছেলেপুলেরাও কিছুদূরে বসে উচ্চবর্ণের সন্তানদের সঙ্গে পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করত।

যে সময় কটক জেলার বিশেষত কটক জেলার অন্তর্গত ঝঙ্কড় পরগণার অবধানরা বালেশ্বর জেলায় আসতেন। চৈত্র মাসটা শিক্ষক আমদানির সময়। বেশভূষা হতে শিক্ষকতার কর্মপ্রার্থী বলে পরিচয় পাওয়া যেত। হাঁটু ঢাকা একখানি পখাল-করিআ,[২] মাথায় একটি ময়লা গামছা জড়ানো, এক কাঁধে একটি জাউলি,[৩] তার একপ্রান্তে আধসের চালের ভাত হবার পিতলের হাঁড়ি ও ছোট-খাটো হালকা একটি ঘটি, আরেক প্রান্তে দুই তিনটি পুঁথির তাড়া এবং আট কিম্বা নয় হাতি একটি খাটো ধুতি এই হল কর্মপ্রার্থী শিক্ষকের চিহ্ন। ফাল্গুনের মাঝামাঝি হতে চৈত্রের শেষাশেষি অবধি গাঁয়ের মধ্যে পায়ে চলার পথে তাদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত।

অবধানদের মধ্যে অধিকাংশ করণজাতের, অল্পসংখ্যক 'মাটিবংশ' ওঝা। বালেশ্বরনিবাসী অবধানরা জাতিতে জ্যোতিষী। অবধানদের মধ্যে মাটিবংশীয় ওঝারা অঙ্ক শিক্ষা দিতে দক্ষ বলে দেশে খ্যাতি ছিল। তাদের লীলাবতী সূত্রের সহিত পরিচয় আছে বলে লোকের বিশ্বাস ছিল। আমি ছেলেবেলা হতে শুনে আসছি বিদ্যার বলে ওঝারা গাছের পাতা এবং উড়ন্ত পাখির পালক গুণে দিতে পারত।

১ সংস্কৃত 'অবধান' শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে 'গুরুমশাই'। যেমন ইংরেজি 'Sir' কথাটির মানে 'মাস্টার মশাই'।

২ ধুতির ন্যায় পরিধের পাকা গামছা। সাধারণতঃ প্রাতরাশ পান্তা খাওয়ার সময় ব্যবহার করা হয়।

৩ বাঁক।

অবধানরা কেবল বালেশ্বর জেলায় পাঠশালা বসিয়ে পড়ুয়াদের পাঠ শিক্ষা দিতেন তা নয়, বালেশ্বরের নিকটবর্তী গড়জাত[১] এবং মেদিনীপুর জেলার দাঁতন, পটাশপুর, মহিষাদল, কাঁথি, হরিপুর পর্যন্ত তাঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল।

মেদিনীপুর জেলার পরিধি প্রায় পাঁচ হাজার দুই শত মাইল; এই জেলার দক্ষিণাঞ্চল প্রায় বাইশ শত মাইল খাঁটি ওড়িয়াভাষীদের আবাস। তাদের ঘরে ও বাহিরে কথাবার্তা, ঘরোয়া চিঠি, হিসাব পত্র, মহাজনী, সেরেস্তা, দলিল দস্তাবেজ, লেখাপড়া শুধু ওড়িয়া ভাষায় হত। পূর্বে মেদিনীপুর জেলার কাছারির ভাষা অবধি আংশিক ওড়িয়া ছিল। বালেশ্বর জেলার সদর কাছারির আমলারা কর্মে নিযুক্ত হয়ে সে স্থানে যেত। এখন এসব অনেকাংশে রহিত হয়েছে।

এখন অবধি এসব গ্রামের গণ্যমান্য লোকের গৃহে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় জগন্নাথদাসের ভাগবত,[২] সারলাদাসের মহাভারত, ওড়িয়া রামায়ণ প্রভৃতি পঠিত হচ্ছে। পটাশপুরের জমিদার বাড়ির একজন মহিলা সংস্কৃত ভাগবত পদ্যানুবাদ করিয়েছিলেন। বর্তমানে স্থানে স্থানে উক্ত ভাগবত পাঠ করা হচ্ছে। বালেশ্বর এবং কটক জেলার শত শত তালপাতার পুঁথি পড়া ব্রাহ্মণ জায়গায় জায়গায় পুঁথি শুনিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। অনেক মহাজন এবং জমিদারবাড়িতে পুঁথি অধ্যয়নের জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলের ইংরেজি পড়া বাবুদের ওড়িয়া বলতে বাধছে। তবে কুললক্ষ্মীদের কৃপায় অন্তঃপুরের মধ্যে জাতীয় ভাষা উচ্ছেদ করা সহজ সাধ্য হতে পারছে না।

মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চল হতে পাঠশালা একেবারে উঠে যাওয়া একটি রহস্যজনক ও দারুণ শোচনীয় ঘটনা। ১৮৬৫-১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় দক্ষিণাঞ্চলে ইস্কুল স্থাপন করবার জন্য একজন বাঙালী অধস্তন পরিদর্শক (সাব-ইন্‌স্পেকটার) পদে নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন। তিনি বাংলা স্কুল বসাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু লোকে ছেলেপুলেদের বাংলা শিক্ষা দেওয়া অনুমোদন করল না, অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারলেন না। তিনি কেবল দক্ষিণাঞ্চলে স্কুল

---

১ 'উপাধ্যায়' থেকে 'ওঝা'। ওড়িশার রাজন্যশাসিত করদ রাজ্যগুলিকে বলা হত গড়জাত। ওড়িশার বিভাগীয় কমিশনার সাহেব দেখাশুনা করতেন। ব্রিটিশ শাসিত কটক, পুরী, বালেশ্বর জেলাকে মোগলবন্দী বলা হত 'এ ছাড়া কাঁর অধীনে ছিল সম্বলপুর ও অনুগুল (Angul)।

২ এগুলি ওড়িয়া ভাষায় রচিত।

স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন, স্কুল বসাতে না পারলে তাঁর চাকরি রাখা অসম্ভব। উপরন্থ কর্মচারীকে আপনার অকৃতকার্যতার কথা জানিয়ে এমন সুন্দর চাকরিটা কি তিনি খোয়াবেন?

কাজে ঠেকলে লোকের বুদ্ধি খোলে। বাবুর মাথা হতে শীঘ্র একটি ফন্দি বেরিয়ে পড়ল। এক একটি থানায় বসে সেই থানার এলাকার পাঠশালার অবধানী যত ছিল, একটি দিন ধার্য করে থানার দারোগার সাহায্যে সকল অবধানদের একসঙ্গে ডেকে আনা হল। ইংরেজি লেখা শিলমোহর দেওয়া একটি কৃত্রিম পরোয়ানা পত্র অবধানদের দেখিয়ে বলা হল, 'এই দেখ মেদিনীপুর জেলার প্রধান রাজস্ব আদায়কারীর (কালেক্টর সাহেব) আদেশ, এই থানা এলাকায় যত পাঠশালা আছে সব তুলে দেওয়া হবে। থানা এলাকায় যত অবধান আছে এই পরোয়ানা শোনার দিন হতে সাত দিনের মধ্যে নিজ নিজ দেশে চলে যেতে হবে। ধার্য দিবসের পরের দিন হতে যদি কোন অবধানকে মেদিনীপুর এলাকায় দেখা যায় তবে ওয়ারেন্ট দেখিয়ে সদর কাছারিতে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাকে জরিমানা ও জেল দুই প্রকার দণ্ড দেওয়া হবে। পরিদর্শকবাবু প্রতি থানায় ঘুরে ঘুরে অবধানদের হুকুম শোনাতে লাগলেন। নিরীহ বেচারা অবধানদের কতই বা সাহস? জেলার প্রধান শাসনকর্তার (কলেক্টার) হুকুম, আবার থানার মারফৎ এসেছে। যে যত শীঘ্র পারল চিরকালের মতো পাঠশালা ত্যাগ করে দেশের দিকে পালিয়ে গেল।

এ কথা বলাই বাহুল্য এরপর অধস্তন পরিদর্শক মহাশয় অনায়াসে বাঙলা স্কুল বসিয়েছিলেন। উল্লিখিত পরিদর্শকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালেশ্বর জেলা স্কুলের প্রধান-শিক্ষক (হেড মাস্টার) ছিলেন। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি নিজের ভাইয়ের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মঠতার কথা জানাবার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত ঘটনাটি আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

মেদিনীপুরের দক্ষিণ অঞ্চলস্থ লোকদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়া সত্ত্বেও গৃহে কথাবার্তা হত ওড়িয়া ভাষায়। মাতৃভাষা কি সহজে ছাড়া যায়? জগন্নাথ দাসের ওড়িয়া ভাগবত আরও কতকগুলি ওড়িয়া পুস্তক বাংলা হরফে ছাপিয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হচ্ছে।

পাঠশালায় কোন রকম বেআইনী কাজ হত না। সকলে ছিল নিয়মাবদ্ধ। কার্যবিধিলঙ্ঘনকারীর প্রতি দণ্ড অনিবার্য। গুরুমহাশয়ের অনুমতি বিনা কোন

পড়ুয়ার ওঠাবসার অধিকার ছিল না। একটি জায়গায় বসে বসে পা ধরে গেলে সেই জায়গায় বসে করজোড়ে প্রার্থনা করতে হত 'গুরুমহাশয় এক' অর্থাৎ প্রস্রাব করতে যাব 'গুরুমহাশয় দুই' অর্থাৎ মলত্যাগ করতে যাব, 'গুরুমহাশয় পাঁচ' অর্থাৎ জল পান করতে যাব।

পাঠশালার দণ্ডবিধির মধ্যে নিম্নলিখিত শাস্তির বিধান ছিল:

প্রথম—বেত্রাঘাত।

দ্বিতীয়—একপায়া, অর্থাৎ একটি পায়ে দাঁড়াতে হবে।

তৃতীয়—নাকচুল, একটি হাতে নাক ও আরকটি হাতে মাথার চুল ধরে দাঁড়াতে হবে।

চতুর্থ—হাঁটু গোপাল, হাঁটু গেড়ে বাঁ হাত মাথায় দিয়ে ডান হাতে একটি খড়ির ডেলা রেখে সেই হাত সামনে এগিয়ে দিয়ে বসা।

পঞ্চম—মড়ুআ শাস্কুলি[১]—তালপাতার শিরা দিয়ে দেড় হাত প্রমাণ লম্বা একটি দড়ি তৈরি করা হয়। সেই দড়ি অপরাধীর গলায় পরিয়ে দুই প্রান্ত দুই পায়ের বুড়ো আঙুলে ফাঁস দিয়ে দেওয়া হয়।

প্রতিদিন পাঠশালা ছুটি হলে পড়ুয়াদের হাতে 'শূন্য চাটি' দেওয়া হয়। কোন পড়ুয়া কখন পাঠশালায় এসেছিল, সে কথা গুরু মহাশয় নিজে এবং সকলের মধ্যে শিক্ষায় অগ্রণী সর্দার পড়ুয়া মনে রাখে। পাঠশালা শেষ হলে পড়ুয়ারা দুই হাতের চেটো আড়াআড়ি যুক্ত করে গুরুমহাশয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। যে পড়ুয়া সকলের আগে পাঠশালায় উপস্থিত হয়েছে তার হাতের চেটোয় গুরুমহাশয় বেতের অগ্রভাব ছুঁইয়ে দেন সেটা হল শূন্য। তারপর দুই তিন করে শেষ পর্যন্ত এক এক সংখ্যা বাড়িয়ে ভিন্ন ভিন্ন পড়ুয়াদের হাতে বেতের আঘাত পড়তে থাকে, অর্থাৎ উপস্থিত বিষয় যে দ্বিতীয় তার হাতে দুইবার, যে তৃতীয় তার হাতে তিনবার, যে চতুর্থ তার হাতে চারবার বেতের আঘাত পড়ে। এই বেতের আঘাতের বলাবল সব সময়ে সমান থাকে না—জোর ও হাল্কা হয়। 'শূন্য চাটি' দেবার সময় গুরুমহাশয় পড়ুয়ার মুখের পানে চেয়ে দেখেন। যেখানে কোনরকম জবাবদিহি করার সম্ভাবনা থাকে সেখানে বেতের বেগটা কিছু ঢিলে হয়ে যায়। অন্য পড়ুয়াদের হাতে বেতের শব্দটা পটাপট শোনায়।

১ তালপাতার পাকানো দড়ি।

কোন পড়ুয়ার যদি বেশি বেলায় ঘুম ভাঙে এবং বিছানা হতে উঠে আঙিনার ও চালের উপর রোদ্দুর পড়তে দেখে, শূন্য চাঁটির ভয়ে সে পাঠশালায় না গিয়ে নিরাপদ স্থান অর্থাৎ রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ির কানাটা ধরে বসে পড়ে তবুও সে অবস্থায় তার রক্ষা নেই, স্বজাতীয় দুচারজন ছেলে উলঙ্গ হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে অপরাধীকে চ্যাংদোলা করে ধরে পাঠশালায় নিয়ে যায়। পাঠশালায় উপস্থিত হওয়া মাত্র বিচারক গুরুমহাশয় তার পিঠে কয়েক ঘা লাগিয়ে দেন।

আমি এ ধরনের একটি পাঠশালায় পড়তে আরম্ভ করলাম। সেখানে সকালে খড়ি দিয়ে লেখা শিক্ষা দেওয়া হত এবং দুপুরে বই পড়া হত। পড়া শেষ হলে অন্যান্য পড়ুয়ারা বাড়ি যেত। কিন্তু আমাকে পাঠশালায় থেকে গুরুমহাশয়ের সেবা ও তাঁর রান্নায় সাহায্য করতে হত। সেই মাস্টার মশাইয়ের নাম ছিল বৈষ্ণব মহাস্তি, নিবাস কটক জেলা। আমার জেঠামশায় পুরুষোত্তম সেনাপতি আমার প্রতি বড় নির্দয় ছিলেন। মাসের শেষে শিক্ষক মহাশয় মাইনে চাইতে গেলে জেঠামশায় বলতেন, 'আপনি ত ফকীরকে পড়ান না। মাইনে চাচ্ছেন কেন ?' শিক্ষক মহাশয় উত্তর দেন, 'আমি ত দিবা রাত্রি তাকে কাছে কাছে রাখি একমুহূর্তের জন্য খেলতে কিম্বা বেড়াতে যেতে দিই না।' জেঠামশায় বলেন, 'কই ওর পিঠেত দাগ নেই।' শিক্ষক মহাশয় জেঠামশায়ের মনের কথা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন। পাঠশালায় আমি বসে ছিলাম, বিনা কারণে বেত দিয়ে আমার পিঠে দশ বার ঘা লাগিয়ে দিলেন। প্রহারের শব্দ ও আমার আর্তনাদ শুনে জেঠামশায় ও জেঠিমা ভারি খুশি; কিন্তু ঠাকুরমা দৌড়ে এসে বললেন, 'মাস্টার মশায় তোমার ঘরে কি ছেলেপুলে নেই ? অকারণে ছেলেটাকে পিটছ।' প্রত্যেকবার শিক্ষক মহাশয়কে মাইনে দেবার সময় এই প্রকার অভিনয় হত।

কিছুকাল পরে বৈষ্ণব মহাস্তি তাঁর গ্রামে চলে গেলেন। আমাদের গ্রামে নেড়া গোঁসাই মঠে একটি পাঠশালা ছিল। আমি সেই পাঠশালায় ভর্তি হলাম। সেখানে প্রতিপদ, অষ্টমী, চতুর্দশী ও অমাবস্যা এই তিথিগুলিতে পাঠশালা বন্ধ থাকত। দুপুরবেলা এই তিথিগুলিতে আমরা কয়েকজন বয়স্ক পড়ুয়া মিলে গ্রামের মেয়েদের কাছে বসে গান গাইতাম। তাঁরা পড়ুয়াদের ভিক্ষা হিসাবে চাল দিতেন। সেই চাল দিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের অন্নের ব্যবস্থা হয়ে যেত। কখনও কখনও চাল উদ্বৃত্ত থাকলে শিক্ষক মহাশয় বিক্রী করে পয়সা করতেন। পড়ুয়ার

ভিক্ষার চাল ছাড়া গুরুমহাশয় আরও ঢের চাল পেতেন। কোন পড়ুয়া নতুন কোন পড়া আরম্ভ করার সময় পাঠশালায় কিছু সিধা আনত। সিধার সরঞ্জাম একসের চাল, একটি সুপারি, কিছু গুড়, মুড়কি ও কয়েকটা ফুল।

সে সময় বালেশ্বরে একটি ফারসী অবৈতনিক স্কুল ছিল। পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করে আমি নিজে সেই স্কুলে নাম লিখিয়ে পাঠ আরম্ভ করলাম। স্কুলে তিনজন আখুনজী[১] ও একজন ওড়িয়া পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। ওড়িয়া পণ্ডিতের নাম বনমালী বাচস্পতি। বাপ, ভাই প্রভৃতিকে কিরূপে পত্র লিখতে হয়, কাছারিতে দরখাস্ত কিভাবে করতে হয় পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদের কেবল এইসব শিক্ষা দিতেন।

সে সময় বাইবেল ছাড়া ওড়িয়া ভাষায় আর কোন ছাপা পুস্তক ছিল না। কটক মিশন প্রেস ছাড়া ওড়িশায় আর কোন ছাপাখানা ছিল না। বালেশ্বরে পাদ্রী সাহেবদের একটি স্কুল ছিল। সেখানে বাইবেল ছাড়া অন্য কোন বিষয় পড়ানো হত না। আসল কথা পাদ্রী সাহেবের স্কুলে ছাপানো বই পড়লে 'জাত যাবে'—এই ভয়ে কোন হিন্দুর সন্তান সে স্কুলে পড়ত না।

১ ফারসী শিক্ষক

পাল সেলাই

আমার বাল্যকালে বালেশ্বর জাহাজাদির বড় কারবার স্থল ছিল। পাঁচ-ছয়শ জাহাজ সমুদ্রে যাতায়াত করত। বার আনা জাহাজ লবণ বহার কাজে এবং অবশিষ্ট রেঙ্গুন, মাদ্রাজ, কলম্বো এবং সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপগুলিতে বাণিজ্য দ্রব্য বহন করায় নিযুক্ত ছিল। সে সময় বালেশ্বরে ষ্টিমারের নাম কেউ শোনে নি। সমুদ্র পথে জাহাজ চলত পালের টানে। জাহাজের আয়তন অনুযায়ী এক একটি জাহাজের জন্য নানা আকারের বিভিন্ন মাপের ছয়খানা হতে বারখানা পর্যন্ত পালের প্রয়োজন হত। সে সমস্ত পালের বিভিন্ন নাম ছিল, যেমন, কয়াজু, সবর টভর, কলমি, জিভি, দরিআ, পেলা ইত্যাদি। গোরাপ অর্থাৎ বড় বড় দুইটি সংযুক্ত জাহাজের জন্য দুইটি মাস্তুলের প্রয়োজন হত।

সেইসব পালের কোনটা চতুষ্কোণ, কোনটা ত্রিকোণ, এক একটা বিষম বাহুর-চতুর্ভুজ হত। জাহাজের আকার অনুযায়ী মাপসই পাল দরকার হত। পাল মাপে বড় হলে জোর হাওয়ায় জাহাজ উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ছোট হয়ে গেলে জাহাজ চলবে না। অনভিজ্ঞ লোক পালের মাপ ঠিক রাখতে পারে না।

আমার পিতা ও জেঠামশায় অধিকাংশ জাহাজের ঠিকাদার ছিলেন। অধিকাংশ জাহাজের ব্যবসায়ী ফরমাস দিয়ে পাল সেলাই করিয়ে নিতেন। পাল সেলাই করার জন্য আমাদের বাড়ি শত শত দরজি মজুত থাকত। এ একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসা ছিল। এই সমস্ত কারবারের হিসাবপত্র রাখার জন্য আমাদের একটি সেরেস্তা ছিল। গোমস্তার অধীনে শিক্ষানবিশি করতে জেঠামশায় আমাকে লাগিয়ে দিলেন। গোমস্তার মেট (mate) হিসেবে আমি কাজ করতে লাগলাম, দুবেলা নদীতীরে ঘুরে ঘুরে কোন জাহাজের কিরূপ পাল তৈরি হচ্ছে এবং কোন কোন দরজির জিম্মায় কি কি কাজ আছে ইত্যাদি বিষয় খবর নিয়ে গোমস্তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিই। এসব কাজ শেষ করার পরও আমার ঢের সময় থাকত, সেই সময়টা জেঠামশায় আমাকে পাল সেলাই করায় লাগিয়ে দিতেন।

বালেশ্বরে জাহাজের কাজ কার্তিক হতে চৈত্রমাস অবধি চলত। দক্ষিণের হাওয়ার টান আরম্ভ হলে, জাহাজগুলি নদীমোহনা হতে বেরুতে পারত না। কার্তিক মাস অবধি খোঁটায় বাঁধা হয়ে পড়ে থাকত। এই সময় হতে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যেত। তা সত্ত্বেও বঙ্কশাল এলাকার সর্বপ্রকার কর্মী কারিগর ঠিকাদার, মাঝি, খালাসী এবং কর্মচারীরা ছয় মাসের মধ্যে যা উপার্জন করত বাকি ছয় মাস ঘরে বসে থেকেও চলে যেত। বর্ষাকালে কারবার কাজ বন্ধ থাকায় সরকারি এলাকা ও কারবার সম্পর্কীয় সমস্ত কর্মচারী ঘরে বসে থাকতেন।

কাছারিতে কার্যশিক্ষা

জাহাজের কাজ বন্ধ হওয়ায়, জেঠামশায় আমাদের গ্রামের নিকটবর্তী ভুইসাই গ্রাম নিবাসী নিমক মহালের সেরেস্তাদার বাবু বিশ্বনাথ দাসের কাছে আমাকে রেখে এলেন। আমি প্রতিদিন সেরেস্তাদারের সঙ্গে গিয়ে কাছারিতে নিমক মহালে সেরেস্তার কাজ শিখতে লাগলাম। বাবু বিশ্বনাথ দাস একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন একটি গরীব বিধবার সন্তান, পরের ঘরে ধান ভানা তাঁর মায়ের কাজ ছিল। বিশ্বনাথবাবু গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছেড়ে একজন মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানে মাসিক আট আনা বেতনে কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রুটিআলা সারাদিনে নির্দিষ্ট সাহেবের কুঠিতে যে কটা পাঁউরুটি পাঠাত বিশ্বনাথবাবু সন্ধ্যার সময় তার হিসাব খাতায় লিখে আসতেন। মাসের শেষে সাহেবকে হিসাব দিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এই সূত্র ধরে বিশ্বনাথবাবু সাহেবদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলেন। রাত্রে মাত্র দুই ঘণ্টা তাঁকে কাজ করতে হত। সারাদিন কাছারিতে গিয়ে নিমক মহালের কাজ শিক্ষা করতেন। প্রথমে একজন সামান্য মুহুরির কাজে নিযুক্ত হয়ে সেরেস্তাদার অবধি উন্নতি করেছিলেন। অনেক সম্পত্তি করে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর উত্তরাধিকারীরা সে সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেছেন।

কাছারির অন্যান্য দপ্তরের চাইতে নিমক মহাল দপ্তর বিশেষ সরগরম ছিল। সেখানে অনেক আমলা নিযুক্ত ছিল। কাছারির নিমক মহাল দপ্তর দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সেরেস্তা বিভাগ ও দেওয়ান বিভাগ। সেরেস্তা বিভাগে মফঃস্বলের হিসাব সব রাখা হত। সদরের হিসাবপত্র সব দেওয়ানি বিভাগে রাখা হত। সে সময় বালেশ্বরের সব কিছু গৌরব সম্পদ বিস্তার ও উন্নতির মূল লাভ নিমক মহালের সাহায্যে। বালেশ্বরের পূর্বাঞ্চল সমুদ্র-কূলবর্তী উত্তরে সুবর্ণরেখা মোহনা হতে দক্ষিণে ধামরা মোহনা পর্যন্ত স্থানগুলিতে সাদা লবণ তৈরি হত। তৈরি লবণ হতে বালেশ্বরের প্রয়োজন সমাধা হবার পর অবশিষ্ট অধিকাংশ লবণ কলিকাতা নিকটবর্তী গঙ্গানদীর পশ্চিম কূলবর্তী

শালিখার গোলায় জাহাজে চালান হত। সেই স্থান হতে লবণ বাংলার গ্রামাঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হত। সেই সময় বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোক বালেশ্বরের সাদা লবণের কারবার করতেন। সে সময় নিমক মহাল বালেশ্বর শহরবাসীদের নুন তৈরির কারবার জীবিকা উপার্জনের প্রায় একমাত্র উপায় ছিল। মহাজন, মিস্ত্রি ও আমলারা কর্মে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও জাহাজগুলি কুশলে সমুদ্র পথে যাতায়াত করার উদ্দেশ্যে শহরের সমস্ত দেবতাদের পূজা এবং চণ্ডীপাঠ করার জন্য শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে লবণ 'তৈরি' আরম্ভের পূর্বে কার্য সহজসাধ্য করার জন্য সরকার তরফ হতে কাছারির নিকটবর্তী ঝাড়েশ্বর মহাদেবকে পূজা দেওয়া হত। পূজার সমস্ত খরচপত্র সরকারি তহবিল হতে দেওয়া হত। লবণ তৈরি কার্যে নিযুক্ত কর্মচারী সমুদয় প্রায় হিন্দু ছিল। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য সরকারকে এই প্রকার কাজ করতে হত। আমি নিমক মহাল সেরেস্তায় বসে কাজ শিখতে লাগলাম। কাছারিতে চলিত ভাষা ওড়িয়া, বাংলা ও ফারসী ছিল। আমাদের গ্রামের নিকটবর্তী অজুআঁবাদ নামক গ্রামে একজন ডাক্তার ছিলেন, তাঁর নাম ছিল প্রসাদ নায়ক। তিনি জেলখানার ডাক্তারের সহকারী ছিলেন। আপন পুত্রদের বাংলা পড়াবার জন্য তিনি একজন শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। শিক্ষকের আবাস অন্য জায়গায় ছিল। তিনি কেবল রাত্রে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য এসে ছাত্রদের পড়িয়ে যেতেন। কয়েক মাসের জন্য আমি তাঁর কাছে বাংলা শিক্ষা করেছিলাম। ছাপার অক্ষর কেবল পড়তে পারতাম, ভাল করে লিখতে পারতাম না। কাছারির নিমক মহালের ওড়িয়া সেরেস্তায় কাজ শিখতাম, সময় পেলে কুড়িয়ে আনা ছেঁড়া কাগজে বাংলা অক্ষর লেখার অভ্যাস করতাম। আমার মাসতুত ভাই রাজকিশোর চৌধুরী মফঃস্বল চাটি গোলায় পেশকার ছিলেন। তিনি একবার সদর কাছারিতে এসে সেরেস্তাদারের কাছে বসেছিলেন। আমি সেরেস্তায় বসে লিখছিলাম। কথা প্রসঙ্গে আমার কথা উঠল, প্রশ্ন হল আমি বাংলা সেরেস্তায় কাজ করতে পারব কিনা। আমার বাংলা হস্তাক্ষর রাজকিশোর বাবু এবং সেরেস্তাদার দুজনে পরীক্ষা করলেন। সেরেস্তাদার সামান্য দোমনা হয়ে বললেন 'হাঁ একরকম চলে যাবে।' সেইদিন হতে বাংলা সেরেস্তায় বসে কাজ শিখতে লাগলাম। ওড়িশা বিশেষত বালেশ্বরে দুর্ভাগ্যের বিষয়, অল্পদিন পরে নিমক মহাল উঠে

যাবার বিষয় সদর হতে হুকুম এল। উৎকলের ভাগ্যলক্ষ্মী লিভারপুল এবং অন্যান্য স্থানে চলে গেলেন। নিমকমহাল কাছারিতে অধিকাংশ আমলা বাঙালী ছিল। তারা শালিখা গোলা থেকে নিযুক্ত হয়ে এসেছিল। নিমক মহাল উঠে যাওয়াতে প্রায় সকলেই স্বদেশে চলে গেল। যারা ওড়িয়া লিখতে পড়তে শিখেছিল তারা কাছারির অন্যান্য দপ্তরে নিযুক্ত হল। সে সময় কাছারির সেই বিশেষ দপ্তরে ওড়িয়া ভাষা সামান্যই চলত, প্রধান চলিত ভাষা ছিল ফারসী।

১৮৩৬ সালে কাছারিতে কেবলমাত্র দেশি ভাষা চালু হবে বলে গুভর্নমেণ্ট স্পষ্ট হুকুম জারি করা সত্বেও পুরাতন আমলারা ফারসী ভাষার মায়া ছাড়তে না পেরে পুষে রেখেছিল। কাছারিতে একটি স্বতন্ত্র কেরানীখানা ছিল। সদরে পাঠানোর উপযোগী করার জন্য সমস্ত কাগজপত্র সেখানে তরজমা করা হত। দুইজন ছাড়া সমস্ত কেরানী ছিল ফিরিঙ্গি। বালেশ্বরবাসীরা বলত 'মাটিআ পুরুষ'[১]। সর্বপ্রথম স্যামুয়েল এগুজ এণ্টোনি ডিসো কলকাতা হতে নিযুক্ত হয়ে বালেশ্বরে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে এঁদের বংশধরেরা কেরানী-খানাকে একচেটিয়া করে রেখেছিলেন। দেশীয় কেরানীদের মধ্যে ছিলেন আমার শ্বশুর ৺শিবপ্রসাদ চৌধুরী এবং বর্তমান সাবজজ গগনবিহারী চৌধুরীর পিতা ৺গঙ্গাপ্রসাদ চৌধুরী। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে বালেশ্বরে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এই স্কুলে ৺শিবপ্রসাদ চৌধুরী, ৺গঙ্গাপ্রসাদ চৌধুরী, কণ্টাবনিয়া-গ্রামনিবাসী ৺বিচিত্রানন্দ দাস, বগুড়ানিবাসী ৺অটলবিহারী পাল এবং আর একটি বাঙালী ছেলে এই নিয়ে পাঁচজন মাত্র ছাত্র ছিল। জাত যাবার ভয়ে অন্য কোন দেশীয় ছেলে ইংরেজি স্কুলে না আসার জন্য স্কুল উঠে গেল। সর্বপ্রথম ইংরেজি শিক্ষা, বালিকা শিক্ষা, জেনানা শিক্ষা এই ক্ষুদ্র লেখক মল্ল বংশে শুরু

সে সময়ে কাছারিতে পুলিশ বিভাগ ছিল না, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বরূপ ছিলেন। খুব ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে পুরাত পুলিশ দারোগা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে হাজির হয়ে সেলাম জানাতেন।

'হুজুর! দুনিয়াকা হালচাল আচ্ছা হ্যায়।'

'বালেশ্বর শহরকা হালচাল আচ্ছা হ্যায়।'

---

১ মাটির মূর্তিতে রঙ চড়াবার পূর্বে খড়ি চড়ান হয়, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ।

এই কথাটুকু বলা হলে সাহেবকে সেলাম দিয়ে আপনার জায়গায় চলে যেতেন। কদাচিৎ হয়ত শহরের মধ্যে কোনরকম দাঙ্গা হাঙ্গামা হলে দারোগা, ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দিতেন। সেই দিনটিতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পুলিশের কাজ সম্পর্কে শুনানি সমাপ্ত হয়ে যেত।

বালেশ্বর একটি প্রধান বন্দর এবং বাণিজ্যপ্রধান স্থান বলে কেবল ভারতে নয় ইয়োরোপ অঞ্চলেও খ্যাতিলাভ করেছিল।

বঙ্গদেশে প্রবেশ করার পূর্বে ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় বণিকের দল এই স্থানে মোকাম বসিয়েছিলেন। চিরদিন কারও সমান যায় না। উত্থান পতন জগতের নিয়ম। স্মরণাতীত কাল হতে যে বালেশ্বরের নদীকূল সহস্র সহস্র লোকের সমন্বয়ে কোলাহলময় হয়ে থাকত আজ গিয়ে দেখুন সে স্থান নীরব নির্জন, অরণ্যময় শ্মশানতুল্য নিস্তব্ধ। নদীটাও বুজে গেছে। বালেশ্বরবাসী জাহাজী ধনী বণিকেরা লুপ্ত হয়ে যাওয়াতে বালেশ্বর-বাসীদের হাত হতে দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সমস্ত প্রকার বাণিজ্য বিদেশীদের হস্তগত হয়ে গেছে। . . .

কাছারিতে ভ্রমণ

নিমকমহাল উঠে গেছে। কিন্তু আমার কাছারিতে যাতায়াত বন্ধ হয় নি। প্রতিদিন সকাল দশটার সময় কাছারিতে যাই। কয়েকজন বেকার নিষ্কর্মা উমেদার ঘুরে বেড়াত। আমিও তাদের সঙ্গে ঘুরতাম। চারটা বাজলে বাড়িতে ফিরে আসতাম। সে সময় ঠিক চারটার সময় কাছারি ভাঙত। সাহেব বারোটার পর দুটোর মধ্যে কাছারিতে উপস্থিত হয়ে চারটা বাজতেই কুঠিতে চলে যেতেন, কাছারি ভেঙে যেত। সাহেব হাকিমেরা কাছারিতে এসে উপরস্থ হাকিমদের কিম্বা বিলাতে কারুকে চিঠি লিখতে বসতেন। চিঠি লেখার কাজ না থাকলে বসে বসে খবরের কাগজ পড়তেন। ওড়িয়া কিম্বা ফারসী কোন প্রকার ভাষা তাঁদের জানা না থাকায় হাকিম কাছারি সেরেস্তার কোন খবর রাখতেন না। বাদী প্রতিবাদী জবাব সওয়াল সাক্ষী জবানবন্দি রায় লেখা প্রভৃতি সমস্ত কাজ করত আমলারা। চারটা বাজতে হাকিম সেই সমস্ত কাগজে দস্তখৎ করে দিয়ে কুঠিতে চলে যেতেন। সে সময়ে কাছারির আমলাদের বেতন দশ টাকার বেশি ছিল না। কেবল পেশকার মাসে পনের টাকা এবং সেরেস্তাদার কিছু বেশি টাকা বেতন পেতেন। আদালতের কাছারির আমলাদের বেতন আরো কম ছিল। মুহুরী হতে সেরেস্তাদার অবধি পদ অনুযায়ী মাসিক বেতন আড়াই টাকা হতে দশ টাকার মধ্যে ছিল। তা সত্ত্বেও অনেক আমলা পালকি অথবা ঘোড়ায় চড়ে কাছারিতে আসা যাওয়া করতেন এবং অনেক আমলা উত্তরাধিকারীদের জন্য জমিদারী কিনে রেখে গেছেন। এই হতে বুঝুন, আমলাদের আয় সে সময় কিরূপ ছিল। সে সময়ে বালেশ্বরে কাপড়ের ছাতার চল ছিল না। আমলারা সকলে তালপাতার ছাতা নিয়ে কাছারিতে যেতেন। বর্ষাকালে কাছারির বারান্দায় এ মুড়া হতে ও মুড়া অবধি তালপাতার ছাতা সারি সারি রাখা থাকত। আমলা ও মামলতকারীদের[১] ছাতা রাখার স্থান স্বতন্ত্র ছিল। ছাতার পরিধি এবং

১ কাছারির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, স্থানীয় বিবাদ বিসংবাদে যার নিষ্পত্তি অগ্রাহ্য করলে মামলা শুরু হয়।

বিবিধ রংয়ের চিত্র বৈচিত্র্য দেখলে ছত্রাধিকারীর অবস্থার কথা জানতে পারা যেত। অনেক আমলা নিজে ছাতা ধরে কাছারিতে যেতেন না। কাছারিতে যাবার সময় গেরুয়া সালু কাপড়ে জড়ানো একটা বড় কাগজপত্রের বোঁচকা পিঠে বেঁধে ও তালপাতার ছাতাটি বাবুর মাথার উপর ধরে পিছনে পিছনে একটি নাপিত ধাওয়া করত। কাছারির আমলারা আপন আপন অধিকারভুক্ত সমস্ত নথিপত্র ও অন্যান্য কাগজ কাছারিতে রেখে আসতেন না। একটা বড় বোঁচকায় বেঁধে ঘরে নিয়ে আসতেন। যে আমলার যে পরিমাণ উপরি রোজগার, কাছারিতে আমলাদের মধ্যে কিংবা সমাজে তাদের সেই পরিমাণ সম্মান। কেরানীর চাকরির অর্থ আঁটকুড়ে চাকরি অর্থাৎ বেতন ছাড়া রোজগারের আর কোন পথ ছিল না। ঘুষ নেওয়া অধর্ম সে সময় এ ধারণা কারও ছিল না। শিক্ষার প্রভাবে ব্যভিচার, সুরাপান বার আনা কমে গেছে। উৎকোচ গ্রহণ ছিল, আছে, চিরকাল থাকবে। তবে বর্তমানে তা ফল্গু-স্রোত আকার ধারণ করেছে।

বারবাটি স্কুলে অধ্যয়ন

বালেশ্বর গভর্নমেণ্ট স্কুলের সেকেণ্ডমাস্টার বাবু শিবচন্দ্র সোম সেই সময় শহরের পূর্ব-উত্তর প্রান্তে বারবাটি নামক গ্রামে একটি সাহায্যকৃত স্কুল স্থাপন করলেন। স্কুলে বাংলা এবং ওড়িয়া দুইটি ভাষা পড়ানো হত। স্কুলের নাম বারবাটি বঙ্গোৎকল বিদ্যালয়। স্কুলের খরচপত্রের জন্য অর্ধেক অর্থ চাঁদা করে এবং অর্ধেক সরকারি সাহায্যে চলত। প্রথমে স্কুলের স্বতন্ত্র বাড়ি ছিল না। শিবচন্দ্র বাবুর বাসায় কার্যারম্ভ হয়। বাবুর বাসার পিছন দিকে রান্নাঘরের লাগাও একটি দালানঘর ছিল। দালানটি লম্বায় প্রায় পনের হাত, প্রস্থে প্রায় দশ হাত। প্রথমে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ত্রিশের মধ্যে ছিল। সে সময় বালেশ্বর গভর্নমেণ্ট ইংরেজি স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশের অধিক ছিল না। স্কুলে ছোট ছোট ছেলেরা মাদুরে বসত। উপরের শ্রেণীর ছেলেদের বসার জন্য চারটা বেঞ্চ পাতা ছিল।

স্কুলের শিক্ষক দুজনের মধ্যে একজন বাঙালী, একজন ওড়িয়া পণ্ডিত ছিলেন। গায় গায় লাগা পাশাপাশি দুটি কুর্সিতে মাস্টার দুজন বসতেন। অকারণে কাছারিতে ঘোরাঘুরি আমার ভাল লাগল না। কারুকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে আমি নিজে গিয়ে স্কুলে নাম লেখালাম। কিন্তু বিষম অসুবিধায় পড়লাম—এক কাপড়ে স্কুলে যাবার নিয়ম ছিল না। কাঁধে একটি চাদর ফেলে যাবার কথা। ঠাকুরমাকে সব কথা বললাম। তিনি তাঁর পরনের একটি তসরের ধুতি এবং কাঁধে ফেলে যাবার জন্য একখানা চাদর যোগাড় করে দিলেন। সেই সময়ে আমার ভাই (জেঠতুত) নিত্যানন্দ ভাল জোড় পরে গায়ে মখমল কিম্বা মূল্যবান সাটিনের কামিজ পরে এবং শীতের দিনে শাল গায়ে জড়িয়ে স্কুলে যেত। কয়েক মাস পরে ঠাকুরমা জেঠামহাশয়কে বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করায় জেঠামশায় আমাকে ধুতি চাদর জোড় কিনে দিলেন। স্কুলে সে সময় ছাত্রদের বেতন মাসে এক আনা হতে চার আনা। আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ছিলাম। আমার বেতন ছিল মাসে চার আনা। মাসের

শেষে পণ্ডিতমশায় বেতন চাইলেন। সে সময় ঠিক মাসের শেষে বেতন দেওয়া হত না। ৩।৪ মাস পরে একসঙ্গে বেতন দিলেই চলত। মাসের শেষে পণ্ডিতমশায় একবার বেতন চান। আজ কাল বলে টাল মাটাল করে মাস কাটিয়ে দিতাম। কারণ ঠিক মাসের শেষে বেতন গুণে দেওয়া ঠাকুরমায়ের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। টাঁকা পয়সা সংগ্রহের বিষয় ঠাকুরমা উদাসীন ছিলেন। কদাচিৎ টাকাটা সিকেটা তাঁর হাতে পড়লে তিনি ঘরের চালে গুঁজে রাখতেন। কিংবা ঘরের পিছনে ছাঁচতলায় মাটিতে পুঁতে রাখতেন। কেউ চাইলে কিংবা কোন প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ বের করে দিতেন। ঘরে হোক কিম্বা আত্মীয়স্বজনের জন্য হোক তিনি সর্বদা সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। সেই লোকসেবাই তাঁর জীবনের সারব্রত ছিল।

সে সময়ে ওড়িয়া ভাষায় বর্ণবোধ, নীতিকথা তিনভাগ এবং হিতোপদেশ— এই কটা মাত্র বই ছাপা হত। নিম্নশ্রেণী হতে উচ্চশ্রেণী অবধি সেই কখানা বই পাঠ্যপুস্তকরূপে নিরূপিত ছিল। আমাদের স্কুলে ওড়িয়া পণ্ডিতমশায় সেই কখানা পুস্তক আর যোগ বিয়োগ, গুণ, জমির মাপজোখ ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি অঙ্ক বিদ্যা শেখাতেন। পণ্ডিতমশায়ের নাম হরেকৃষ্ণ পাণিগ্রাহী, নিবাস বর্তমান বালেশ্বর রেল স্টেশনের নিকট পশ্চিম প্রান্ত শোভারামপুর নামক গ্রামে। তিনি স্কুলের ছাত্রদের এইভাবে পড়াতেন।

ছাত্ররা দাঁড়িয়ে পুস্তকের পাঠ্য বিষয় এক একবার পড়ে বসার পরে পণ্ডিত মশায় নিজে পড়তেন। যথা: কোন একদিন একটি কাক একখণ্ড মাংস মুখে নিয়ে একটি বৃক্ষের ডালে বসেছিল। এই সময় একটি শৃগাল সেই বৃক্ষমূলে উপস্থিত হয়ে মাংসখণ্ডটি খাবার আশায় বলল, 'হে কাক, তুমি দেখতে বড়ই সুন্দর।'

পণ্ডিতমশায় পড়ার পর এইভাবে অর্থ করতেন, কোন একটি দিনে অর্থাৎ এক অহ্নে একটি কাক—অর্থাৎ একটি বায়স, একখণ্ড মাংস অর্থাৎ একটি পিশিত পল, মুখে নিয়ে অর্থাৎ বদনে ধারণ করে, একটি বৃক্ষ অর্থাৎ একটি মহীরুহ, ডালে অর্থাৎ শাখায় বসেছিল, অর্থাৎ উপবেশন করেছিল, এই সময় অর্থাৎ এই প্রকার কালে, একটি শৃগাল অর্থাৎ একটি জম্বুক, সেই অর্থাৎ উক্ত, বৃক্ষমূলে অর্থাৎ তরুতলে, উপস্থিত হয়ে অর্থাৎ পৌছিয়া, মাংস খণ্ড অর্থাৎ পিশিতপল খণ্ড, খাইতে অর্থাৎ ভোজনার্থে, লোভে অর্থাৎ লালসায়, বলল

অর্থাৎ এই বচন বলিল, হে মানে সম্বোধন. কাক অর্থাৎ বায়স তুমি মানে যুষ্মদ, দেখিতে অর্থাৎ দর্শন করিতে, বড় মানে বৃহৎ সুন্দর মানে শোভাবন্ত ইত্যাদি।

পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ পাণিগ্রাহী সর্বদা ছাত্রদের নিকট প্রকাশ করতেন যে, তাঁর মতো পণ্ডিত বালেশ্বর জেলায় কেউ নেই। তিনি অভিধান ব্যাকরণ পড়েছেন এবং লীলাবতী সূত্র তাঁর জানা বলে বলতেন। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় মাটিয়া বংশ ওঝাদের লীলাবতী সূত্র জানা বলে শুনেছিলাম। লীলাবতী সূত্রে অভিজ্ঞ লোক কোন গাছে কত সংখ্যক পাতা এবং উড়ন্ত পাখিদের সংখ্যা বলতে পারতেন। অনেকদিন হতে লীলাবতী সূত্র শেখার আমার ইচ্ছে ছিল। সম্প্রতি অনেকদিন ধরে ভক্তি এবং বিনয়ের সঙ্গে আরাধনা করায় পণ্ডিত পাণিগ্রাহী আমাকে লীলাবতী সূত্র শিখিয়ে দিতে সম্মত হলেন। তাঁর বাড়ি গেলে আমাকে শিখিয়ে দেবেন, এরূপ কথা স্থির হল। আমাদের বাড়ি থেকে পাণিগ্রাহীর গ্রাম শোভারামপুর প্রায় দুই মাইল দূর। গরম কালের সকালে স্কুল,—স্কুল ফেরত ঘরে ভাত খেয়ে সেই রোদ্দুর মাথায় নিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ি। পায়ে জুতো কিম্বা মাথার উপর ছাতা নেই। সেদিকে আমার দৃষ্টি নেই। কি উপায়ে লীলাবতীসূত্রটা শিখে ফেলব এই আমার একান্ত ইচ্ছে।

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি পৌছতে বেলা প্রায় একটা হয়ে যেত। পণ্ডিতমশায় ঘরের ভিতরে শুয়ে থাকতেন, আমি বারান্দায় বসে থাকতাম। তাঁর ঘুম ভাঙতে তিনটা চারটা বেজে যেত। পণ্ডিতমশায় ঘুম থেকে উঠে কিছু পান্তা খেয়ে তালপাতার ছাতা কাঁধে ফেলে বাঁশের লাঠিটি হাতে ধরে ক্ষেতে মজুরদের কাজ দেখতে বেরিয়ে পড়তেন। ক্ষেত তাঁর বাড়ি থেকে আধমাইলের পথ। ক্ষেতে মজুরদের কাজ তদারক করা শেষ হতে প্রায় আধঘণ্টা সময় যেত। তারপরে একটা আলের উপর বসে আমার দিকে চেয়ে বলতেন, 'হু, লীলাবতী সূত্র শিখবে নাকি? লেখ লেখ।' আমি ত দরিদ্রের অমূল্য নিধি পাওয়ার মতো তার সামনে আলের নিচে বসে পড়ি। লক্ষাবধি একটি অঙ্ক ডেকে দিয়ে সেইরকম দীর্ঘ আরেকটি অঙ্ক ডেকে দিয়ে বলেন এটা দিয়ে আগেরটা গুণ কর, আরেকটা অঙ্ক ডেকে দিয়ে বলেন আগের অঙ্কের গুণফল হতে বিয়োগ কর; আরেকটা অঙ্ক ডেকে দিয়ে বলেন, বিয়োগফলের সঙ্গে যোগ দাও। অঙ্কটা

কষতে কষতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সেদিন বাড়ি ফিরে যাই। এইরকম গুণ বিয়োগ প্রায় একমাস চলল। কিছুই বুঝতে পারি না তবুও উৎসাহের সঙ্গে রোজ দুপুরবেলা ছুটে যাই। মনে দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যে মূল অঙ্ক প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, আমার অল্পবুদ্ধির জন্য বুঝতে পারছি না। পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এইভাবে অঙ্ক কষে যাও, পরে সূত্র বেরিয়ে পড়বে। পণ্ডিতমশায় প্রতিদিন অঙ্ক দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হন, এক একদিন অঙ্ক দেন না। আমি জিজ্ঞেস করলে শুনতে পান নি এইভাবে চলে যান। শেষে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, মনের মধ্যে কেমন একটা অবিশ্বাস দেখা দিল। তাঁর কাছে আর গেলাম না। এই ঘটনার অনেক বছর পরে হিন্দিতে ছাপা একটি লীলাবতী সূত্র আনিয়ে মনোযোগের সঙ্গে সমস্তটা পড়লাম। কোনরকমে না গুনে গাছপাতার সংখ্যা স্থির করা অসম্ভব। আমার বুদ্ধির স্থূলতা স্মরণ করে হাসলাম।

আমাদের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে বাংলা পাঠ্যপুস্তক ছিল সংবাদসার, পিয়ার্সন সাহেবের ভূগোল, কিথ সাহেবের ব্যাকরণ ও অঙ্ক। সে সময় অবধি বাঙালীরা স্কুলপাঠ্য বই লেখায় অনভিজ্ঞ ছিল। সরকার পারিতোষিক ঘোষণা করায় মনোরঞ্জন ইতিহাস, হস্তিবিষয়ক ইতিহাস, উষ্ট্রবিষয়ক ইতিহাস এইরূপ কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত বা অনুমোদিত হল।

বাঙালী পণ্ডিতমশায় বাঙলা পুস্তকগুলি পড়াতেন। বছরের শেষে আমাদের পরীক্ষা হল। ছাত্রেরা ভুল উত্তর দিতে লাগল। কেবল সকলের ভুল এক ধরনের হওয়াতে পরীক্ষকেরা পণ্ডিতমশায়ের যোগ্যতা সম্বন্ধে সহজেই জানতে পারলেন। পরীক্ষার শেষে অল্পদিন পরে বাঙালী পণ্ডিত স্কুল হতে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর হুগলি নর্মাল স্কুল হতে পাস করা আর একজন পণ্ডিত এলেন। এই সময় অনেকগুলি বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচিত ও অনুবাদিত হয়েছিল।

পরীক্ষার শেষে আমাদের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক স্থির হল—কাদম্বরী, মার্শম্যান প্রণীত বাংলা ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতসার। ওড়িয়া পুস্তক হিতোপদেশ।

এইখানে স্কুলের পড়া শেষ হল। কারণ প্রথম শ্রেণীতে যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক নিরূপিত হল, তার মধ্যে এক আনাও কেনবার আমার শক্তি ছিল না। আমার আর পড়াশোনা হবে না এ কথা স্থির জেনে বাড়ি গিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

স্কুলে গেলাম না কিন্তু দয়াময় প্রভু আমার সম্বন্ধে সে সময় অন্যরকম বিধান করলেন। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার পেলাম। প্রাপ্ত পুরস্কারের মধ্যে আমার পাঠ্যপুস্তক সবগুলিই ছিল। স্কুলে পড়তে লাগলাম। পরীক্ষা পাস, পুরস্কার প্রাপ্তি এ সমস্ত জীবনে নূতন জেনে খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়তে লাগলাম। নূতন পণ্ডিতমশায় একজন শিক্ষিত যোগ্য লোক। তাঁর পড়াবার রীতি দেখে মনে খুব আনন্দ হল। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সময় আমার বয়স চৌদ্দ পনেরোর মধ্যে।

সেই বারবাটি গ্রামে একজন তেলেঙ্গা জমিদার ছিলেন। নাম ইস্কাইলু শিবপ্রসাদ ভুঁইয়া। তাঁর একমাত্র পুত্র রঘুনাথ আমার সহপাঠী। রঘুনাথবাবু স্কুলে এবং তাঁর ঘরে নিযুক্ত একজন পণ্ডিতের নিকট অমরকোষ অভিধান এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়তেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সংস্কৃত পড়তে লাগলাম। এই সময় আমি খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যা পড়ায় লেগে থাকি। রাতে পড়ার উপায় নেই। ভাই নিত্যানন্দ আলো জেলে পড়াশুনা করেন। আমাকে পাশে বসতে দেন না। আলাদা আলো জেলে পড়লে জেঠাইমা রেগে ওঠেন। এইভাবে ছয়মাস মাত্র পড়াশোনা চলেছে, এমন সময় দারুণ দুর্ভাগ্যের কারণ উপস্থিত হল। আমার উপর চার পাঁচমাসের ছাত্রদত্ত বেতন পাওনা হয়ে গেছে। মাসে চার আনা পয়সা কোথা হতে পাব। ঠাকুরমাও একরকম সন্ন্যাসিনী ও উদাসীন, তাঁকে বেতন সম্বন্ধে কিছু বলতে ইচ্ছা হল না। তাঁরও এক কথা, 'পড়ে শুনে কি হবে রে, বেঁচেবর্তে থাক্, কত টাকা রোজগার করে আনবি।' মনে ভাবলাম, স্কুলে পড়া আমার এই শেষ।

আমার চাকরি

স্কুলে আর আমার পড়া হবে না, এই কথা মনে স্থির করে চুপচাপ বাড়িতে বসেছিলাম। কিন্তু বেশিদিন সেভাবে থাকতে হয় নি। সেই বারবাটির স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বাবু শিবচন্দ্র সোম আমাকে ডেকে নিয়ে স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত করলেন। মাসিক বেতন আড়াই টাকা। ঠাকুরমা আমার চাকরির কথা শুনে আনন্দে অস্থির। ঘর বারান্দায় হেথা-হোথা ছুটোছুটি করতে লাগলেন। আনন্দের বেগ কিছু কমলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'যাই হোক তুই রোজগার করতে পারলি, এবারে রক্ষা পেয়ে যাবি রে। মাসে আড়াই টাকা বেতন, কি বলিস্? আরে তুই বড় হলে ঢের বেশি টাকা রোজগার করতে পারবি রে।' ঠাকুরমার আশীর্বাদবাণী আমার জীবনে শীঘ্র সফল হয়েছিল—দুইমাস মাত্র কেবল মাসিক বেতন আড়াই টাকা হিসাবে পেয়েছিলাম। তৃতীয় মাস হতে চার টাকা হিসাবে পেলাম। সে সময়ে মাসিক চার টাকা বেতনের চাকরিও চাকরির মধ্যে গণ্য হত। সে সময়ে দেওয়ানী আদালতে আমলাদের বেতন মাসিক তিন টাকা হতে দশ টাকা অবধি ছিল। কেবল সেরেস্তাদারের বেতনে মাসে দশ টাকা ছিল। লোকে সেই সময় ওই মাত্র বেতনে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলত। কেবল চলে যাওয়া নয়, অনেকে উত্তরাধিকারীদের জন্য পাকা বাড়ি রেখে গেছেন। সে সময় হাকিমেরা কাছারির ভেতর সেরেস্তার কথা কিছু বোঝা সোঝা করতেন না। সব কাজ আমলাদের জিম্মায় ছিল। এইজন্য উপরি রোজগারের পথ বেশ পরিষ্কার ছিল। এধারে সংসারে খরচ খুব অল্প। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য খুব সুলভ। অপ্রাসঙ্গিক হলেও সেই সময়ের দ্রব্যাদির দর দামের বিষয় উল্লেখ করার ইচ্ছা করি।

সে সময় চাল এক টাকায় দেড় মণ

কলাই মণ /॥০

মুগ মণ /॥৵০

অড়হর মণ /॥৵০

তেল টাকায় সাত সের
ঘি টাকায় তিন সের।

মাছ ওজন দরে বিক্রি হত না, আন্দাজ এক পয়সায় এক সের হতে দুই সের মতন। আনাজপাতি ছিল খুব সস্তা। আবার অধিকাংশ লোককে কিনতে হত না, লোকে আপন আপন সবজি বাগান হতে পেত। দেশী কাপড় খুব সস্তা ছিল, আবার কাপড়ের কাটছাঁটের বিশেষ চলন ছিল না। একজোড়া কাপড়ে সকলের চলে যেত। কেবল আমলা এবং বড় বড় গণ্যমান্য লোকদের জন্য একটি পিরান ও একটি চাপকান প্রয়োজন হত। বোতামের নাম তখন কেউ শোনে নি। আঙরাখা বা চাপকানে চার চারটা বন্ধনী দড়ি এবং গলার কাছে এক একটা কাপড়ের ঘুন্টি বসানো থাকত। আমলা আর বড়লোকেরা বালেশ্বরী মিহি কাপড় পরতেন। অন্য লোকেরা, বিশেষ মফঃস্বলবাসী সমস্ত চাষীশ্রেণীর লোকেরা চরখায় কাটা সুতোয় বোনা কাপড় পরত। বাজারে কয়েকটা মাত্র কাপড়ের দোকান ছিল। সুতো কাটার জন্য যাদের ঘরে স্ত্রীলোক থাকত না তারাই কেবল বাজার থেকে কাপড় কিনত। কটক জেলার বালুবিসি পরগণার কাপড় বিক্রয়ের জন্য বালেশ্বরে আসত। সে সময় বালেশ্বরের কাছে কটক জেলার বালুবিসি পরগণা ওড়িশার ম্যান্‌চেস্টার ছিল। মফঃস্বলবাসী লোকে সাধারণত কাপড় কিনত না। সকলেরই কাপাসের চাষ ছিল। কাপাস ক্ষেত থেকে তুলোর ফল তোলা হবার পর পরিবারের লোক, সাধারণত বাড়ির কর্তা স্ত্রীলোকদের তুলো ভাগ করে দিতেন। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের একটি করে চরখা ছিল। সুতো কাটা হয়ে গেলে তাঁতী মজুরী নিয়ে সেই সুতোয় কাপড় বুনে দিত। মজুরী সাধারণত এক হাত কাপড়ে এক পয়সা করে ছিল। শহরবাসী বড়লোকেরা শীতকালে কেবল একটা মেরজাই গায় দিতেন। অন্য সব ঋতুতে ছোট থেকে বড় সকলে আদুড় গায়ে থাকত।

বালেশ্বরে পূর্বে দুইরকম জুতো তৈরি হত জেরপাই[১] আর মারাঠী[২]। জেরপাইয়ের দাম ছিল একজোড়া ছয় আনা অবধি, মারাঠী চটি এক টাকা

১ পা গলানো চটি।
২ শুঁড় তোলা।

জোড়া। আমলা আর খুব বড়লোকেরা কেবল পায় জুতো পরতেন তাও কেবল কাছারি, দরবার কিংবা বিশেষ জায়গায় যাবার সময়। বাহির দোর পার হয়ে জুতো ভিতরে যেত না। বাহির দোরের সামনের দিকে পায়ের জুতো খুলে চালায় গুঁজে দেওয়া হত অথবা হাতে করে তুলে নিয়ে কুলুঙ্গিতে রেখে দেওয়া হত।

প্রায় ষাট বছর পূর্বে অযোধ্যানিবাসী তিনজন ব্রাহ্মণ বালেশ্বর মোতিগঞ্জ বাজারে বিলিতি কাপড়ের দোকান প্রথম খুলেছিল। মলমল, মার্কিন, করাসী ছিট, বনাত প্রভৃতি পাঁচ-সাত রকম কাপড় তাদের দোকানে থাকত। দাম অত্যন্ত বেশি, মার্কিনের গজ বার আনা, চৌদ্দ আনা, মলমল একটাকা পাঁচসিকে। কোন একজন বড়লোক মার্কিনের চাদর কাঁধে ফেলে শহরের মধ্যে দিয়ে চলে যাবার সময় দুই পাশের লোক চেয়ে দেখে বলাবলি করত, 'দেখ দেখ কেমন চক্‌চকে মোলায়েম চাদর।' উপরিউক্ত কাপড়ওয়ালারা প্রথমে বালেশ্বরে কাপড়ের ছাতা এনেছিল। সেই ছাতাগুলি অত্যন্ত কদর্য। সিকগুলি বেতের। কাঠের বাঁটের উপর অতি বিশ্রীরকম কালরঙের কাপড় থাকত। তাও আমলা ও ধনী লোকেরা কিনত। ধনী লোকেরা সেই ছাতা উড়িয়ে চলে যাবার সময় লোকে চেয়ে থাকত। বর্তমান সময় সেরকম ছাতা চার-পাঁচ আনায়ও কেউ কিনবে না।

সে যাই হোক সে সময়ের লোকেরা শান্তিতে ছিল। অন্ন-বস্ত্রের জন্য কারও চিন্তা ছিল না। আনন্দের সঙ্গে লোকে দিন কাটাত। পালপার্বণের সময় গ্রামবাসীরা একত্র হয়ে আমোদ-আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে পড়ত। তাদের মধ্যে একের অন্যের জন্য সহানুভূতি ছিল। গ্রামের মধ্যে ছোট-বড় ব্রাহ্মণ হতে রাঢ়ি[১] ময়রা অবধি কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকত না। গ্রাম সম্পর্কে একটা কিছু আত্মীয়তার সম্বোধন থাকত, যেমন কাকা, মেসো, পিসে, মামা, ঠাকুরদা এই নামে আত্মীয় সম্পর্ক ধরে সম্বোধন করা হত। কারও কোন বিপদ উপস্থিত হলে গাঁয়ের সকলে একত্র হয়ে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করত। কারুর বাড়িতে বিবাহ শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত হলে গ্রামের লোকেরা নিজের কাজ মনে করে কর্মকর্তার দ্বারে উপস্থিত হয়ে সেই কাজ তুলে নিত। দেশের মধ্যে এত মামলা মকদ্দমা ছিল না। কারো কোন মকদ্দমার কারণ উপস্থিত হলে

কৈবর্ত বিশেষ, বৃত্তি চিঁড়ে-কোটা।

গ্রামের লোকে এক জোট হয়ে বিবাদ মীমাংসা করে দিত। লোকে বলে আজকালকার লোকেরা বড় স্বার্থপর। কেউ কারুর কাজে ঘাড় পাতে না। বাধ্য হয়ে স্বার্থপর হতে হয়েছে। সকলের সব বিষয় অভাব দেখা দিয়েছে। সকলে সংসারের চিন্তায় ডুবে আছে, পরের খবর নেবার সময় কারুর নেই।

নিজের রক্ষণ অসম্ভব,
পরের রক্ষণ কিরূপে সম্ভব।

বারবাটি স্কুলের উন্নতি

সুযোগ্য এবং শিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা চালিত হওয়ায় বারবাটি স্কুল দিন-দিন উন্নতি লাভ করতে লাগল, ছাত্রসংখ্যাও বাড়তে লাগল। কেবল একজন বাঙালী শিক্ষকদ্বারা কাজ করা সম্ভব না হওয়াতে একজন দ্বিতীয় শিক্ষক মেদিনীপুর হতে নিযুক্ত হয়ে এলেন। আমার বেতনও মাসিক পাঁচ টাকা ধার্য হল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূগোল পড়ানোর ভার আমার ওপর ন্যস্ত হল। স্কুলে বড় ম্যাপ না থাকায় সম্পাদক শিবচন্দ্র সোম মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী গভর্নমেণ্ট ইংরেজি স্কুল হতে বড় ম্যাপ আনিয়ে পড়ানো হত। স্কুল ছুটি হবার পূর্বে সেই ম্যাপ ফেরত দেবার কথা ছিল। কিছুদিন পরে আমি আমেরিকার একটি ম্যাপ নিজের হাতে আঁকলাম। স্কুল সম্পাদক, ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর ও অন্যান্য শিক্ষকেরা ম্যাপ দেখে খুব প্রশংসা করলেন। ম্যাপটির পিছনে কাপড় আটকে ওপরে ও নীচে দুটি রুল লাগিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সেই ম্যাপ দেখে ছাত্ররা ভূগোল পড়ত। গভর্নমেণ্ট স্কুল হতে আমেরিকার ম্যাপ আনার আর প্রয়োজন হল না। অন্যান্য সমস্ত ম্যাপ অঙ্কন করার ইচ্ছে ছিল কেবল উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে পারলাম না। তৃতীয় বর্ষ হতে অঙ্ক পড়াবার ভারও আমার উপর পড়ল সে সময় স্কুলে ক্ষেত্রতত্ত্বের এক অধ্যায়, ভগ্নাংশ, দশমিক, ঘনমূল ও বর্গমূল পর্যন্ত গণিত প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হল। আমি অন্যের বিনা সাহায্যে সমস্ত পাটীগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত শিখে ফেললাম। কারণ সে সময় বালেশ্বরে সে সব অঙ্ক শেখবার মতো উপযুক্ত শিক্ষক ছিল না।

স্কুলের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর মাসের শেষে একবার এসে ছাত্রদের পাঠ পরীক্ষা করতেন। সমস্ত উৎকলে মাত্র একজন ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর ছিলেন। তাঁর প্রধান কার্যক্ষেত্রের কেন্দ্র বালেশ্বর শহরে ছিল। তিনি বছরে দুবার কটক ও পুরী গিয়ে সেখানকার স্কুলগুলি দেখে আসতেন। শুনেছিলাম তাঁর অধীনে সমস্ত উৎকলে সাতটি কি আটটি মাত্র স্কুল ছিল।

আমি পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে অভিধান ও ব্যাকরণ পড়তাম কিন্তু মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্রগুলির অর্থ বোঝা আমার সামান্য বুদ্ধির অতীত ছিল। এরপরে মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ কৌমুদী চারখণ্ড এবং ঋজুপাঠ তিনখণ্ড প্রকাশিত হওয়ায় আমার সংস্কৃত শিক্ষার সুবিধা হয়েছিল। পাঁচ-ছয় বছর অবধি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পরিশ্রম করায় রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের কয়েক সর্গ, মেঘদূত, হংসদূত, পদাঙ্কদূত, শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, উত্তররামচরিত, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি কাব্য নাটকগুলি পড়ে ফেললাম। শেষে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে কাব্যপাঠ পরিত্যাগ করে পুরাণ পড়তে আরম্ভ করলাম। সংস্কৃত কাব্য পড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক না পাওয়ায় টীকা দেখে পড়তাম, নিতান্ত অবোধ্য স্থানগুলিতে চিহ্ন দিয়ে রাখতাম, কোন পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে জেনে নিতাম।

এই সময় কাছারিতে একদিন শোনা গেল একজন বাঙালীবাবু এণ্ট্রান্স পাস করে বালেশ্বরের ইংরেজি স্কুলের থার্ড মাস্টার হয়ে এসেছেন। এর আগে এণ্ট্রান্স পাস কথাটা বালেশ্বরে অজানা ছিল। হেডমাস্টার ও সেকেণ্ড মাস্টাররা এণ্ট্রান্স পাস করা ছিলেন না। মনে পড়ছে এর আগের বছর হতে এণ্ট্রান্স পাস করার রেওয়াজ আরম্ভ হয়েছিল। কাছারির আমলারা ভাবলেন ইংরেজিতে এণ্ট্রান্স পাস যে করতে পারে সে না জানি কোন্ মহাপুরুষ। কাছারি বন্ধ হওয়ামাত্র সমস্ত উকিল, মোক্তার ও মামলতকার, সেরেস্তাদার, পেশকার ও অন্যান্য আমলারা কেউ পালকীতে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে, অধিকাংশ পায়ে হেঁটে গিয়ে মাস্টারের বাসাবাড়ির দরজার সামনে উপস্থিত হলেন। মাস্টারের বাসাবাড়ি ইংরেজি স্কুলের নিকট দামোদরপুর গ্রামের পথের ধারে ছিল। বাসাবাড়িটি সাত পাঁচ বলতে একটি ঘর, সেই ঘরের একটি কোণের দিকে অর্ধেক দেওয়াল দেওয়া রান্নাঘর। প্রবেশদ্বার একটি, সামনে এক হাত চওড়া বারান্দা। ঘরটিকে ঘর বা ঝুপড়ি যা ইচ্ছে নাম দেওয়া যেতে পারে। মাসিক ভাড়া বোধহয় আট আনার মধ্যে হবে। মাস্টারবাবুর বাসার সামনের ছাঁচতলা হতে সাধারণের চলাচলের রাস্তা অবধি জনতায় পূর্ণ হয়ে যাওয়াতে মাস্টারবাবু মুশকিলে পড়লেন। অভ্যাগতদের বসতে বলবেন আসন তো দূরের কথা, জায়গা কোথায়? লোকেদের দেখে মাস্টারবাবুর মনে বোধকরি কিছু গর্ব হয়েছিল। আধময়লা একটি ছিটের কোর্তা গায়

দিয়ে আর হাঁটুঢাকা একটি থান কাপড় পরে গম্ভীরভাবে বারান্দায় টহল দিতে লাগলেন। দর্শকেরা দেবদর্শন করার তুল্য তাঁকে একদৃষ্টে দর্শন করলেন। মাস্টারবাবুর বয়স, উনিশ-কুড়ির মধ্যে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বুকের পাঁজরা হাড় গোনা যায়। চেহারা কিছু অসুন্দর, তা হোক কত গুণ? মানুষ তো আর রূপে বিকোয় না, গুণে বিকোয়। তিন-চারদিন অবধি মাস্টারের দরজায় ভিড় জমেছিল, তার পরে ক্রমশ কমে গেল।

পরের বছর বালেশ্বর গভর্নমেন্ট ইংরেজি স্কুল হতে একজন ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হল। তাঁর নাম ছিল রাধানাথ রায়[১]। কবিবর রাধানাথ রায় ছিলেন বালেশ্বর জেলার সর্বপ্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র। রাধানাথবাবুর পাসের সংবাদ বালেশ্বরে পৌঁছোবার দিন কাছারিতে খুব সোরগোল পড়ে গেল। আমলারা একজায়গায় একত্র:হয়ে বসে বলাবলি করল, 'এবারে বোঝা গেল এণ্ট্রান্স পাসটা খুব একটা বড় কথা নয়। আমাদের সুন্দরবাবুর ছোট লিকলিকে ছেলেটা পাস করে ফেলল। এটা কি আর বড় কথা হতে পারে।' রাধানাথবাবুর পিতা সুন্দরনারায়ণ রায় কাছারিতে একজন আমলা ছিলেন। এফ্‌-এ পড়ার জন্য রাধানাথবাবুকে কলকাতায় পাঠানো হল। তাঁর ছোট কাকা জাহ্নবীবাবু অভিভাবক স্বরূপ সঙ্গে গেলেন। সেই সময় কলকাতায় যেতে বড় বড় রথীরাও ভয় পেতেন। পাঁচ-সাতজন সঙ্গে না থাকলে একা যেতে কারও ভরসা হত না। বালেশ্বর হতে কলকাতা হাঁটাপথে ছিল ছয় দিনের। সে পথও অত্যন্ত কদর্য। বর্ষাকালে যেমন হাঁটু অবধি কাদা, শীতের দিনে তেমন এবড়ো-খেবড়ো, গ্রীষ্মকালে এক হাঁটু ধুলো। পথের মাঝে আবার সরাইখানায় রান্না, অধিকন্তু নদী পারের সময় ঠিকাদার মাঝিদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাছাড়া আবার চোর-ডাকাতের কথা তো এর উপর আছে। কলকাতা থেকে ভদ্রক পর্যন্ত চোরডাকাতের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল ছিল। রাহাজানি প্রতিদিন লেগে থাকত। অনেকগুলি দলবদ্ধ ডাকাত ছিল। তাদের মধ্যে সর্দার গদেই কওরার দল বালেশ্বর অঞ্চলে বিখ্যাত ছিল। তার অধীনে প্রায় ষাট-সত্তর জন ডাকাত ছিল। ডাকাতেরা রানীগঞ্জ, কলকাতা থেকে কটক

১ রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর। উৎকলনিবাসী বঙ্গীয় কায়স্থ। প্রথমে বাংলায় কবিতা লিখতেন। পরে ওড়িয়াতে কবিতা লিখে বিখ্যাত হন। 'মহাযাত্রা' নামক মহাকাব্য তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি

অবধি ঘুরে ঘুরে বিত্তশালী পথিকদের এবং মহাজনদের সন্ধান দিত। সন্ধান পেয়ে সর্দার গদেই নিজের অধীনস্থ দলকে ডাকাতি করতে পাঠিয়ে দিত। শেষে একজন মহাজনের কাছ থেকে পনেরো কুড়ি হাজার টাকা লুট করে ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছিল। শেষ জীবনে ভাগবত পুরাণ শ্রবণ, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, উপযুক্ত পাত্রে দান পুণ্য এবং অন্যান্য সৎ কার্যে সাধু লোকের মতো জীবন যাপন করে ছিল। গদেইয়ের দল ছাড়া ছোট ছোট কতকগুলি দল ছিল। তাদের ছাড়াও অনেক গ্রামের কাছাকাছি ছুটকো চোরেরও অভাব ছিল না। ছুটকো চোরগুলি সন্ধ্যার পর সড়কের কাছাকাছি আড়াল জায়গায় লুকিয়ে বসে থাকত। গোরুর গাড়ি চড়া যাত্রীদের কাছ থেকে চুরি করা ছিল এদের ব্যবসা। গোরুর গাড়ির জোয়ালের দুই পাশে চালক পা ঝুলিয়ে দিয়ে ঢুলতে ঢুলতে বলদ খেদিয়ে চলেছে। যাত্রী গাড়ির ভিতর পোয়াল ছড়িয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে আছে, এই সময় চোর গাড়ির পিছনের বেড়া কেটে হাতে যা পেত নিয়ে নিত। চলন্ত গাড়ির খড়র খড়র শব্দের জন্য বেড়া কাটার খড় খড় শব্দ শোনা যেত না। আবার যাত্রী ত নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, কিছুই জানতে পারেন না। রাত পোয়ালে জানতে পারবে। এটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল।

পথের ধারের সরাইখানায় অনেক দোকানীও ডাকাত বা ডাকাতদের সহকারী ছিল। সেই দোকানীরা সরাইখানার বাসিন্দা লোক নয়। তাদের ঘর সরাইখানা হতে এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ দূরে। সকাল হতে রাত একপ্রহর অবধি দোকান থেকে যাত্রীদের চিঁড়ে, চাল, হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি রান্নার উপযোগী দ্রব্য বিক্রী করে বাড়ি ফিরে যেত। তরকারিতে দেবার জন্য বিক্রয়ার্থ হলুদগুঁড়োয় একরকম বিষ মেশান থাকত। সেই বিষ মেশানো তরকারি খেয়ে যাত্রীরা অচেতন হয়ে পড়ে গেলে মধ্যরাতে ডাকাতরা এসে তাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেত। অতি প্রাচীনকাল হতে উৎকলের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সামান্য কর্মের আশায় কলিকাতায় যেত। বঙ্গদেশে দুই তিন বছরে রোজগার করা টাকাগুলি নিয়ে দেশে ফিরে আসার সময় তাদের উপর ডাকাতি হত। সেইহেতু তারা পঁচিশ-ত্রিশ জন দল বেঁধে দেশে ফিরে আসত। এরকম দলভারী থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর সময় সময় ডাকাতি হত। সে সময় একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল—

'হলুদ মাখামাখি
নারায়ণগড় পার হলে কুটুম দেখাদেখি।'

সে সময় নারায়ণগড় অঞ্চলটা ডাকাতের একটা আড্ডা ছিল।

পূর্বকালে তেজারতির টাকা অথবা চাকরেদের মাহিনা সমস্তই লোকে বয়ে নিয়ে যেত। বিদেশি চাকরেদের মাহিনার টাকা নেওয়া আনার জন্য উৎকলের নানা অঞ্চলের এক এক জন লোক নিযুক্ত ছিল। তাদের বলা হত হুণ্ডিআ[১]। তারা বিদেশি চাকরেদের চাকরির জায়গা থেকে টাকা এনে বাড়িতে পৌঁছে দিত। অর্থের হার অনুসারে টাকার কিছু কিছু অংশ তারা পেত। সেইটাই হত তাদের মাহিনা। হুণ্ডিআরা প্রায়ই ডাকাতের হাতে পড়ত। ডাকাতদের গোয়েন্দারা চাকর সেজে হুণ্ডিআদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। আর এক ধরনের ডাকাত হিমালয়ের পাদদেশ হতে রামেশ্বর পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র পথে পথে ঘুরে ডাকাতি করত। তাদের নাম ঠগ। পশ্চিমাঞ্চলে তাদের বাসস্থান ছিল। আশ্বিন মাস হতে আষাঢ় অবধি তাদের কার্যের সময় নিরূপিত ছিল। তাদের কার্যপ্রণালী বিস্ময়কর এবং নিষ্ঠুরতাময় ছিল। একটি টাকার জন্যও একটা লোককে মেরে ফেলতে তারা পিছু-পা হত না। ধন্য ব্রিটিশ সরকারের কৌশল এবং শাসন-পদ্ধতি। পঞ্চাশ-ষাট বছর হল সেই ঠগ বংশ একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। আমি বাল্যকালে একটি ঠগকে বন্দী অবস্থায় বালেশ্বরে দেখেছিলাম। অনেক জেলায় হাজার হাজার ঠগ বন্দী অবস্থায় ছিল। কতক ঠগের দ্বীপান্তর ও কতককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। কেবল ঠগেরাই যে বন্দী ছিল তা নয়। কেউ দুই পয়সা মূল্যের ডাকাতির জিনিস কিনেও যাবজ্জীবন বন্দী হয়ে থাকত। ঠগদের নির্মূল করার জন্য বোধ হয় এরূপ কড়া নিয়ম জারি হয়েছিল। কলকাতা যাওয়া আসার পথের বর্ণনা করতে গিয়ে অন্য বিষয়ে চলে গেলাম।

এন্ট্রান্স পাস করার সময় রাধানাথের বয়স পনেরো কি ষোল ছিল সত্যি, কিন্তু অতি শীর্ণ ও দুর্বল শরীর ছিল বলে তাকে দশবার বছরের একটি বালক মনে হত। রাধানাথ এবং তার খুড়া জাহ্নবীবাবু সন্ধ্যার সময় কলকাতা পৌঁছে একটা বাসা ঠিক করে রইলেন। তার পরদিন সকালে বিছানা হতে উঠে দুইজন প্রাতঃকৃত্য করার উদ্দেশে দুইটি ঘটি নিয়ে কোন একটা মাঠের সন্ধানে বেরুলেন অনেক বেলা অবধি চারদিকে ঘুরে ঘুরে একটা মাঠ করার জায়গা

১. যারা হুণ্ডি নিয়ে যায়

না পেয়ে কলকাতার উপর অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে বললেন এটা খুব বেশিরকম শহর।

সুন্দরনারায়ণবাবু একজন সাধারণ আমলা ছিলেন। তাঁর আয়ও সামান্য ছিল। কলকাতার খরচ যোগাতে না পারায় রাধানাথবাবু কয়েকমাস মাত্র কলকাতায় থেকে বালেশ্বরে ফিরে এলেন। তিনি বাড়িতে পড়ে এফ-এ পাস করেছিলেন।

বালেশ্বর মিশনরী স্কুলে কর্ম

বালেশ্বর মিশনরী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হল। মাসিক বেতন দশ টাকা। স্কুলের সম্পাদক রেভারেণ্ড এ. মিলার আমাকে সেই পদে নিযুক্ত করলেন। দ্বিতীয় শিক্ষকের পদও খালি ছিল। সেখানে আমার পরমবন্ধু গোবিন্দচন্দ্র পট্টনায়ক নিযুক্ত হলেন। তাঁর মাসিক সাত টাকা বেতন হল। সে সময় মাসিক দশ টাকা বেতনের পদও সম্মানজনক ছিল। কাছারির সমস্ত দপ্তরে সেরেস্তাদার ও পেশকারকে বাদ দিয়ে সকল আমলাদের বেতন দশ টাকার নীচে ছিল।

নূতন চাকরির কথা শুনে ঠাকুরমা ত আনন্দে অস্থির। জেঠামশায় ও জেঠিমার মনে কিন্তু তা ভাল লাগে নি। কারণ তাঁদের ছেলেরা তখন রোজগার করে না। এ ব্যাপারটা তাঁদের কাছে সহনীয় হল না। ঠাকুরমা খামকা আনন্দে অস্থির। আমার বেতনের একটি টাকাও তিনি স্পর্শ করেন নি। মাসের শেষে বেতনের টাকাগুলি জেঠিমা গুণে নিতেন, তাও বিরক্তির সঙ্গে। কোন মাসে একটাকা দুটাকার জামা কিম্বা চাদর একটি কিনলে জেঠিমা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলতেন, 'মাহিনার টাকায় ত কাপড় কিনলি, খাবি কি ?' আমার বেতনের টাকাগুলি তাঁর ছেলেদের কাপড় চোপড় কেনায় বা নানা প্রকার খরচে লেগে যেত। বালেশ্বর মিশন স্কুলের সেক্রেটারি রেভারেণ্ড এ. মিলার সাহেব ছিলেন দীর্ঘকায়, সুন্দর সুগঠিত দেহ, যদিও সামান্য স্থূলকায়। দোষের মধ্যে তিনি ছিলেন ভয়ানক কোপনস্বভাব। আবার কোন কথা বুঝতে চাইতেন না, যা মনে আসত করে ফেলতেন। সে সময় খ্রীষ্টান শিক্ষকের অভাবে আমাদের হিন্দুদের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন সত্য কিন্তু হিন্দুদের উপর তাঁর আদৌ আস্থা ছিল না। তাঁর মতে দেব পূজক হিন্দুরা হচ্ছে শয়তানের রূপান্তর। এটা তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। প্রত্যেক হিন্দু দেবপূজক হচ্ছে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী ও দুষ্ট। আমি একজন হিন্দু অতএব দুষ্ট ও বিশ্বাসের অযোগ্য। তিনি ওড়িয়া ভাষা ভালরূপে না জানায় স্কুলের কার্য প্রণালীও তাঁর সম্পূর্ণ অজানা ছিল। আমি

স্কুল সম্বন্ধে কোন বিষয় প্রস্তাব করলে তিনি অকারণে বিষম রেগে গিয়ে বিপরীত কোনরকম একটা হুকুম দিয়ে বসতেন। যেহেতু আমি একজন হিন্দু সুতরাং দুষ্ট লোক। এইজন্য আমার প্রস্তাব অনুমোদন করা ধার্মিক খ্রীষ্টানের পক্ষে অনুচিত মনে হত। অকারণে তাঁর ক্রোধ হতে দেখলে আমার মনে ভয় জন্মাত না। বরঞ্চ বিচিত্র ওড়িয়া ভাষা শুনে এবং অদ্ভুত হস্তপদ সঞ্চালন দেখে মনে মনে হাসতাম। আমি চুপচাপ সেখান থেকে চলে যেতাম। সেই সময় বালেশ্বর মিশন বালিকা বিদ্যালয়ে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বিশ্বনাথ শতপথী। তিনি যেমন শিক্ষিত সেইরূপ নানা বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ওড়িয়া ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি ছিলেন আধুনিক কবি, তা ছাড়া সংগীত, বিচিত্র সূচিকার্য ও কিছু কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ। ভদ্রলোক ছিলেন বিশেষ আমোদপ্রিয়। আমার সঙ্গে তাঁর বেশ বন্ধুত্ব ছিল। উপস্থিত তাঁর কবিত্ব সম্বন্ধে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। মিশন স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় ছিল একটি বড় বাঙলা ঘরের মধ্যে, মাঝখানে কেবল একখানি দেওয়ালের ব্যবধান। বালিকা বিদ্যালয়ে কেবল খ্রীষ্টান ছাত্রীরা পড়তেন। জাতিপাতের আশঙ্কায় বালিকাদের পড়ানো হিন্দুদের নিতান্ত ভয়ের বিষয় ছিল। বালিকা স্কুলে একজন বয়স্কা ছাত্রী পড়তেন, নাম শারদা। কোন প্রয়োজনে শারদাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য একটি ছোট কাগজে লিখে বিশ্বনাথের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। শতপথী মশায় সেই ছোট চিঠিটির পিছনে লিখে পাঠালেন, 'লজ্জাবতী নেচ্ছতি তত্র গন্তুম্'। আমি সেই টুকরো কাগজ নিয়ে বারান্দায় উঠে গিয়ে বিশ্বনাথ পণ্ডিতকে ডাকলাম। তিনি উপস্থিত হলে বললাম, 'শীঘ্র এই কবিতাটির পাদ পূরণ কর। একটি মাত্র চরণ লিখে আবার কবিত্ব করা ?' বিশ্বনাথ পণ্ডিত সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে বললেন,

"উত্তুঙ্গবক্ষাহি নিতম্বগুর্বী
নবীন ধারাধর চারুকেশা।
সদৈব হাস্যামৃতপূর্ণবক্ত্রা
লজ্জাবতী নেচ্ছতি তত্র গন্তুম্।"

একদিন পণ্ডিত বিশ্বনাথ শতপথী স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন। ঘটনাচক্রে সেদিন মুসলমানদের মহরম পর্ব ছিল। তার পরের দিন সেক্রেটারি মিলার সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও বিশ্বনাথ পণ্ডিত, তুমি কি কারণে না

আসিলে গত কালি।' বিশ্বনাথ—গতকাল আমার অসুখ করেছিল সেজন্য আমি আসতে পারি নি।

মিলর সাহেব—ও, তুমি মিথ্যাবাদী কাল মহরম পূজো দিতে গিয়েছিলে, তোমার উপর এক টাকা জরিমানা ঠিক হল।

বিশ্বনাথ—সাহেব, আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ, মুসলমানদের মহরম পূজা করলাম কি করে?

মিলার—ও, তোমরা সমস্ত দেবপূজক সমান আছে।

সাহেব একটাকা জরিমানা করলেন সত্যি কিন্তু তাঁর অজ্ঞতা দেখে আমরা খুব হাসলাম। আমাদের মধ্যে অন্যান্য বন্ধুরাও এক মাস যাবত এই কথা নিয়ে খুব হাস্য কৌতুক করলেন।

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ধর্মকাহিনী হাট এবং অন্যান্য প্রকাশ্য জায়গায় প্রচার করার জন্য সাহেব প্রচারক ভাইদের সঙ্গে নিয়ে মফঃস্বলের দূরবর্তী স্থানে যেতেন। প্রচারকেরা বালেশ্বরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়ে যায়।

মামলার বিবরণ—প্রচারক ভাইদের সঙ্গে সাহেব হাটের প্রকাশ্য জায়গায় ইংরেজি রাগিণীতে উচ্চকণ্ঠে প্রথমে একটি গান গাইলে হাটের লোকে সেই অপূর্ব স্বরের গান শুনতে জমা হয়ে যায়। গানের অর্থ বোঝা, হাটুরে ও পথিকদের কথা ছেড়ে দিন, কোন শিক্ষিত লোকের পক্ষেও সম্ভব নয়। সংগীত সমাপ্ত হবার পরে সাহেব নিজে বক্তৃতা আরম্ভ করেন, 'ওহে বাইরা, তোমাদের জগন্নাথ কাঠ আছে, পাষাণ আছে, সে কিছু নয়, তাহাকে বজনা করলে অনন্ত নরকে পড়বে। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট একমাত্র ত্রাণকর্তা। তাঁকে বজিলে আলোক পাইবে। স্বর্গরাজ্যের অধিকারি হবে।'

কোন নির্বোধ লোক যদি বলে ফেলে, 'না না সাহেব, আমাদের জগন্নাথ ভাল, তোমাদের যীশুখ্রীষ্ট ভাল নয়।' সাহেব হয়ে যেতেন ক্রোধে উন্মত্ত। 'ওরে দুষ্ট দেবপূজক হিন্দু, প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নিন্দা করিলি।' হাতে ঘোড়ার চাবুক থাকে, দে প্রহার। কেবল খ্রীষ্টনিন্দুককে নয়, যে সামনে আসে তাকে প্রহার। শেষে ফৌজদারি আদালতে মামলা দায়ের হয়।

ভাল রকম ওড়িয়া ভাষা জানেন বলে সাহেবের বিশ্বাস ছিল। কিছুদিন পরিশ্রম করে এক খানা ক্ষুদ্র ইংরেজি পুস্তক ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করে

ফেললেন। অনুবাদ কার্য সমাপ্ত হবার পর কথা হল আমি সেই অনুবাদ প'ড়ে ভুল সংশোধন করে দেবার পরে সর্বপ্রধান প্রচারক ভিকারি ভাই গোড়া হতে শেষ পর্যন্ত পড়ে যাবেন। ঠিক থাকলে ছাপাখানায় পাঠানো হবে। আমি পাণ্ডুলিপিখানা পেয়ে সংশোধনের কার্য আরম্ভ করে দিলাম।

আমার স্মরণ হয় পুস্তকের আরম্ভটা এইরূপ ছিল : 'আছে এরূপ ঢের লোক পৃথিবীতে যাঁহারা, তাহারা বিশ্বাস করিল না, আছেন পরমেশ্বর জগতে।' আমি উপরিলিখিত অংশটা সংশোধন করে লিখলাম, 'পৃথিবীতে অনেক লোক আছেন, যাঁরা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।'

পুস্তকখানা সংশোধন করার পর ভিকারি ভাইয়ের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি হাতের লেখা পড়তে পারতেন না। আমি পড়ে শোনাতে লাগলাম। ভিকারি ভাই ত প্রথম বাক্যটা শোনা মাত্র ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন, খুব চিৎকার করে বললেন, 'কি ? কি ? কি কথা লিখেছ পণ্ডিত মশায় ? পরমেশ্বরের হাড় ? পরমেশ্বর দেবপূজক মূর্তির ন্যায় কাঠ কিম্বা পাষাণে তৈরি যে তাঁর হাড় থাকবে ?' আমি কোন কথা বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভিকারি ভাই আমাকে বোঝাবার অনেক প্রকার চেষ্টা করছিলেন যে পরমেশ্বরের হাড় নেই। আমি শান্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভিকারি ভাই আমি হাড়ের কথা কোথায় লিখেছি ?' ভিকারি ভাই বললেন, 'এই যে লিখেছ অস্থি। হাড়কে অস্থি বলে, একথা কি আমাদের জানা নেই ?' আমাকে এই কথাটুকু বলে ভিকারি ভাই সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয়ে রাগে চিৎকার করে বললেন, 'সাহেব ভাই, পণ্ডিত মশায় তোমার পুস্তকে অপবিত্র কথা লিখে দিয়ে বইটা নষ্ট করে ফেলেছেন।'

সাহেবের ধারণা ছিল ভিকারি ভাই একজন বিদ্বান্ লোক, যেহেতু তিনি কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে ছাপানো বাইবেলের জন, লুক্, ম্যাথুর কথা পড়তে পারতেন। তাছাড়া তিনি আবার খ্রীষ্টান। সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য লোক, তাঁর কথা নিশ্চয় সত্য। আমি একজন দেবপূজক দুষ্ট হিন্দু, সুতরাং বিশ্বাসের অযোগ্য। সাহেব আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস না ক'রে ক্রোধে গর্জন করতে লাগলেন। অনেকদিন অবধি তাঁরা আমার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতেন না। রচিত পুস্তকের পরিণাম কি হল আমি জানি না।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে বালেশ্বরে খ্রীষ্টানদের পাঁচটি মাত্র

ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর ছিল। সম্প্রতি খ্রীষ্টানদের বড় বড় তিনটি গ্রাম বসে গেছে। প্রতি রবিবার দিন শত শত উপাসকমণ্ডলী দ্বারা ভজনালয় পূর্ণ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত, পদস্থ বিদ্বান লোকও দেখতে পাবেন। এসব খ্রীষ্টান কোথা থেকে এলেন ? প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দু সমাজ যেভাবে ধ্বংসের পথে চলেছে, একথা নিশ্চয় জানবেন কয়েক শতাব্দী পরে এ সমাজের অস্তিত্ব অবধি থাকবে না। সময় থাকতে প্রত্যেক চিন্তাশীল হিন্দুর পক্ষে এর প্রতিকার চিন্তা করা বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর সর্ব প্রথম ধর্মগ্রন্থ বেদ উপনিষদ এবং জগৎ-মান্য গীতা, যে জাতির মূল ধর্মশাস্ত্ররূপে অবলম্বন তাদের দুর্দশা দেখলে মনে দারুণ কষ্ট জাত হওয়া স্বাভাবিক।

রেভারেণ্ড মিলার সাহেবের নামে ফৌজদারি মামলা দায়ের হওয়ায় আমেরিকা মিশন সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। অগত্যা অধিক দিন তাঁকে আর অনর্থক কুঠিতে বসে থাকতে হয় নি। বালেশ্বর জেলার সে সময়ের কলেক্টর মিস্টার বিগন্ লড্ সাহেব গভর্নমেণ্টকে লিখে তাঁকে ডেপুটি কলেক্টর পদে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু ডেপুটি পদ পাবার কয়েক মাস পরে তাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়।

বালেশ্বর জেলার একটিং কলেক্টর আর. এইচ. পর্শি[1] সাহেব এবং জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মেয়ার্স সাহেব একসঙ্গে এক কুঠিতে থাকতেন। আমি তাঁদের পড়াতাম। আর্থিক উন্নতির আশায় আমাকে কোন সরকারি কাজে নিযুক্ত করার অনুরোধ করায় কলেক্টর পর্শি মহোদয় আমাকে বালেশ্বর কলেক্টরি সেরেস্তায় মুন্সির পদে নিযুক্ত করলেন।

কথা হচ্ছে এই ধরনের কাজ নিলে লেখাপড়া শেখার সময় পাওয়া যায় না। সেই সময় আবার রেভারেণ্ড ই. সি. বি হালম্ সাহেব বালেশ্বর মিশন স্কুলের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হওয়ায় আমার আগের কাজে ফিরে এলাম। রেভারেণ্ড হালম্ সাহেব দেখতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, সেইরূপ বিদ্বান্ গুণবান। তিনি ছিলেন অতি মিষ্টভাষী এবং স্বভাব ছিল সুন্দর ও কোমল। ওড়িয়া ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তাঁর ওড়িয়া শব্দ উচ্চারণ স্বর প্রকৃত উৎকলবাসীর স্বরের মত ছিল। কথা বলার সময় মনে হত যেন

১. বোধ হয় Percy

একজন ওড়িয়া কথা বলছেন। উৎকলে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার অপেক্ষা জ্ঞান ও সুনীতি প্রচারের অধিক প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। কাজেও তিনি তাই করতেন। ইংরেজদের ওড়িয়া শেখার সুবিধার জন্য সাহেব একখানা ওড়িয়া-ইংরেজি ব্যাকরণ সংকলন করলেন। পুস্তক রচনার সময় আমি তাঁকে কিছু সাহায্য করেছিলাম। কৃতজ্ঞ হালম্ সাহেব সেইজন্য আমার নাম তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করে গেছেন। ওড়িয়া ব্যাকরণের অন্যান্য বিষয়ে তাঁর মতের সঙ্গে আমার মতের সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও একটা বিষয়ে মতান্তর ঘটেছিল। তাঁর মতে ওড়িয়া ভাষায় সম্প্রদান বলে একটা স্বতন্ত্র কারক থাকা ঠিক নয়। কর্ম এবং সম্প্রদান উভয় কারকের বিভক্তি 'কু'[১]। এ স্থলে সম্প্রদান নাম স্বতন্ত্র রূপে উল্লেখ করার প্রয়োজন কি? কার্যত তিনি তাঁর ব্যাকরণ পুস্তকে সম্প্রদান কারকের নাম উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সময়ে উৎকলে সাহায্যকৃত বঙ্গোৎকল বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মাসিক চারটাকা বৃত্তি দিয়ে চার বছরের জন্য ইংরেজি পড়ার নিয়ম প্রচলিত হয়। প্রথম বছর চারজন মাত্র বালেশ্বর মিশন স্কুল হতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন মাসিক চারটাকা হিসাবে বৃত্তি পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আমার বড় জামাতা রঘুনাথ প্রসাদ চৌধুরী অন্যতম। সমস্ত উৎকলের মধ্যে বালেশ্বরস্থিত মিশন স্কুলে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করার জন্য গুণগ্রাহী সম্পাদক রেভারেণ্ড হালম্ সাহেব আমার বেতন পঁচিশ টাকা করে দিলেন।

এই সময় বালেশ্বর জেলার কলেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট জন বীম্স সাহেব একজন অসাধারণ পণ্ডিত বলে তৎকালীন সিভিলিয়ান মণ্ডলীর মধ্যে এবং দেশীয় শিক্ষিত সমাজে বিশেষরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এগারটা ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। সেই সময় বালেশ্বরে তিনি তাঁর আর্যভাষা সম্বন্ধে ব্যাকরণ লেখায় নিযুক্ত ছিলেন। রেভারেণ্ড হালম্ একজন সুবিখ্যাত সাহিত্যচর্চাকারী ছিলেন। এই কারণে দুই সাহেবের মধ্যে বিশেষরূপে সম্প্রীতি জন্মেছিল, জন বীম্স্ সাহেবের পঞ্চভাষিক ব্যাকরণ লেখার সময় সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া এই তিন ভাষায় অভিজ্ঞ একজন পণ্ডিতের দরকার হল। আমার পরম হিতৈষী রেভারেণ্ড ই. সি. বি. হালম্ সাহেব আমাকে সঙ্গে নিয়ে জন বীম্স সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম সাক্ষাতের পরে জন বীম্স মহোদয় সংস্কৃত তদ্ধিত

---

১. বাংলায় 'কে'

প্রত্যয় ও অব্যয় শব্দ সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে বসলেন। দৈবাৎ সেগুলির উত্তর সাহেবের মনোনীত হওয়ায় আমার সেই উত্তরগুলি তাঁর রচিত সেই পঞ্চভাষিক আর্যভাষা ব্যাকরণে যোগ করলেন। সাহেবদের মহলে আমি বিশেষরূপে পরিচিত হয়ে পড়লাম।

'নিরস্তে পাদপ দেশে এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে।'

সে সময়ে বালেশ্বরে শিক্ষিত সমাজের অপরিসর পরিধির জন্য সাহেবদের মতে আমি একজন পণ্ডিত বলে পরিচিত হয়ে পড়লাম। সপ্তাহে অন্তত একবার সাহেব আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আদেশ করলেন। কদাচিৎ একদিন বা দুদিন বিলম্ব হয়ে গেলে, দেখা হওয়া মাত্র জিজ্ঞেস করতেন, 'বাবু, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কি কারণে এত বিলম্ব করিলে ?'

সাক্ষাৎ হলে সাধারণত সাহেবের সঙ্গে ভাষা সম্বন্ধে চর্চা হত। কোনদিন বা সংস্কৃত শ্লোক কোনদিন বাংলা পদ্য, ওড়িয়া রসকল্লোল, সর্পমন্ত্র, ডাকিনী মন্ত্র এই সমস্ত বিষয় কথোপকথন হত।

সেই সময় বালেশ্বরে বাঙালী ও ওড়িয়াদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। সাহেবরা আমার স্বপক্ষে থাকায় বাঙালী হাকিম এবং বড় বড় কেরানী আমলারা আমাকে ভয় পেতেন। সে সময়ে বালেশ্বরে নিম্নশ্রেণীর হাকিম এবং বড় বড় বেতনভোগী কর্মচারী প্রায় সকলেই বাঙালী ছিলেন।

বালেশ্বরে স্ত্রী শিক্ষা প্রচার এবং উৎকল ভাষার রক্ষা ও পুষ্টি সাধন বিষয়ে আমি কলেক্টর জন বীম্‌স সাহেবের নিকটে যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছিলাম। সাহেব মহোদয় আমাকে অনেকবার অনেকরকম বিপদ হতে রক্ষা করেছেন। এরকম কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে সাহেব মহোদয় আমার পরম সহায় ও হিতৈষী ছিলেন। আমার সংসারের সর্বপ্রকার উন্নতির মূলে ছিলেন মহাত্মা জন্‌ বীম্‌স। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পবিত্র নাম স্মরণে থাকবে। তাঁর স্বর্গগত আত্মার সদ্‌গতির জন্য আমি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দুবার প্রভু পরমেশ্বরকে প্রার্থনা করি। আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে লিখছি সাহেব মহোদয় সকলকে বলে বেড়াতেন আমি একজন দেশহিতৈষী পণ্ডিত।

কটক নর্মাল স্কুলে পণ্ডিতের কাজ

বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর আর. এল. মার্টিন সাহেবের কার্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল মেদিনীপুর। ওড়িশার স্কুলগুলি পরিদর্শন করার জন্য তিনি কটকে এসেছিলেন। সেই সময় কটক নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য ছিল। মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। আমি সেই পদের প্রার্থী হতে ইচ্ছুক কিনা সাহেব পত্রের দ্বারা জানতে চাইলেন। সেই চিঠির নীচে আরও উল্লেখ করা ছিল, আমাকে সেই পদে নিযুক্ত করা হলে আমাকে অবশ্য কটক যেতে হবে। অর্থাৎ আমাকে কর্মে নিযুক্ত করার পর আমি সেই পদ গ্রহণ করায় অস্বীকার করতে পারব না। মিশন স্কুলের সম্পাদক রেভারেণ্ড ই. সি. বি. হালম সাহেব সেই সময় বালেশ্বরের উত্তরাঞ্চল জলেশ্বর এলাকায় ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে আমি তাঁর কাছে গেলাম। সাহেব মহোদয় আমার বেতন ত্রিশ টাকা করে দিয়ে কটক যেতে নিষেধ করলেন। সুতরাং আমার আর কটক যাওয়া হল না। জলেশ্বর ফেরৎ বালেশ্বর শহর হতে আট ক্রোশ উত্তরে বস্তা নামক চটিতে উপস্থিত হয়েছি, সন্ধ্যার সময় আমার বিষম আকারে জ্বরের আক্রমণ হল। সকাল নাগাদ সারা গায়ে আমার পানীবসন্ত ফুটে বেরুল। সেখান থেকে একটা পালকি ভাড়া করে বালেশ্বর চলে এলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আমার শোবার ঘরের চৌকাঠের উপর পড়ে শরীরের যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগলাম। ঠাকুরমা আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করলেন—

'তুই কটক না যাবি ত না যা, সাহেব তোকে কেন মারল বল?' আমি বার বার বলছি, সাহেব আমাকে মারে নি, আমার জ্বর হয়েছে। বসন্ত হয়েছে, বসতে পারছিনা, শিগ্‌গির বিছানা করে দাও, আমি শোব, বসতে পারছিনা। সে কথা শোনে কে? বারবার জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন, তোকে সাহেব কেন মারল বল্। অবশেষে আমাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সারা গায় বসন্ত ফুটে বেরিয়েছে দেখলেন। গায় হাত দিয়ে গরম অনুভব করায়

চুপ করে গেলেন। আমি শুয়ে আছি, ঠাকুরমা কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ঠাকুরমা, সাহেব আমাকে মেরেছেন বলে কেন বার বার জিজ্ঞেস করছিলে?' ঠাকুরমা বললেন, 'আসল কথা সাহেব তোকে মেরেছে বলে গত কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম। তোর শরীর কেমন ফুলে গেছে, ঠিক সন্ধ্যার সময় তুই চৌকাঠের উপর পড়ে যেমন কাঁদছিলি অবিকল সব কথা স্বপ্নে দেখেছি।'

স্বর্গগতা ঠাকুরমা, আমার শৈশবকাল হতে পরমেশ্বর আমার পিতামাতাকে গ্রহণ করে প্রকৃতই তোমাকে আমার জীবনপালিকা রক্ষয়িত্রীস্বরূপ নিযুক্ত করেছিলেন। প্রাণের দরদ যাকে বলে তা কেবল তোমার কাছেই পেয়েছিলাম। হায় অকৃতজ্ঞ আমি একদিনের তরেও তোমার কিছুমাত্র সেবা শুশ্রূষা করিনি, একদিনের তরেও তোমার কিছু উপকার করি ন। এখন অনুতাপ ছাড়া আমার উপায় কি?

ইংরেজি শেখার ইচ্ছা এবং শিক্ষারম্ভ

দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর আর. এল. মার্টিন সাহেব স্কুল পরিদর্শন করতে এসে বালেশ্বর সার্কিট বাঙলোয় অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমি বাঙলোয় উপস্থিত হলাম, সে সময় সাহেব নিদ্রিত ছিলেন। বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছি। একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান উপস্থিত হয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। তার বিশ্বাস হল আমি একজন ইংরেজি স্কুলের শিক্ষক। সেই মনোভাব নিয়ে কথোপকথন চালাল। আমি সে কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেও প্রতিবাদ করি নি। এজন্য লজ্জিত হলাম। স্থির করলাম সব পড়া ছেড়ে দিয়ে ইংরেজি পড়তে হবে। সেই সময় আমার বয়স বাইশ তেইশের মধ্যে। অবসর সময় সংস্কৃত কাব্য নাটক এবং বাংলা প্রাচীন ও নূতন পুস্তকগুলি পড়তাম।

বালেশ্বর মোতিগঞ্জ বাজারের দক্ষিণ প্রান্তে গড়গড়িয়া পুকুর অবস্থিত। পুকুরটা ছিল মাঝারি রকমের, সুন্দর জল, শহরবাসী অধিকাংশ লোকের পেয়। পুকুরের ধারে একটি প্রশস্ত বাঁধানো ঘাট ছিল। এই গড়গড়িয়া পুষ্করিণী বটেশ্বর মৌজার অন্তর্গত। বিদেশি অধিকাংশ আমলা, কেরানী ও শিক্ষকদের বাসাঘর ছিল এই গ্রামে। কদাচিৎ কোন ডেপুটি মুনসেফ অবধি বাসা করে থেকে যেতেন। গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে যুবক কেরানী, আমলা ও স্কুল মাস্টার পুষ্করিণীর পাকাঘাটে বায়ুসেবন ও কথোপকথনের জন্য মিলিত হতেন, আমি প্রায় প্রতিদিন সেই স্থানে উপস্থিত থাকতাম। গড়গড়িয়ার পূর্বদিকে কিছুদূরে কবিবর রাধানাথবাবুর বাসা ছিল। পশ্চিম দিকে কিছু অধিক দূরে আমাদের বাড়ি। রাধানাথ পিতার ভয়ে দিনের বেলা প্রকাশ্যভাবে আমাদের সঙ্গে বসতে পারতেন না, এক একদিন সন্ধ্যার পরে উপস্থিত হতেন।

বাবু মধুসূদন দাস[১] সে সময় গভর্নমেন্ট স্কুলের থার্ড মাস্টার ছিলেন। তাঁর

---

১. অনারেবল এম্. এস্. দাস. এম. এ, বি. এল, সি. আই. ই। ওড়িশার প্রথম ব্যারিস্টার। বিহার ওড়িশা সরকারের প্রথম ওড়িয়া মন্ত্রী। উৎকল একীকরণ আন্দোলনের প্রধান নেতা। যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। লোকে তাঁকে 'মিস্টার দাস' বলে চিনত। 'মধুবাবু' বললেও তাঁকেই বোঝাত।

ঘাড়িও গড়গড়িয়ার নিকটে—প্রায় প্রতিদিন এসে আমাদের দলে মিশতেন। আজ অর্ধ শতাব্দী কাল অতীত প্রায়। তথাপি আমার বেশ মনে আছে, সেই তরুণ বয়সেও তাঁর উঁচু ধরনের কথা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। আর উচ্চ ধরনের ব্যয় করার স্বভাব হেতু স্বল্প বেতনে তাঁর সঙ্কুলান হত না। সেইজন্য তিনি কর্মত্যাগ করে কলিকাতা চলে যান।

আমার ইংরেজি শেখবার ইচ্ছে হল। আমি একটি ফার্স্টবুক সংগ্রহ করে গড়গড়িয়া ঘাটে উপস্থিত বন্ধুদের সাহায্যে পড়তে লাগলাম। সংস্কৃত কাব্য, নাটক প্রভৃতি পাঠ পরিত্যাগ করে কেবল ইংরেজি পড়তে লাগলাম। পড়বার সময় অল্পই পেতাম। কোন ইংরেজির শিক্ষক আমার জানা ছিল না। আমার একজন বন্ধু গভর্নমেণ্ট স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন। তিনি কেবল আমাকে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। আমি নিজে নিজে ডিকস্‌নারির সাহায্যে আরেবিয়ান নাইটস্, রবিনসন্ ক্রুসো, হিস্টরি অফ বেঙ্গল, রেভারেণ্ড লালবিহারীর গোবিন্দ সামন্ত, বাইবেল, মেরি ল্যাম্বের সেক্স্‌পিয়র টেলস প্রভৃতি কয়েকখানা মাত্র ইংরেজি বই পড়েছিলাম। সেই সময় সামান্য ইংরেজি শিক্ষাই কার্য ক্ষেত্রে সহায় হয়েছিল। কতবার বড় বড় হাকিমদের সঙ্গে মামলা মকদ্দমা সম্পর্কে কথোপকথনের দরকার হয়েছে। সেই যৎসামান্য ইংরেজি জানা না থাকলে কাজ করা আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ত। সেইরূপ একটি ঘটনার বিষয় এখানে উল্লেখ করার ইচ্ছা করি। কেওন্‌ঝর আর চাঁইবাসার মধ্যে সীমানা ভূমিস্বামিত্ব সম্বন্ধে বহু বছর হতে একটা মামলা চলছিল। চিফ-কমিশনর, ডেপুটি কমিশনর, চিফ সার্ভেয়র ও কেওনঝর মহারাজার প্রধান কর্মচারির উপস্থিতিতে মামলা নিষ্পত্তি করাবার জন্য গভর্নমেণ্ট হতে তাগিদ এল।

নাগপুরের চিফ কমিশনর মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে একটা তারিখ ধার্য করে চাঁইবাসায় কাজ করতে কেওনঝরের তরফ থেকে একজন প্রধান কর্মচারিকে হাজির করাবার জন্য মহারাজকে জরুরি চিঠি লিখলেন, আমি সে সময় কেল্লার প্রধান কর্মচারি। আমার কর্মক্ষেত্র আনন্দপুর, এটা কেল্লার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান ও নিজগড় হতে পূর্বমুখে ৫২ মাইল দূরে অবস্থিত। মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে নিজগড়ে রওয়ানা হবার জন্য শহর কাছারি হতে চিঠি পেয়ে মহারাজের কাছে উপস্থিত

হলাম। সীমান্ত মামলা (Boundary Dispute Case) সম্পর্কীয় নথির সঙ্গে চিফ কমিশনরের চিঠি মহারাজ বাহাদুর আমার জিম্মা করে দিয়ে কার্য ক্ষেত্রের উদ্দেশে শীঘ্র রওয়ানা হতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। শহর কাছারির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার বাবু বিচিত্রানন্দ দাস আমাকে সাহায্য করার জন্য সঙ্গে চললেন। আমরা দুজনে দুটি হাতিতে চড়ে দুই দিন পরে কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম। বিবাদ সম্পর্কীয় জমিটা ছিল প্রায় ছয় মাইল লম্বা ও একমাইল চওড়া। দুইদিন অবধি বনের মধ্যে ঘুরে সার্ভে ম্যাপ এবং নথির কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে ভূমির সাদৃশ্য মিলিয়ে নিয়ে চাঁইবাসার উদ্দেশে বেরুলাম। বৈতরণী নদীর উত্তর কূল হতে চাঁইবাসা এলাকার জয়ন্তীগড় এবং দক্ষিণ কূল হতে কেঁওন্‌ঝরের সীমানা আরম্ভ।

জয়ন্তীগড় হতে চাঁইবাসা যাবার মধ্যে গভর্নমেণ্ট কুহ্লনের[১] মধ্যে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। জয়ন্তীগড় হতে চাঁইবাসা তিনটি বিরাম স্থানের পথ। পথের ধারে তিন জায়গায় তিনটি ডাক বাঙলো আছে। রাস্তার দুধারে এক ক্রোশ, আধ ক্রোশ দূরে ক্ষেতেরমাঝে এক একটি কোলদের বস্তি। ছোট ছোট গ্রামেরএকাধিক শুভ্রবর্ণের বাড়িগুলি সরকারি ডাক বাঙলোর কাছাকাছি তৈরি হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। গ্রামের চতুর্দিক কেবল সজিনার বাগানে বেষ্টিত। অন্য কোন রকম ফলের গাছ নেই। সব গ্রামের বাইরের দৃশ্য একই রকম। এই দুই তিন দিনের মধ্যে আমি আম, কাঁঠাল বা কোন প্রকার ফলের গাছ বা ব্যবহার্য লতাগাছ দেখলাম না। পথের দুধারে যতদূর দেখা যায় ধূ-ধূ মাঠ। কদাচিৎ ক্ষেতের মধ্যে এক একটি কার্যনিরত কোল দম্পতি দেখা যায়। উভয়েই কার্যনিরত। কখনও বা কোলটি লাইনে টানছে, কোলনী বাঁধের উপরে বসে স্বামীর কাজের পানে চেয়ে আছে। কোলনীরা গৌরবর্ণা সুগঠনা। মস্তকে নিকষ কাল সুবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশগুচ্ছ। পূর্ণ যুবতীদেরও পরনের বস্ত্রখণ্ড লম্বায় চারহাত ওসারে দেড়হাত, নাভি হতে হাঁটুর উপর পর্যন্ত আবৃত।

বেলা বারটার সময় একটা ডাক বাঙলোয় আমরা উপস্থিত হলাম। এইখানে সমস্তদিন থাকতে হবে, কারণ হাতিদের জন্য চারণের দ্রব্য সংগ্রহ এবং দানা খাওয়াবার জন্য দুপুর বেলাটা থাকা আবশ্যক। বাঙলোর চৌকিদার জানাল

১. সিংহভূম জেলার সদর চাঁইবাসার পথে কোলেদের নিবাসমহল।

সম্প্রতি হাট বসেছে, চাল ও আনাজপাতি যদি দরকার থাকে পয়সা দাও, কিনে আনি, হাট ভাঙলে পরে আর কিছু পাওয়া যাবে না। রসুয়ে বামুন বললে সঙ্গে চাল ডাল প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম যা আছে এবেলা হয়ে যাবে মনে হয়। সন্ধ্যে বেলার জন্য প্রয়োজন। আমি পয়সা দিলাম, চৌকিদার হাটের দিকে চলে গেল। বোধকরি হাট বসে এক দুই ক্রোশ দূরে, কারণ কোনো হাটুরে ও বাটুরে চলাচলের লক্ষণ দেখা গেল না।

গোটা বেলাটা খালি বসে বসে সময় কাটছে না। বাঙলোর নিকটে একটি ছোট কোলেদের পাড়া ছিল। সেই গ্রাম দেখতে গেলাম। একটি ঘরের সামনে তিনচারজন পুরুষ ও ছেলেপুলে ঘোরাফেরা করছিল, আমি ঘরের ভিতরটা দেখার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় তারা আমাকে খুব আগ্রহের সঙ্গে সাদরে ডেকে নিয়ে ঘরের সামনের উঠোনে বসাল। তিন দিকে সারিবাঁধা ছোট ছোট ঘর, একটা দিক খোলা। সেই পরিবারে স্ত্রীপুরুষ প্রায় দশবার জন, সকলেই উপস্থিত ছিল। এক ক্রোশ দুই ক্রোশের মধ্যে আর গ্রাম ছিল না। দুপুর বেলাটা ওরা কোথায়ই বা যাবে। আমি বসে বসে তাদের কাজকর্মের কথা, খাওয়া-দাওয়া, বুঙ্গা বুঙ্গির[১] কথা ইত্যাদি অনেক কথাই জিজ্ঞেস করলাম। তারা হাসতে হাসতে উত্তর দিচ্ছিল। আট-দশ হাত দূরে পরিবারের সমস্ত স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিল। তারা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসেই অস্থির, সময় সময় এক একটা প্রশ্নে পুরুষেরা অবধি হাসি সামলাতে পারছিল না, আমি যেখানে বসেছিলাম তার কাছেই উঠোনে একটা উনান ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম এই উনানটা বাইরে পাতা হয়েছে কেন? একটি পুরুষ হাসতে হাসতে বললে, এই উনানে মাংস রাঁধা হয়। কোণে একটি ছোট রান্নাঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, ওই ঘরটায় মাংস রাঁধ না কেন? মেয়েছেলেগুলি তো হেসেই অস্থির, মনে হয় গড়িয়ে পড়বে। বোধ হয় তারা স্থির করে ফেলেছে এ লোকটা আকাট মূর্খ না পাগল, ভাত রাঁধার ঘরে মাংস রাঁধার কথা বলছে।

ঘরের উত্তর দিকে আন্দাজ একশ হাত দূরে এক মুঠনি[২] হতে পাঁচ-ছ হাত পর্যন্ত উঁচু ছাড়া ছাড়া অনেকগুলি পাথরের থামের মতো পোঁতা আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলি কি?

১. ঠাকুর দেবতার

২. মুঠনি কনুই হ'তে মুষ্টিবদ্ধ হাতের সমান মাপ

উঃ—পিতৃলোক রাতে এই পাথরের উপর বসে গ্রামের দিকে তাকাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম পাথর কবে পোঁতা হয়।

উঃ—শ্রাদ্ধের দিন পোঁতা হয়।

প্রঃ—শ্রাদ্ধ কবে হয়, অর্থাৎ মৃত্যুর কতদিন পরে হয় ?

উঃ—যখন হয়, অর্থাৎ হাতে পয়সা কড়ি এলে হয়। এক বছর যাক বা দুই বছর যাক পয়সা পেলে শ্রাদ্ধ হয়।

আমি গ্রাম থেকে বাঙলোয় ফিরে গেলাম, চৌকিদার কিছু লাল বুকড়ি চাল আর দুই পা বাঁধা একটা পায়রার ছানা আমার সামনে রেখে দিল। কপোত শিশুটির পালক নেই, ক্ষুদ্র ডানাদুটি, প্রাণের ভয়ে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

এটা কি রে ?

চৌকিদার—বাবু আনাজ !

প্রঃ—আনাজ আবার কি ?

উঃ—আজ্ঞে আনাজ।

অনেকক্ষণ পরে বুঝলাম, এ দেশে ধনী লোকেরা পায়রার ডানা পুড়িয়ে কিম্বা রান্না করে খায়, আমি একটা হাতিতে চড়ে এসেছি, সঙ্গে কতকগুলি পরিচারক —নিশ্চয় একজন বাবু। অগত্যা পায়রার ছানার তরকারি খাব। চৌকিদার নিজের বুদ্ধির জোরে একথা স্থির করে আমার আহারের জন্য এই পায়রার ছানা কিনে এনেছে। এ অঞ্চলে অন্যরকম আনাজ পাতির অভাব। ইতর সাধারণের কাছে সজনে গাছ আনাজের অভাব জানতে দেয় না।

চৌকিদারকে সেই পায়রার ছানার রক্ষণ ও আহারের জন্য ধান কেনার জন্য দুই আনা পয়সা দিলাম এবং সেই ছানাটিকে বধ না করে পালন করার জন্য শক্ত হয়ে আদেশ দিলাম।

বেলা বারোটা বা একটার সময় চাঁইবাসা কাছারিতে অ্যাসিট্যাণ্ট ম্যানেজার বাবু বিচিত্রানন্দ দাসের সঙ্গে আমি উপস্থিত হলাম। চিফ কমিশনর, ডেপুটি কমিশনর, সার্ভে বিভাগের একজন উচ্চকর্মচারী তিনজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনে বসার জন্য আমাদের জন্য দুটি চৌকি দেওয়া হল। প্রথমে মামুলি অনেক কথা হবার পর কেওনঝরের জঙ্গলের বিষয় অনেক আলোচনা হল (অবশ্য সমস্ত কথাবার্তা ইংরেজিতে হচ্ছিল)। শেষে সাহেব প্রশ্ন করলেন—

Do you know everything about the case ?

আমি উত্তর দিলাম

—Yes your honour, all the records are with me. I can exaplain all the matter, but I fear your honour will not understand my broken English. So I pray, please allow me to call a pleader.

আমার কথা শেষ হবার পূর্বেই একজন সাহেব বললেন—

Oh, no Babu, don't fear, go on, you can speak English well.

মামলাটি কিঞ্চিৎ জটিল। বোঝাবার অনেক বিষয় ছিল। সাহেবদের সাক্ষাতে বিবাদস্থ জায়গা ম্যাপ এবং মামলার কাগজপত্র রেখে দিয়ে অনেকক্ষণ অবধি মামলার বিষয়বস্তু ধীরে ধীরে বোঝাতে লাগলাম। পূর্বে অনেকবার মামলা উপলক্ষে দুইপক্ষ হতে ভিন্ন ভিন্ন রকম নকশা তৈরি হয়েছিল। আমি বোঝাবার সময় সাহেবরা এক এক প্রস্থ নকশা সামনে ফেলে দেখছিলেন। আমার ইংরেজি কথা অনেক জায়গায় ভুল হয়ে যাচ্ছিল। আমার ইংরেজি শুনে সাহেবরা হাসছেন কিনা দেখবার জন্য তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। কিন্তু ধন্য তাঁরা। আমার ভুল ইংরেজি কথার প্রতি দৃষ্টি না রেখে আমার যুক্তিগুলি ম্যাপের সঙ্গে মিলছে কিনা সেই মার্বেল পাথরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিশাল গম্ভীর মূর্তিত্রয় অচল ভাবে বসে কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলেন। কেওনঝরের পক্ষ হতে বহুকাল ধরে অনেকখানি জমি খাসমহলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সে সমস্ত জমি ফিরে এল। মামলা ডিক্রি করে আনায় মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

ওড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ

মহাত্মা রেভারেণ্ড ই. সি. বি. হালম সাহেবের কাছ হতে সহানুভূতি পেয়ে উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে স্কুলের কাজ করছিলাম। স্কুল ছুটির পর অধিকাংশ সময়ই তাঁর সঙ্গে সাহিত্যচর্চা হত। আমি তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারি হওয়া সত্ত্বেও মহাত্মা আমার সঙ্গে পরমাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করতেন। ওড়িয়া জাতির উন্নতিকামী বলে আমি তাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করতাম। এই সময় খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই বৃদ্ধির অন্যতম অথবা বিশেষ কারণ উৎকলের ভীষণ দুর্ভিক্ষ। নঅচেক[১] (সন ১৮৬৩) এই লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটেছিল। সেই ভীষণ কাণ্ড লোকে আজ অবধি ভুলতে পারে নি। সেই বছরেই ৩০ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করেছিল। প্রায় ছয়পণ[২] লোকের বংশ নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। :তাদের মধ্যে অনেকেই মৃত, অবশিষ্ট ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

সে সময় আমার বয়স ২৩ বছর। বালেশ্বর মিশন স্কুলের আমি প্রধান শিক্ষক ছিলাম। আজ ৫০ বছর গত হয়েছে, কিন্তু সে সময়ের ঘটনাগুলি আমার হৃদয়ে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। ভাদ্র মাসের চারদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়ে বর্ষণ বন্ধ হল, ভাদ্রের শেষে, আশ্বিন মাসের প্রথমে লোকে জলের জন্য কাতরভাবে আকাশের দিকে চাইতে শুরু করল। কারো মুখে আর কোনো কথা শোনা যায় না, কেবল জল আর জল, কার্তিক মাসের গোড়া হতে লোকে নিতান্ত নিরাশ হয়ে পড়ল। জল হলেও রক্ষার আর উপায় নেই। ধানগাছগুলি মরতে শুরু করেছে। বালেশ্বর জেলায় একমাত্র ফসল ধান, সেই একটি মাত্র ফসলের উপর লোকের জীবন নির্ভর করে। আমার বাড়ি হতে আধ মাইল দক্ষিণে বালেশ্বর শহরের লোকের বসতি শেষ। তারপর থেকে দিগবলয় সীমা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধান ক্ষেত। মাঝে মাঝে সাগর মধ্যস্থিত দ্বীপের ন্যায় এক

১, পুরী মহারাজার রাজত্ব হতে সনের হিসাব।

২. ষোলভাগের ছয় ভাগ। অর্থাৎ ছয় আনা লোক মারা যায় বা গৃহছাড়া হয়।

একটি ছাড়া ছাড়া গ্রাম। সেই সময় প্রতিদিন সকাল নটার সময় স্নান করে একটি কম্বলের আসন বগলে গুঁজে একলা ধানের ক্ষেতে যাই, ক্ষেতের মধ্যে আসন পেতে বসে ঈশ্বরের কাছে লোক রক্ষার জন্য প্রার্থনা করি। ধানগাছগুলি শুকিয়ে কুটো হয়ে গেল। কতক ধান আধাআধি বেরিয়ে, কতকটা সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে ছোট ছোট সাদা সাদা কাশফুলের ন্যায় এপাশ ওপাশ দুলতে থাকে। লোকে গোরু গাই ক্ষেতের মধ্যে ছেড়ে দেয় কিন্তু গোরুগুলো ধানগাছ একবার শুঁকে চলে যায়, গাছ খায় না।

দিন মজুরেরা কাঁসা পেতল যা এক একটা ছিল বেচে দিয়ে যতদিন চলে চালাল। কার্তিকের শেষাশেষি যার যে দিকে দৃষ্টি গেল বেরিয়ে পড়ল। স্ত্রী পুরুষ, পিতাপুত্র কারুর সঙ্গে কারুর দেখা নেই, দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াচ্ছে। কার বাড়ি চাল আছে যে ভিক্ষে দেবে। অবস্থাপন্ন চাষীরা অবস্থানুযায়ী প্রথমে কাঁসা পিতল গোরু গাই, সোনা রুপো ঘরে যা ছিল, বিক্রি-টিক্রি করে মাঘ ফাল্গুন অবধি দাঁত কামড়ে ঘরে পড়ে রইল। সে সময় একটা বলদের দাম ধানের গৌণিতে[1] চার পাঁচ গৌণি, গাইয়ের দাম ধানের গৌণির দুই গৌণি। সোনারুপা ওজন করার নিক্তি পাল্লা নেই। আবার নিক্তি খোঁজারও তর সইছে না। দরদামের খবর নিচ্ছে কে? যত গৌণি ধান বা চাল দিবি দে। অনেক মধ্যবিত্ত লোকে টাকা কোমরে গুঁজে গাঁয়ে গাঁয়ে ধান চাল খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ধান তো নেই, যার যার ছিল লুকিয়ে ফেলেছে। ফাল্গুনের শেষে অধিকাংশ বিত্তবান চাষী, কারিগর শ্রেণীর প্রায় সকলে ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল, ঘাস পাতা যে যা পেল চিবোচ্ছে। তেঁতুল গাছে কচি পাতা বেরুবামাত্র এক-একটা গাছে দশ কুড়িজন করে চড়ে বাঁদরের মতো খুঁটে খুঁটে পাতা খাচ্ছে। যে কোনো লোকের দিকে তাকাও অস্থিচর্মসার, চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবতী বৌ-ঝি দুই তিন হাত লম্বা কাপড়ের শত শত গেরো দেওয়া ফালি কোমরে জড়িয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের মাতৃচিহ্নচর্ম দুটি বুকে ঝুলছিল। কারও কারও ক্রোড়ে অস্থিচর্মসার সন্তান চর্মতুল্য স্তনটি মুখে দিয়ে ঝুলছে। শিশুটি মৃত না জীবিত বোঝা যাচ্ছে না। মা প্রাণপণে শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে আছে। চৈত্র মাস হতে ক্রমশ

১. ওজনের পাত্র, গৌণি ওজনে দুইসের পরিমাণ।

মৃত্যু সংখ্যা বাড়তে লাগল। পথে ঘাটে, বনে, পুকুরঘাটে যেখানেই দেখ মড়া পড়ে আছে।

সে সময় উৎকলের পরম বন্ধু, পরম সহায় Ravenshaw সাহেব বোধকরি নূতন কমিশনরের পদে নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন। সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে গভর্নমেন্ট হতে কমিশনরের কাছে চিঠি এল 'অনাবৃষ্টিহেতু ওড়িশায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হবার খুব সম্ভাবনা। জনসাধারণের রক্ষার জন্য গভর্নমেন্টের তরফ হতে কোনোরকম উপায় বিধান করার আবশ্যক আছে কিনা? যদি প্রয়োজন হয় তো কিরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব?' গভর্নমেন্টের চিঠির উত্তর দেবার জন্য কমিশনর সাহেব কাছারির সমস্ত আমলাকে বসিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন। সেরেস্তাদার দুইজন বলল ওড়িশায় দুর্ভিক্ষ হলে কোনো চিন্তা নেই। মফঃস্বলের জমিদার মহাজনদের ঘরে যথেষ্ট ধান মজুত আছে, তাতে বছর খানেক চলে যাবে। সেরেস্তাদাররা সে স্থলে একথা বলে ফেলেছে, সেখানে মনোরঞ্জনের জন্য পেশকারদের তো কিছু বাড়িয়ে বলতে হবে। কমিশনরী পেশকার বললেন, গোপালপুর মৌজার জমিদার বাড়িতে দশটা মরাইভরা পঞ্চাশ হাজার ছেলা[১] ধান মজুত আছে। তাছাড়া হাজার হাজার ছেলা ধান মাটিতে পোঁতা[২] আছে। ভীমপুরের শামসাহুর বাড়ি থেকে অতি কমে চল্লিশ হাজার ছেলা ধান বেরুবে, এছাড়া গাঁয় ছোটখাটো মহাজনদের ঘরে ধান তো ভরে আছে, কেবল এরা মরাই খুলে দিলে ওড়িশাকে দুই মাসের জন্য সামলে নেবে। পলিটিক্যাল এলাকার পেশকারবাবু পঞ্চাশ হাজার ছেলা ধান হতে লক্ষ লক্ষ ছেলা ধান লোকেদের ঘরে আছে বলে হিসাব দিলেন, আর নিম্নস্থ আমলারা যা হিসেব দিলেন তার থেকে স্থির হল ওড়িশায় অসীম ধান মজুত আছে, তাতে একবছরের জন্য জনসাধারণ রক্ষা পাবে।

কমিশনর সাহেব গভর্নমেন্টকে লিখলেন, 'ওড়িশায় দুর্ভিক্ষ হবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু দেশে অনেক ধান মজুত আছে, তাতে এক বছর চলে যাবে।' কমিশনর সাহেব বড় ভুল করলেন। ওড়িশায় প্রকৃত এত ধান মজুত আছে কি নেই, খবরটা ভাল করে অনুসন্ধান করা, আবার যাদের বাড়িতে ধান মজুত আছে সঙ্কটের সময় সেই ধান তাঁরা বিক্রয় অথবা বিতরণ করাতে সম্মত হবেন

১. ৬০ গৌণি।

২. কুয়োর মতো মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখা হয়।

কিনা কথাটা ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে গভর্নমেন্টকে জানানো উচিত ছিল। উৎকল হতে ৩০ লক্ষ অবধি প্রাণী বিনাশ হওয়া, সকলে ছন্নছাড়া হয়ে যাওয়া বস্তুত যেন বিধির বিধান ছিল। এস্থলে কমিশনরের সুবুদ্ধি আর কি করে হবে।

ফাল্গুন মাস আরম্ভ হতে মড়ক শুরু হল, মৃত্যু সংখ্যা দিন বাড়তে লাগল, পথে, ঘাটে, পুষ্করিণী কূলে, মাঠে, অরণ্যে যেখানেই যাও—শব পড়ে আছে দেখবে। ক্রমশ মৃতদেহতে দেশটা যেন ছেয়ে গেল। চালের দর হয়ে গেল এক টাকায় ১০ সের। কেবল ৩/৪ দিনের জন্য টাকায় ৩/৪ সের হয়েছিল, তাও আর শহরের মধ্যে পাওয়া গেল না। ৩/৪ দিন পরে রেঙ্গুন হতে চাল আসায় যে দশ সের দর ছিল সেই দশ সের হয়ে গেল। শহরের মধ্যে সামান্য যা কিছু কিনতে পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু মফঃস্বলে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। মফঃস্বলে যাদের বাড়িতে ধান চাল ছিল তারা তা লুকিয়ে ফেলল। অধিকাংশ লোক ঘরের মধ্যে গর্ত করে পুঁতে রাখল। যে সব লোক সস্তা পেয়ে পাল পাল গাই গোরু কিনেছিলেন, অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, সেই বছরের মধ্যে সে সমস্ত কেনা গোরু তো মরলই, তাদের সঙ্গে মহাজনদের ঘরে নিজের যা গাইগোরু ছিল, সেগুলো অবধি মরে গেল। এ সমস্ত প্রত্যক্ষ বিষয় অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। যে সমস্ত ধানের মহাজন ধান বিক্রি করে ঘরে টাকা পুঁতে রেখেছিল, সে সমস্ত টাকা, সোনা কোথায় উড়ে গেল। দুর্ভিক্ষের আগের বছর ধান টাকায় বালেশ্বরী ওজনে প্রায় দেড়শ সের এবং চাল টাকায় দেড়মণ ছিল। সেই চাল দুর্ভিক্ষের বছর টাকায় দশসের হিসাবে বিক্রি হওয়ায় এরূপ দুর্যোগ উপস্থিত হয়েছিল। কেবল তাই নয়, গত পাঁচ সাত বছর হতে চাল বালেশ্বরী ১০ সের হিসাবে বিক্রি হয়ে আসছে। তবে দুর্যোগ ঘটছে না কেন? সম্প্রতি পূর্ব অপেক্ষা টাকার দর অনেক কমে গেছে। সকলের হাতেই টাকা, চাল সর্বত্র পাওয়া যায়। টাকা দিলে যত ইচ্ছা ধান চাল পাওয়া যেতে পারে। পূর্বে চাল ও টাকা উভয় বস্তুই দুর্লভ ছিল। সহসা বিদেশ হতে আনবার উপায়ও ছিল না।

মার্চ বা এপ্রিল নাগাদ কমিশনর সাহেবও ওড়িষ্যার উপস্থিত প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ধান চাল পাঠিয়ে দেবার জন্য গভর্নমেন্টের কাছে প্রার্থনা জানালেন। গভর্নমেন্ট বোধ হয় কমিশনরের পূর্ব চিঠি স্মরণ করে টেলিগ্রাম

১. ৮০ তোলা।

করলেন, তুমি চাল পাঠাবার জন্য টেলিগ্রাম করছ। কিন্তু টেলিগ্রামযোগে চাল পাঠানো সম্ভব নয়।' বর্তমানে কলকাতা হতে পুরী অবধি যে সুন্দর ট্রাঙ্ক রোড বা বড় রাস্তা দেখছেন সে সময়ে তা পায়ে চলার পথ মাত্র ছিল তাও আবার অরণ্যময়, চোর ডাকাতপূর্ণ। সুতরাং খোলা পথ দিয়ে ধান-চাল আনার সুবিধা ছিল না। নিমক মহাল উঠে যাওয়াতে বালেশ্বরী সামুদ্রিক জাহাজের বংশ বিলুপ্ত হয়েছিল। বালেশ্বরবাসী কলে-চলা জাহাজ নামক একটি পদার্থ আছে বলে কেবল নামে শুনেছিল। তথাপি গভর্নমেণ্ট কলকাতা হতে বড়বড় মানোয়ারী জাহাজ ভাড়া করে রেঙ্গুন ও বঙ্গদেশ হতে চাল পাঠাতে লাগল। সরকারের তরফ হতে জায়গায় জায়গায় অন্নছত্র খোলা হল। অন্নছত্রের কথা মফঃস্বলে প্রচার হওয়ামাত্র অন্নক্লীষ্ট কাঙ্গালেরা শহর পানে ছুটে এল। পনেরো কুড়িদিন হল অন্নের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ নেই। কচি পাতা ও অখাদ্য ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করছিল। অন্নের আশায় শহরে ছুটে এল, কিন্তু এতদূর আসতে পারবে কেন? দশ বার আনা লোক ত পথেই মরল, যারা অন্নছত্রে এসে পৌঁছতে পারল, তারা কেবল এক এক বেলা ভাত খেয়ে কেউ ওলাওঠায়, কেউ বা আমাশয় রোগে মরল। তাদের পেট ত শুকিয়ে গিয়েছিল, এধারে অন্ন পেয়ে লোভের বশে যে যত পারল এক এক পেট ভাত খেয়ে ফেলল। হজমশক্তি হারিয়েছে, এত ভাত কি পেট সামলাতে পারে। পরদিন রাত পোহাতে না পোহাতে ওলাওঠা বা অন্যরোগ দেখা দিল। দু'একদিনের মধ্যে মরে পড়ে রইল। শুষ্ক পেট কাঙ্গালীদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার উপস্থিত। সরকার বস্তা বস্তা সাগুদানা কলকাতা হতে আনিয়ে অন্নছত্র[১] গুদামে জমা করে রাখল। কাঙালীদের প্রথম কিছুদিন যাবত সাগুদানা দেবার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, প্রায় সকলেই মরল। অন্নছত্রের চতুর্দিকে এবং শহরের অন্যান্য স্থানে পথে ঘাটে যে সব লোক মরে পড়ে থাকে সকালে মেথররা তাদের গোরুর গাড়িতে তুলে নদীতে ফেলে দেয়। একমাস কি দেড় মাস অবধি মেথরদের তিন-চারটা মড়া বোঝাই গাড়ি নদীর পথে নিয়ে যেতে লেখক প্রত্যক্ষ করেছে।

সরকার যে চাল বিদেশ হতে আনিয়েছিলেন, অন্নছত্রের খরচ হবার পর

১. অন্নসত্র। ওড়িয়াতে বলে 'ছত্র'। ছত্রে যারা খায় তারা ছত্রিশ জাতের সঙ্গে খেয়েছে বলে জাত খোওয়ায়।

টাকায় ১০ সের দরে সাধারণকে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু যাকে ইচ্ছা কিম্বা যত ইচ্ছা একজনকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল না। রিলিফ কমিটি নিযুক্ত মেম্বর, লোক দেখে একসের হতে এক টাকার পর্যন্ত চাল দেবার টিকিট দিতেন। সেই টিকিট দেখিয়ে লোকে গুদাম হতে চাল নিত।

পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। দুর্ভিক্ষও চলে গেল। দুর্ভিক্ষের পরের বছর কতকগুলি বালক বালিকা এবং লোক পথে পথে ঘুরে বেড়াত। ছত্রে খাওয়া লোক বলে হিন্দু সমাজ তাদের তাড়িয়ে দিল। কিন্তু মিশনারীরা তাদের আদর করে কোলে টেনে নিলেন এবং পুত্রবৎ প্রতিপালন করে শিক্ষিত ও উপযুক্ত করতে লাগলো। এইখানেই হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের পার্থক্য জানতে পারা যায়। আমাদের সমাজের স্বধর্মাবলম্বী লোকগুলির প্রাণরক্ষার জন্য অন্যলোকের হস্তে অন্নগ্রহণ করাতে আমরা তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু দূরদেশীয় ভিন্নধর্মাবলম্বী লোক তাদের আদর করে কোলে তুলে নিয়ে প্রতিপালন ও মানুষ করলেন। এই কারণে আমরা সাহস করে বলতে প্রস্তুত যে খ্রীষ্টান ধর্ম ও জাতি পতিতপাবন। হিন্দু সমাজ যে সে সময় ছত্রে খাওয়া লোকেদের সমাজ হতে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এজন্য হিন্দু ধর্ম দায়ী নয় বস্তুত দোষ হচ্ছে অবিবেকী সমাজের। দুরবস্থায় পড়ে প্রাণরক্ষার জন্য অতি নিম্নস্তরের অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শযুক্ত অন্নগ্রহণ করা দোষের নয় বলে হিন্দু পুরাণ শাস্ত্রগুলিতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র একবার প্রাণ রক্ষার জন্য চণ্ডাল দ্বারা পাক করা কুকুরের মাংস ভক্ষণ করে পুনর্বার মহর্ষিমণ্ডলীতে স্থান পেয়েছিলেন এবিষয়ে মহাভারতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে।

The rainfall of 1865 in Orissa was scanty and ceased prematurely so that the out turn of the great crop of winter rice on which the country mainly depends was reckoned at less than a third of the average crop. Food-stocks were low both because export had been brisk of late and because the people had not been taught by precarous seasons to protect themselves by retaining sufficient stores at home. When the harvest failed so, totally new to them was the situation that no one realised its meaning and its probable results. The local Government and officials not taking alarm and misconceiving the gravity of the occasion

abstained from making special enquiries, price all along remained so moderate that they offered no temptation to importers and forced no reduction in consumption on the inhabitants, till suddenly the province was found to be almost bare of food. It was only in May 1866 that it was discovered that the markets were so empty that the jail prisoners and the Government establishments could not be supplied. But the southern monsoon had now begun and importation by sea or land become impossible. Orissa coast at that time almost isolated from the rest of India. The only road leading to Calcutta across a country intersected by large rivers and liable to inundation, was unmetalled and unbridged and there was very little communication by sea for what trade there was had hitherto been a purely export trade, carried on in the months of fine weather. No relief could be obtained from the south where lay the district of Ganjam, itself severely distressed. By great exertions and at enormous cost, the Government threw in about ten thousand tons of food grain by the end of November and this was given away gratuitously, or sold at low rates or distributed in wages to the starving population saving, no doubt, many thousand of lives. But meanwhile, the mortality those whom this relief did not reach, or reached too late, had been very great and it was estimated that about a third of the population or nearly 1,000,000 persons had died.

[Report of the famine commission of 1878 quoted in Buckland's *Bengal under the Lieutenant Government* p. 329]

ঠাকুরমার পরলোক গমন

ঠাকুরমার পরলোক যাত্রা আমার জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ১৮৬৭ সাল জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন অপরাহ্ন পাঁচটার সময় আমার জীবনদাত্রী প্রতিপালিকা ঠাকুরমা কোচিলা দেঙ্গী দেহত্যাগ করলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় চুয়াত্তর। আমার জীবন রক্ষার জন্য যেন পরমেশ্বর আজ অবধি তাঁকে পৃথিবীতে রেখেছিলেন। আমি এখন আত্মরক্ষা করতে সমর্থ, এই আবর্জনাপূর্ণ পৃথিবীতে তাঁর অধিককাল থাকার প্রয়োজন হল না।

ঠাকুরদাদা কুশ সেনাপতি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারীতে দারোয়ান কিম্বা জমাদার এরূপ একটা কোন সামান্য কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই বিদেশে তাঁর মৃত্যু হয়। সে সময় ঠাকুরমা অসহায়া, দুটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রসন্তান বর্তমান। আমার জীবন রক্ষা ও পৃথিবীর জ্বালা যন্ত্রণা বহন করা যেন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। ঠাকুরমা ছিলেন মধ্যমাকৃতি গৌরবর্ণা ও সুগঠিতা। নীরোগ কর্মঠ শরীর। চুয়াত্তর বছর বয়স অবধি তাঁর দাঁত পড়ে নি। মাথায় প্রায় অর্ধেক কেশ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তিনি ধীর প্রকৃতির ও সরল স্বভাবের ছিলেন। সুষমস্বভাব, কথাবার্তাও কোমল এবং ধীর শান্ত ছিল। চিৎকার করে কথা বলতে তাঁকে কখনও শুনি নি। সে সময় গ্রামে কয়েকজন কলহপ্রিয়া বিধবা ছিলেন, তাদের মধ্যে কলহ আরম্ভ হলে ঠাকুরমা নিজের ঘরের কবাটে খিল দিতেন। আমার জ্যাঠাইমা অর্থাৎ তাঁর বড় পুত্রবধূ কিঞ্চিৎ গর্বিতা ও কর্কশ-ভাষিণী ছিলেন। কোন কারণে তর্জন গর্জন করে গালি গালাজ করলে ঠাকুরমা সেই জায়গা থেকে পালিয়ে যেতেন, মনে বেশি কষ্ট হলে ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণে লুকিয়ে বসে চোখের জল ফেলতেন। তাঁর উচ্চহাস্য কখনও শুনি নি। সর্বদা যেন একটি ঘোর বিষাদের কালিমার ছায়া তার মুখটি আচ্ছন্ন করে রাখত। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, সব রকম ব্রত তিনি পালন করতেন—বছরের অধিকাংশ মাস উপবাস এবং হবিষ্যি করে কাটাতেন। গোমাতার স্কন্ধে অর্থাৎ গোরুর গাড়িতে চড়া পাপ, সেজন্য পায়ে হেঁটে তীর্থস্থান

ভ্রমণ করতেন। তিন-চার মাস অন্তর একএকবার বাতজনিত জ্বর হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পীড়ায় শয্যাগত হতে তাঁকে আমরা কখনও দেখি নি।

ব্রাহ্ম মুহূর্তের পূর্ব হতে শয্যা ত্যাগ করে অর্ধরাত্রি অবধি মুখ বুজে গৃহকর্মে নিরত থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কারুর পানে তাকিয়ে কথা বলতেন না। মধ্যাহ্নে ও স্নানান্তে পুজোআর্চা, সন্ধ্যার সময় মালা জপ এবং পুরাণ শ্রবণ ভিন্ন অন্য সময় গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। মাঝ রাতের সময় সকলের আহার ও শয়ন হলে পর আহার করে শুতে যেতেন। তাঁর নিদ্রার কাল মাত্র ৩।৪ ঘণ্টা ছিল, তাও এত পাতলা যে ঘরের মধ্যে কিছু শব্দ হলে কিম্বা কেউ ডাকলে উঠে বসতেন।

তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল তিনটি বাঁশের পেটরা। একটি ছোট পেটিতে শেকড় বাকড় ও নানা প্রকার ওষুধ পূর্ণ থাকত। দ্বিতীয়টি বাগানের সময়োপযোগী ফসলের বীজ। তৃতীয়টি অতিবৃহৎ ঘরের যা কিছু ভাঙা চোরা জিনিস তাতে জমা হোত, কোনও জিনিস তিনি ফেলে দিতেন না। ঘরের অথবা গ্রামের কোন শিশু পীড়িত হলে নিজে চিকিৎসা করতে বসে যেতেন। তাঁর মতে ছেলেপুলের রোগের কথা কবিরাজ আবার কি বুঝবে। সে সময় ডাক্তারের নাম গ্রামবাসী শোনে নি। বাড়ির পিছনে এক টুকরো বাগান ছিল। ঘরের কাজ হতে অবসর পেলে একটি মালিকে নিয়ে তিনি বাগানের কাজে লেগে যেতেন। সাময়িক ফল-ফুলুরিতে বাগানটি সর্বদা পূর্ণ থাকত, বাজার থেকে কোনোরকম শাক সবজি কেনার দরকার হত না। ঠাকুরমা চলে গেছেন, বাগানে তাঁর হাতের রোপিত আম্রকানন এখনও বিদ্যমান।

বাড়িতে সকলের সেবা এবং নানারকম কষ্ট ভোগ করা যেন তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তাঁর কষ্টের বিশেষ কারণ ছিল আমার পিতার মৃত্যু। আমার জীবন রক্ষার জন্য তিনি কত কষ্ট ভোগ করেছিলেন সে কথা স্মরণ হলে মনে দারুণ কষ্ট হয়। আমার অসুখের সময় দিনের পর দিন মাসের পর মাস কত রাত কত দিন অনাহার অনিদ্রায় কেটেছে। গাই যেমন মাঠে চরবার সময়ও নিজের বাছুরের প্রতি দৃষ্টি রাখে ঠাকুরমা সেইরূপ যে কোন কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি থাকত। প্রথম কলকাতা যাত্রার সময় আমার বয়স ছিল কুড়ি-বাইশের মধ্যে। কলকাতা হতে ফিরে ঘরে পৌঁছালাম সন্ধ্যার সময়। ঠাকুরমা আমার দিকে চেয়ে পাগলিনীর ন্যায় ঘরে-বারান্দায়-

উঠোনে কেঁদে কেঁদে আধ ঘণ্টা কাল অবধি জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়ালেন।
হে দয়াময় পরমেশ্বর! অসহায় শিশু সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য কোমল স্বভাবা নারীর হৃদয়ে কি মায়া-মমতা স্নেহের বীজ রোপণ করেছ। বস্তুত আমার অসহায় জীবনরক্ষার কারণ ঠাকুরমার নিঃস্বার্থ আত্মবলিদান, আর আমার জীবনে যা কিছু উন্নতি ঠাকুরমার পুণ্যপ্রভাবের ফল বলে আমি মনে করি

বালেশ্বরে প্রেস কোম্পানি স্থাপন (১)

বলতে গেলে ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের পর বঙ্গভাষার উন্নতি ও বিস্তৃতি আরম্ভ হয়। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞবর অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয় কর্তৃক পুস্তক রচনা হওয়াতে বঙ্গ ও ওড়িশায় স্কুলগুলিতে পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর হয়েছিল। খ্যাতনামা প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত লোহারাম প্রভৃতি মহাত্মারা পাটীগণিত, বীজগণিত, ভূগোল, ব্যাকরণ প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেছিলেন। সেই পুস্তকগুলি মধ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেছিল। তৎপূর্বে স্কুলগুলিতে যেসব পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত ছিল সে সবের ভাষা যেমন কদর্য, বিষয়বস্তুও সেইরূপ অনুপযুক্ত ছিল। কিন্তু উৎকল ভাষায় যে তিনভাগ নীতিকথা ও হিতোপদেশ স্কুলের আরম্ভ হতে পাঠ্যপুস্তকরূপে নিরূপিত ছিল তা অদ্যাবধি সেইরূপই আছে। নূতন পুস্তক বেরোচ্ছে না। উৎকল ভাষায় বিষয় উল্লেখের সময় বাঙালী শিক্ষক ও অন্যান্য বাঙালী বাবুরা যেরূপ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে মন্তব্য প্রকাশ করতেন প্রকৃতপক্ষে তা আপন মাতার প্রতি অপমান করার ন্যায় আমার মনে হত। নিন্দুকদের প্রতি আমার বিষম ক্রোধ হত এবং প্রাণে আঘাত লাগত। সে সময় মনের মধ্যে এমন একটা ধারণা জন্মে গেল যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি না হলে চিরকাল ভিন্নদেশীয় লোকদের কাছে অবজ্ঞা পেতে হবে এবং আমাদের জাতীয় অবস্থার উন্নতি লাভ করার সম্ভাবনা বিরল হয়ে দাঁড়াবে। ভাষা উন্নতির উপায় কি? বর্তমানে দিবানিশি ভাবনা এবং একমাত্র লক্ষ্য যে কোনো উপায়ে মাতৃভাষার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। সে সময় আমার বয়স ১৯।২০র মধ্যে। আমি বিদ্যাহীন, শক্তিহীন ও দরিদ্র। সে সময় বঙ্গভাষায় প্রতি মাসে নানা বিষয়ে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছিল। আমি কয়েকটি পুস্তক নিজের খরচে কিনি। কতক বালেশ্বর শহরস্থিত সুনহাট গ্রামনিবাসী বাবু দামোদরপ্রসাদ দাসের পুস্তকালয় হতে এনে পড়তাম।

দামোদরবাবু নিজে পড়ুন বা নাই পড়ুন আমাদের অধ্যয়নের জন্য সবরকম পুস্তক ক্রয় করে রাখতেন। এখন মনে পড়ছে সে সময়ে প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে অধিকাংশর ভাষা কদর্য এবং বিষয়বস্তু নীতিজ্ঞানবিশিষ্ট লোকের পক্ষে নিতান্ত অপাঠ্য ছিল। সুখের বিষয়, সে সমস্ত পুস্তকের নাম একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে অল্প সংখ্যক উত্তম পুস্তক ছিল, তা অদ্যাবধি আছে এবং বঙ্গ সাহিত্যজগতে রত্নস্বরূপ চিরকাল বিদ্যমান থাকবে।

বাংলা ভাষার একখানা নূতন পুস্তক হস্তগত হলে আমি অনেকক্ষণ অবধি সেটা হাতে ধরে উল্টে পাল্টে চতুর্দিক দেখতাম এবং মনে মনে ভাবতাম কবে উৎকল ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তক বেরুবে। অজ্ঞাতসারে আমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ত। সে সময় বঙ্গভাষায় একটি মাত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। নাম বিবিধার্থ সংগ্রহ। আমার ভাই নিত্যানন্দ সেই পত্রিকার গ্রাহক ছিল। আমি তাঁর কাছ থেকে পত্রিকাটা পড়তে পাই এবং ৩।৪ বার করে পড়ি। সেই সময় বঙ্গভাষায় দুইটি মাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুত, নাম 'সোমপ্রকাশ' এবং 'এডুকেশন গেজেট'। বালেশ্বর নিবাসী একজন প্রসিদ্ধ জমিদার 'সোমপ্রকাশের' গ্রাহক ছিলেন, 'এডুকেশন গেজেট' জেলা স্কুলে আসত। বহু কষ্টে বহু যত্ন ও অনুসরণের ফলে কদাচিত এক এক সময় এক এক খানা পড়তে পেতাম। বিশেষ ব্যাকুলতার সঙ্গে সময় সময় মনে এই ভাবের উদয় হত যে ওড়িয়া ভাষায় কি এরূপ সাপ্তাহিক সম্বাদপত্র বেরোবে না? সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যজড়িত উত্তর মনের মধ্যে জেগে উঠত—অসম্ভব, অসম্ভব! সেই সময় কলকাতায় সরকার বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে একটি অনুবাদক সমিতি গঠিত হয়েছিল। সময় সময় কোন কোন বিদ্বান্ লোকের ইংরেজি হতে এক একটা পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করে সহস্র সহস্র টাকা পুরস্কার পাবার কথা শুনতাম। অনূদিত পুস্তকগুলি এনে পড়ার পর ঈর্ষানলে প্রাণ যেন দগ্ধ হয়ে যেত। মনে ভাবতাম সরকার কেন উৎকলে অনুবাদ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন না?

দিবানিশি মনের মধ্যে ভাবনা—দেশস্থ শিক্ষিত বড় লোকদের মাতৃভাষার প্রতি কবে অনুরাগ জাত হবে? সেই সময় দেশের ইংরেজি এবং ফারসী পড়ুয়া বাবুরা ওড়িয়া পুস্তক স্পর্শ করা কিংবা বিশুদ্ধরূপে ওড়িয়া কথা বলা অপমান বা কথঞ্চিৎ প্রত্যবায়ের বিষয় বলে মনে করত। আমলাদের কথা অর্ধেক ওড়িয়া অর্ধেক ফারসী। লেখাও বিচিত্র কথোপকথন তুল্য ছিল।

নিজের নিজের ঘরের হিসাবপত্র লেখাও ফারসী ভাষায়। পূর্বে কাছারির ভাষা সম্পূর্ণ ফারসী ছিল। ১৮৩৬ সালে সরকার বাহাদুর তা রহিত করে দেশীয় ভাষা প্রচলনের আদেশ প্রদান করলেন। হলে কি হবে। আমলা বাবুরা বহু যত্ন ও পরিশ্রম করে ফারসী শিখেছিলেন। সেই ভাষায় লেখা ও কথাবার্তায় তা ব্যবহার করা সমাজের গৌরবের বিষয় ছিল এবং ওড়িয়া লেখায় অভ্যাস না থাকার জন্য বাইরের দরখাস্ত প্রভৃতি ওড়িয়া ভাষায় লিখিত হচ্ছিল সত্য কিন্তু বহু বছর ধরে কাছারির আভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্রি বই প্রভৃতি ফারসীতে লিখিত হচ্ছিল।

বালেশ্বর বারবাটি স্কুল এবং মিশন স্কুলে ওড়িয়া পড়া হত। জেলা স্কুলের ছেলেদের ওড়িয়া পড়ানোর জন্য সরকার হতে হুকুম এসেছিল সত্য কিন্তু ছাত্রদের হাতে কখনও ওড়িয়া পুস্তক দেখা যায় নি। ছাত্রেরা ওড়িয়া পুস্তক কেনার জন্য অভিভাবকদের কাছে পয়সা চাইলে উত্তর পেত, তুই ত পাঠশালায় শিক্ষকমশায়ের কাছে ওড়িয়া শিখে নিয়েছিস আর ওড়িয়া বইয়ের কি দরকার ? যা ইংরেজি পড় গিয়ে রোজ। জেলা স্কুলে সংস্কৃত ও ওড়িয়া পড়াবার জন্য সোরোনিবাসী আর্তত্রান নন্দ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। পূর্বে সংস্কৃত পড়ুয়া পণ্ডিতেরাও ওড়িয়া পড়তে ও পড়াতে ঘৃণা বোধ করতেন। নিজেরাও ওড়িয়া হাতের লেখা পড়তে পারতেন না কিম্বা লিখতে জানতেন না। প্রবাসে অবস্থিত পণ্ডিতেরা বাড়িতে চিঠি লিখতে হলে অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। ছাত্ররা যদি ওড়িয়া পুস্তক কিনে না আনত তবে ত ভাল কথা, পণ্ডিত মশাই ছাত্রদের কেবল বিদ্যাসাগর রচিত উপক্রমণিকা বইটি পড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। এধারে স্কুলের সব শিক্ষক বাঙালী। ছাত্রেরা ওড়িয়া পড়ল কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার তাঁদের প্রয়োজন কি ? বরঞ্চ ওড়িয়াটা যাতে স্কুল হতে উঠে যায় তবে ত আরো উত্তম কথা। ইংরেজি স্কুলের ছাত্রেরা ইংরেজিমেশা বাংলা কথা ভিন্ন ওড়িয়া কথা বলা অপমানের বিষয় বলে মনে করত। এইরূপ ত্র্যহস্পর্শ মুহূর্তে পড়ে ওড়িয়া ভাষাটা ইংরেজি স্কুল হতে একেবারে বিতাড়িত হল।

পূজ্যপাদ জগন্নাথ দাস, মহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ, কবিবর অভিমন্যু ও দীনকৃষ্ণ দাসের স্বর্গগত পবিত্র আত্মাদের উদ্দেশে ভক্তিপূর্বক বার বার নমস্কার করছি। বস্তুত এই মহাত্মাগণ উৎকল সাহিত্যের রক্ষাকারী। এঁদের রচিত পুস্তকগুলি উৎকল ভাষার গোড়াপত্তন করে। যতদিন উৎকল ভাষা থাকবে ততদিন এই মহাত্মাদের মহিমান্বিত নাম উৎকলে বিরাজ করবে।

উৎকলের প্রত্যেক গ্রামে জগন্নাথ দাসের ভাগবত পঠিত হত। বড় বড় গ্রামে স্থায়ী ভাগবত মণ্ডপ বিরাজ করছে ও পূজা পাচ্ছে। পূর্বে পাঠশালা-গুলিতে উক্ত ভাগবত ও অন্যান্য কবিদের 'ছান্দ'[১] কবিতাগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে নিরূপিত ছিল। মফঃস্বলবাসী জমিদারদের সভা এবং খণ্ডায়তদের চৌপাড়ী-গুলিতে ছান্দ পুস্তকগুলির আলোচনা চিত্তবিনোদনের একটি প্রধান উপায় ছিল। উৎকলের একটি নাম করা গানের দল ছিল। গড়জাত এলাকায় ভ্রমণ করে রাজাদের গান ও তার ব্যাখ্যা শোনান তাদের ব্যবসা ছিল। অরাজকতা অর্থাৎ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় উৎকল সাহিত্যের ভাণ্ডার হতে বহুপ্রকার পুস্তক নষ্ট হয়ে গেছে, লোকে অরণ্যানী ও পর্বতমালার মধ্যে আত্মগোপন করে প্রাণরক্ষা করছিল, সাহিত্য গ্রন্থ রক্ষা করার অবকাশ কই? তথাপি অনেকগুলি পুস্তক হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়েছিল। সেগুলি অদ্যাবধি বিরাজ করছে এবং চিরকাল থাকবে।

সে সময় উৎকল ভাষার উন্নতি সাধন আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। অন্যান্য কাজে নিযুক্ত থেকেও কেবল সেই বিষয় মনের মধ্যে চিন্তা করতাম। বঙ্গভাষায় দিনের পর দিন যেরূপ নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে আর আমার মনের লক্ষ্য কি উপায়ে সেইরূপ পুস্তক উৎকল ভাষায় বের হবে। কথা হচ্ছে লেখক কই? আমি কি আর লিখতে পারব না? সময় সময় বাঙলা 'সোমপ্রকাশে' কিছু কিছু লেখা দিতাম। আমার প্রেরিত পত্রগুলি সম্পাদক ছাপিয়ে দেওয়ায় লেখায় আমার মনে সাহস ও উৎসাহজাত হল। আমাদের গ্রামে একটি কৃষ্ণ-লীলা যাত্রাদল ছিল। কতকগুলি চতুষ্পদী রচনা করে তাদের গাইতে দিলাম। ছেলেরা যাত্রায় সেগুলি গান করায় মনের মধ্যে আনন্দজাত হল। সময় পেলে কিছু একটা লিখে ফেলতাম। সেগুলি ভূত না প্রেত কি লেখা বেরোচ্ছিল মনে নেই। এইরূপ লিখতে লিখতে গদ্যে একটি পুস্তক লিখে ফেললাম—নাম দিলাম 'রাজপুত্র ইতিহাস'। বন্ধুদের দেখালাম। তারা পড়ে আনন্দিত হল। সব তো হল। এখন সেগুলি ছাপাই কি করে। এই আমার চিন্তা। উৎকলের একমাত্র পতিত পাবন, কটক মিশন প্রেস। পুস্তক ছাপাবার খরচের বিষয় জিজ্ঞেস করার পর জানতে পারলাম এক ফর্মা ত্রিশ টাকা। হিসাব করে

১. ওড়িয়ার নিজস্ব ছন্দে লেখা কবিতা। প্রত্যেকটি সুর করে পড়তে হয়। রাগ রাগিণী নির্দেশ করা থাকে। আধুনিক কবিরা আর সে প্রথা মানেন না।

দেখলাম আমার বইটা ছাপাতে তিনশত টাকা দরকার। হরিবোল হরি ? কোথায় টাকা, আমি বা কোথায়। তখন অবধি একশ টাকা একসঙ্গে হাতে ধরি নি। মাইনে যা মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা পাচ্ছিলাম তা পাবার দিনই জ্যেঠিমার জিম্মা করে দেওয়া আবশ্যক হত। কিছু বিলম্ব হলে কৈফিয়ৎ দিতে হত। পুস্তক ছাপানোর বিষয় একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লাম। আমার উদাসীনতা ও অবহেলাহেতু 'রাজপুত্র ইতিহাস'ও কোথায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু লেখা ছাড়লাম না, আমার এই আশা ছিল আমার লেখা দেখলে আর কেউ লেখায় উৎসাহ পাবে ও পুস্তক ছাপাবার প্রেরণা পাবে। বাঙালীবাবুদের বিদ্রূপ ইদানিং আমার অসহ্য হয়ে পড়েছিল, স্থির হয়ে থাকা অসম্ভব। পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের আদেশে তাঁর রচিত বাংলায় জীবন চরিতখানি উৎকল ভাষায় অনুবাদ করে কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হতে ছাপিয়ে আনলাম। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় হিতোপদেশ রহিত হয়ে জীবন চরিত পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত হল। এবং পরে একটি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ এবং একটি ক্ষুদ্র অঙ্ক পুস্তক লিখলাম। সে দুটিও স্কুলের পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়ানো হল। এই সময় আমার সহপাঠী ইকাইলু রঘুনাথপ্রসাদ ভূঁইয়া শ্রেণীপাঠ নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখে প্রকাশ করলেন। সেটিও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হল। কেবল এইটুকুতে আমার মন ভরল না। ভেবে দেখলাম কেবল স্কুলের ছাত্ররা ওড়িয়া বই পড়লে আর বিশেষ কি হবে ? বাইরের সর্বসাধারণ বই পড়লে তবে তো মাতৃভাষা উন্নতি লাভ করবে। বিশেষত সেই সময় সাধারণ লোক গদ্য সাহিত্য পড়তে জানত না। নীতিকথা কিম্বা হিতোপদেশ তাদের হাতে দিলে তাঁরা খুব একটা উচ্চ রাগিণীতে ছন্দে গান পড়ার মতো সুর করে পড়ে বসতেন। বস্তুত, নানারূপ রাগিণীতে যতরকমভাবে সম্ভব পড়ার চেষ্টা করলেও পদ মিলত না। অবশেষে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রেগে গিয়ে বলতেন, পদ মিলবে না এটা কি ছাপা বই না কি গো ? আমাদের ইচ্ছা লোকে ঘরে ঘরে বসে বই পড়েন। আসলে দেখা গেল, পদ্য ছন্দোবদ্ধ পুস্তক না হলে তারা পড়বে না। তাদের পড়ার মতো ছন্দোবদ্ধ পদ্য লেখার সাধ্য আমার নেই। চিন্তা করলে বুদ্ধি বেরোয়। কতদিন ধরে ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি দেখা দিল। যে সব পুরাতন পদ্য কাব্যগ্রন্থ আছে সেগুলি ছাপালে ঢের পুস্তক বেরিয়ে পড়বে, লোকে আনন্দিত হয়ে কিনে পড়বে। এধারে পুস্তক বিক্রয় করে ঢের অর্থ লাভ হবে। সেই

টাকায় ক্রমে ক্রমে আরো ঢের পুস্তক ছাপানো যেতে পারে। মনে মনে কথাগুলি সুন্দর আঁকা হয়ে গেল সত্যি, কিন্তু মূল পদার্থ টাকা কই? কার বলে কাজ আরম্ভ করা যাবে? সেই সময় জানতে পারলাম অর্থবল বুদ্ধিবলের ন্যায়, লোক-বলেরও আবশ্যক। উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি সভা ডাকা হল। সেখানে সভ্য হলেন বাবু জয়কৃষ্ণ চৌধুরী, বাবু ভোলানাথ সামন্তরায়, বাবু দামোদরপ্রসাদ দাস, বাবু রাধানাথ রায় আর ফকীরমোহন সেনাপতি। বাবু দামোদরপ্রসাদ দাস সভার সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ হলেন।

বাবু রাধানাথ রায় সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হলেন সত্যি, কিন্তু স্থির হল কোনো কাগজপত্রে তাঁর নাম উল্লেখ করা হবে না। তিনি সর্বদা গোপনীয়ভাবে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। কারণ কোনো সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া কিম্বা কারও সঙ্গে মেলামেশা করে ঘুরে বেড়ানো তাঁর পিতা বাবু সুন্দরনারায়ণ রায়ের কঠিনভাবে নিষেধ ছিল। প্রায় প্রতিদিন রাত্রে সুনহাট গ্রামে বাবু দামোদরপ্রসাদ দাসের বৈঠকখানা ঘরে সভা বসত। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত তিন প্রকার। আদ্য বিষয়ে সকলের সমান অধিকার। রাধানাথ তখনও এফ-এ পাস করেন নি। ঘরে বসে কেবল পড়ছিলেন। অনেক দিন তর্ক বিতর্কের পর সমিতিতে স্থির হল উৎকলের সমস্ত প্রাচীন কাব্য ছাপানো হবে। প্রথমে রসকল্লোল হতে কার্যারম্ভ করার প্রয়োজন। তার বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য পুস্তক ছাপানো হবে। রসকল্লোলের ছাপানোর খরচ সংগ্রহের জন্য একটি কোম্পানি স্থাপন করা আবশ্যক। এবং এক এক অংশের মূল্য দুই টাকা ধার্য হল। তিন চার মাস যত্ন করে আড়াইশ টাকা মূলধন সংগ্রহ করা হল। এই সংগৃহীত অর্থ কোষাধ্যক্ষ দামোদর বাবুর জিম্মায় রইল।

এখন ছাপানোর কাজের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমরা কয়েকজন সমিতির সভ্য মল্লিনাথ[১] সেজে রসকল্লোলের উপর টীকা লেখায় বসে গেলাম। প্রথমে বিভিন্ন জায়গা হতে চারটি বই সংগ্রহ করা হল। বিভিন্ন সংস্করণের চারটি বইয়ের বিষয়বস্তু মিলিয়ে বিশুদ্ধভাবে একটি পুস্তক লেখা হল। অমর-কোষ এবং আরো তিন চারখানা অভিধান কাছে পড়ে থাকত। এক একটি শব্দার্থ নিরূপণের জন্য আমাদের মধ্যে যেরূপ বাদানুবাদ চলত, সে সব উল্লেখ

১ কালিদাসের কাব্যের বিখ্যাত ভাষ্যকার।

করে বর্তমান পাঠকদের হাস্যোদ্রেক করার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। প্রতিদিন রাত্রি সাতটা হতে নয়টা পর্যন্ত টীকা লেখার কাজ চলত। চার মাস অবধি গভীর যত্ন এবং পরিশ্রম করে কাজ আধাআধি আন্দাজ হয়ে গেল। এই সময় মনের মধ্যে অন্য রকম চিন্তার উদ্রেক হল। যদি কেবল রসকল্লোলখানা ছাপানো হয়, আপাততঃ একটা কাব্য ছাপা হয়ে যাবে সত্যি, কিন্তু অন্যান্য পুস্তকগুলি ছাপাতে ঢের দেরি হয়ে যাবে। যদি একটি প্রেস কোম্পানি স্থাপন করা যায়, তবে একসঙ্গে অনেকগুলি পুস্তক সহজেই ছাপাতে পারা যাবে। এই ঘটনার চার পাঁচ বছর পূর্বে কটকে প্রিন্টিং কোম্পানি স্থাপিত হয়েছিল। তারই আদর্শে একটি কোম্পানি গঠন করা হবে কথা স্থির হয়ে গেল। কথা হচ্ছে প্রেস কী পদার্থ সেটা মাটির তৈরি না কাঠের তার জন্য কি কি উপাদান দরকার, প্রেস স্থাপন করতে কত টাকা দরকার এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান আমাদের মধ্যে কারও একজনেরও ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ একজন অবধি প্রেস কিম্বা প্রেস সম্পর্কীয় কোন পদার্থ দেখে নি। অথচ প্রেস করার কথা স্থির হয়ে গেল। রসকল্লোলের টীকার কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কোম্পানির মূল পুঁজি ধনাধ্যক্ষের তহবিল হতে কোথায় উড়ে গেল দেখলাম, সে টাকা উদ্ধার করতে হলে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটবে, সুতরাং প্রেসের কার্য বিষয় বাধা পড়ার সম্ভাবনা। এই সমস্ত বিবেচনা করে চুপচাপ থাকতে হল।

প্রেস কোম্পানি স্থাপন (২)

একটি প্রেস কোম্পানি স্থাপন করার কথা সভায় স্থির হয়ে গেল। তার নাম দেওয়া হল পি. এম. সেনাপতি এণ্ড কোং উৎকল প্রেস। কোম্পানির একটি অংশের মূল্য পাঁচ টাকা। সমিতিতে সব কথাই তো স্থির হল।

'আর সব কথা রাখ তুলে
টাকাই হচ্ছে সবার মূলে।'

পূর্বেই বলেছি আমরা সকলে বিত্তবান। টিউশন্ এবং কাগজ প্রভৃতির ব্যবসা হতে আমার মাসিক ২০ টাকা অবধি আয় হত। জ্যেঠিমা প্রতি মাসে আমার মাইনের টাকা এক একটি করে গুনে নিতেন। উপরি আয়ের টাকা হতে প্রতি মাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পনেরটি টাকা কলকাতার ফকিরমোহন সাহানীর কাছে না পাঠালে নয়। আর কয়েকটি টাকা দরিদ্র ছেলেদের স্কুলের মাহিনা, বই কেনা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচে শেষ হয়ে যেত। সে সব কথা এইখানেই শেষ হোক। আমরা সভার চারজন সভ্য কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের জন্য পথে বেরিয়ে পড়লাম। শহরে যত জমিদার, মহাজন আমলা প্রভৃতি ছিলেন তাদের সকলের কাজে ক্রমান্বয়ে চার পাঁচ মাস অবধি ঘোরাঘুরি করতে হল। কোন কোন বাবুর দ্বারে আট দশ হতে পনেরো কুড়িবার অবধি যেতে হল। প্রতিদিন সন্ধ্যা হতে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হত। প্রেস কি পদার্থ তা থেকে কত লাভ হবে এসব বিষয়ে সকলের সমান জ্ঞান। একদল লোক তখন অবধি প্রেসের নামও শোনে নি। তবে সে সময় বাংলা পাঁজি, চৈতন্য চরিতামৃত ও স্কুলপাঠ্য ছাপা বইগুলি দেখতে পাওয়ায় প্রেসে বই ছাপানোর বিষয় কাউকে বিশেষ বোঝাতে হল না। প্রেসের উপকারিতা সম্বন্ধে লোকের সামনে তিন চার ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়ে বিষয়টি বোঝাতে হত। কোনো কোনো লোককে পাঁচ সাত বার করে বোঝাবার প্রয়োজন হত। কয়েক মাস অবধি প্রতিদিন বলে বলে বক্তৃতাটা মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনো বাবুর কাছে গেলে বক্তৃতাটা অনায়াসে বেরিয়ে আসত। বক্তৃতার সারমর্ম—'যাঁরা কোম্পানির

অংশ কিনবেন তাঁরা ঢের টাকা লাভ করবেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ ছাপা হলে খুব সস্তায় বিক্রি হবে, সকলে নিজে নিজে পড়তে পারবেন। পুঁথি পাঠককে আর ডাকতে হবে না। বাড়িতে বসে ছেলেদের বই পড়ে জ্ঞান হবে, কোনো বাইরের লোক আমাদের উড়ে মেড়া বলে গাল দিতে পারবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।' কেউ প্রেসের উপকারিতা বুঝতে পেরে, কেউ লাভের আশায়, কেউ বা আমাদের বার বার অনুরোধের ফলে প্রেস কোম্পানির অংশ কিনতে সম্মত হলেন। চার পাঁচ মাস অবিরাম পরিশ্রমের ফলে বারশ টাকা সংগ্রহ করে কোষাধ্যক্ষের কাছে গচ্ছিত রইল। এখন প্রথম প্রশ্ন বই ছাপানোর জন্য অভিজ্ঞ লোক কোথায়? সে সময় কম্পোজিটার, প্রেসম্যান ইত্যাদি শব্দ কারও জানা ছিল না। সন্ধান করে জানা গেল উৎকলে কারিগরের অভাব। কলকাতা হতে কম্পোজিটার, প্রিণ্টার, প্রেসম্যান ইত্যাদি উপাধিধারী লোকদের আনতে হলে পুঁজি কয়েক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। প্রেসের সরঞ্জাম কেনার টাকা কুলোবে না। বই ছাপার বিষয় শিখে আসতে আমার মাতুল পুত্র একটি ভাইকে কলকাতায় পাঠালাম, ছাপাখানার জন্য কি কি জিনিস কিনতে হবে ও সে সমস্তর দাম কত এবিষয় অনুসন্ধান করে লিখে পাঠাবার জন্য তাকে নির্দেশ দিলাম। কলকাতায় থেকে কাজ শিখতে হলে খাওয়া খরচ ইত্যাদির জন্য মাসিক পনেরো টাকা প্রয়োজন। টাকা কোত্থেকে আসবে। কোম্পানির পুঁজি থেকে টাকা দিলে যন্ত্রপাতি কিনতে পরে টাকায় কুলোবে না। কি আর করি নিজের হাত থেকে দিতে হল। এক বছর অবধি তাকে মাসিক পনেরো টাকা করে খরচ পাঠাতে লাগলাম।

ছাপাখানা সম্পর্কীয় বস্তুগুলির নাম এবং কোন্ জিনিস কত পরিমাণে প্রয়োজন সে সমস্ত মূল্যের হার ইত্যাদি বিষয়ে কলকাতা হতে পত্রযোগে খবর পেলাম। তা থেকে জানা গেল অক্ষর অর্থাৎ টাইপ নামক পদার্থের প্রয়োজন। কিন্তু ওড়িয়া অক্ষর কলকাতায় পাওয়া যায় না, কলকাতার উত্তরাঞ্চলে রামচন্দ্র কর্মকার নামক একজন লোক ওড়িয়া অক্ষর তৈরি করে সন্ধান পেয়ে তার কাছে গেলাম। সে লোকটি ওড়িয়া অক্ষর চেনে না, ছাপার অক্ষর দেখে অক্ষর তৈরি করে দেয়। অক্ষরগুলি বিশ্রী, যাই হোক পাওয়া গেল, এই আমার সৌভাগ্য। অক্ষর তৈরি করার জন্য অগ্রিম টাকা দিয়ে এলাম, সে পরে অক্ষর প্রস্তুত করে

পাঠিয়ে দিল। প্রয়োজনীয় অক্ষর এবং অন্যান্য সরঞ্জামের দাম মোট হিসেব দেখা গেল, সব সুদ্ধ আটশ টাকা খরচ হবে, বাকি চারশ টাকা উদ্বৃত্ত থাকছে। কলকাতায় কোম্পানিগুলিতে পত্র লিখে এবং অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করে জানতে পারা গেল সাত আটশ টাকার কমে একটি ভাল প্রেস পাওয়া যাবে না। তবে কি এত পরিশ্রম, এত আয়োজন সব বৃথা যাবে ? মেদিনীপুরে মিশনারীদের একটা ছাপাখানা ছিল, সেখানে অল্প মূল্যে ছাপার যন্ত্র পাবার সম্ভাবনা আছে কিনা অনুসন্ধান করে পত্র লিখলাম, পত্রের উত্তর আসার পূর্বেই চার পাঁচদিনের মধ্যে গোরুর গাড়িতে একটি ছাপার যন্ত্র আমার কাছে এসে পৌছল। যন্ত্রটির দৈর্ঘ্য প্রায় দুই ফুট, চওড়া দুই ফুট, উচ্চতা প্রায় দেড় ফুট হবে একটি সমচতুষ্কোণ বাক্সের ন্যায়, ওপরে একটা মোটা ফাঁপা লোহার রুল গড়িয়ে যায়। মূল্য ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ করি শ দেড়েক হবে। যন্ত্রটি দেখে আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। বোধ হয় বর্তমান সময় একটি বিশাল জমিদারি দৈবাৎ হস্তগত হলেও সেরূপ আনন্দিত হওয়া সম্ভব নয়।

ছাপাখানা সম্পর্কীয় সরঞ্জামগুলি বালেশ্বরী জাহাজে ক্রমে ক্রমে আসতে লাগল। জাহাজ কলকাতা হতে বালেশ্বর আসতে হাওয়ার টান অনুযায়ী আট দশ দিন হতে কুড়ি দিন পর্যন্ত লাগত। সবার শেষে টাইপগুলি নিয়ে জগন্নাথ বাবুও এসে পৌছলেন। আমাদের বিশ্বাস জগন্নাথ ছাপাখানা সম্পর্কীয় সমস্ত কাজ শিখে এসেছেন। এখন কাজ আরম্ভ করে দিলে সব ঠিক চলবে।

বালেশ্বরে মোতিগঞ্জ বাজারের মধ্যিখানে আমাদের একটি কোঠা ঘর ছিল। সে বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হত। জ্যেঠামশাই-এর কাছ হতে সেই বাড়িটি ভাড়া নিলাম, সেখানে ছাপাখানা স্থাপন করা হবে ঠিক হল। প্রিন্টার অর্থাৎ জগন্নাথবাবু সমস্ত জিনিস সে ঘরে সাজিয়ে রাখলেন। ছাপাখানার কাজ চালাবার জন্য আরো ছয়জন লোক নিযুক্ত করা হল।

প্রিন্টার তাদের কাজ শিখিয়ে দেবে। অক্ষরগুলি জুড়ে যন্ত্রের ভিতর সাজানো হল। অক্ষরের উপর কালি লাগানোর জন্য একটি কাঠের রুলে লোহার হাতল লাগিয়ে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। সেই কাঠের রুলে কালি লাগিয়ে টাইপের উপর গড়িয়ে দেওয়াতে কলখানা ঘড় ঘড় করে গড়িয়ে গেল। তাঁর উপরে কাগজ দেওয়া হল, নিশ্বাস বন্ধ করে শত শত লোক চেয়ে আছে। এইবারে যন্ত্রের ভিতর হতে ছাপা বেরুবে। এ কি হল বাবু! একটা অক্ষর অবধি

ছাপায় বেরুল না, কাগজের স্থানে স্থানে ছোপ ছোপ কালি লেগে আছে। প্রিন্টারও শুকনো মুখে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের কাছে পৃথিবীটা অন্ধকারময় মনে হল। লজ্জা ও মনের কষ্টে মুখ হতে কথা সরছে না। আজ ছাপার কাজ আরম্ভ হবে বলে আনন্দে ঘোষণা করা হয়েছিল। মোতিগঞ্জ বাজারের প্রায় অর্ধেক দোকান বন্ধ। শহরের বড় বড় লোক ছাপার কাজ দেখতে এসেছেন। ছাপাখানার সামনের রাস্তায়ও জনতা। পথে লোক চলাচল বন্ধ। আমাদেরও বিষম শোচনীয় অবস্থা. তার উপর আবার শত শত প্রশ্নজাল আমাদের ঘিরে ফেলেছে—ছাপা কই? অতি কষ্টে উত্তর দিলাম—'আজ কাগজে কেবল কালি দেওয়া হল এরপর এসবের মধ্যে অক্ষর ফুটে বেরুবে।' আমাদের মতো সামান্য লোকের পক্ষে ঘোর বিপদের সময় তুচ্ছ আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য যে কোনো প্রকার মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নিতে পশ্চাৎপদ হলে চলবে কি করে। ধিক্! বর্তমান জীবনকে ধিক্‌কার দিলে হবে কি?

জগন্নাথ কলকাতার ছাপাখানাগুলিতে দেখে এসেছিল কাঠের রুলের টাইপের উপরে কালি লাগানো হয়। বস্তুত কেবল রুলটা কিরূপে তৈরি করা হয় জানত না, মনে মনে ভাবলেন রুলটা ঠিকমত তৈরি হয় নি বলে অক্ষরে সমানভাবে কালি লাগছে না। মিস্ত্রি ডাকা হল। রঁাদা দিয়ে ও শিরীষ কাগজের সাহায্যে ঘষে রুলটা মসৃণ করা হল। কিন্তু ফল হল 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।'

এখন দিবারাত্রি আর কিছু নয়, আর কোনো ধারে দৃষ্টি নেই, চোখের সামনে অবস্থিত কলটা যেন আর সব কিছু হতে দৃষ্টিকে আবৃত করে রেখেছে। নানা উপায় অবলম্বনে ও প্রচণ্ড পরিশ্রমে ব্যর্থকাম হয়ে চার পাঁচদিন পরে একটা উপায় মনে জেগে উঠল। রুলের উপরে একখানা মোটা কোমল চামড়া জড়িয়ে দিলে কালি সমানভাবে লাগতে পারে। চিন্তা উদয় মাত্র কার্যারম্ভ। মুচি এল। কলের উপর চামড়া জড়িয়ে দেওয়া হল। ফলে যা হয়েছিল, পাঠক মহাশয় বুঝে নিন। আর লেখার দরকার নাই। আট দশ দিন অবধি গভীর চিন্তা, পরিশ্রম ও উপায় অবলম্বনে ব্যর্থকাম হয়ে কলকাতায় চিঠি লিখলাম। উত্তর এল শিরীষ আঠা গলিয়ে রুলের উপর লাগাতে হবে। শিরীষ গালানো হল একটা বাটিতে গরম গরম তরল অবস্থায় রুলের উপরে সব ধারে ভাল করে মাখিয়ে দেওয়া হল এর ফল কি হল?

কলকাতায় আবার পত্র লিখলাম, রুল প্রস্তুত করা সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে নির্দেশ লিখিত হয়ে এল, ভাগের হিসাব অনুসারে গুড় এবং শিরীষ মিশিয়ে গালানো হবে। এধারে ছাঁচের ভিতরে ঠিক মাঝখানে কাঠের রুলটা রেখে গরম তরল শিরীষ ছাঁচের ভিতর থেকে শিরীষ শীতল হয়ে গেলে রুল কর্মের উপযোগী হবে। বেশ কথা। চিঠির অর্থ পরিষ্কাররূপে বোঝা গেল, বস্তুতঃ মোল্ড-এর ভিতর রুল ভরে শিরীষ ঢালা হবে। মোল্ড কথাটা তো ইংরেজি, তার অর্থ ছাঁচ। সেই ছাঁচের আকার কিরূপ, কি পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়েছে কিছু বোঝা গেল না। কাকেই বা জিজ্ঞেস করব। আমাদের মতো বালেশ্বরবাসীদের উর্ধ্বতন বহু পুরুষের মধ্যে প্রেস রুলের অস্তিত্ব বৃত্তান্ত অগোচর। আবার কলকাতায় চিঠি লিখে উত্তর আনার সময় কই? বাড়ির বাইরে গেলে সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি পথে ঘাটে কাছারিতে ছোট বড় সব রকম লোকেদের কেবল একই প্রশ্ন শুনতে হত। কবে ছাপা বেরুবে? লজ্জায় অন্তরের দুর্দশার কথা খুলে বলা যায় না।

হেসে হেসে খুব উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দেওয়া হত হাঁ হাঁ ছাপা বেরুলো বলে। ঘরে বাইরে স্ত্রীলোকদের মধ্যেও এই প্রশ্ন শোনা যেত। কি করে কি দিয়ে মোল্ড প্রস্তুত হবে দিবানিশি কেবল এই চিন্তা। কল্পনায় কতরকম মোল্ড তৈরি হয়ে ভেঙে গেল। তিন-চার দিন চিন্তা করার পর একরকম ছাঁচ মনে জেগে উঠল। গ্রামের নিকট একটি কাঁসারিদের পাড়া। কাঁসা পিতল প্রভৃতি ঢালাই করে বাসন গড়া তাদের ব্যবসা।

তাদের মোল্ডের আকার প্রকার বুঝিয়ে দিলাম, এক সপ্তাহের মধ্যে তারা একটা পিতলের মোল্ড ঢালাই করে দিল। তাতে আঠারো টাকা খরচ হল। তার সাহায্যে সুন্দর উপযুক্তরূপে রুল প্রস্তুত হয়ে গেল। এইবার ছাপার কাজ আরম্ভ হল, হায়, হায় একি হোল। ছাপার অর্ধেক অক্ষর উঠছে না, ডান পাশটা উঠলে বাঁ পাশ ওঠে না, বাঁ পাশ উঠলে ডান পাশ ওঠে না। নিরবিচ্ছিন্নভাবে পনেরো দিনের একান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল। সেই প্রেসটা অব্যবহার্য বলে মেদিনীপুর মিশন প্রেস সেটা ফেলে দিয়েছিল, একথা তখনও জানতাম না। এ প্রেস যন্ত্রে ছাপা হতে পারবে না বলে স্থির করলাম। কলকাতা হতে একটি নূতন যন্ত্র আনানোর প্রয়োজন। তা নাহলে এক বছর ধরে আয়োজন ও অর্থব্যয় সমস্ত ব্যর্থ হয়।

আ-ট-শ-টা-কা? কোত্থেকে আসবে? যদি চাঁদা তুলতে যাই, টাকা তো আর পাব না, অধিকন্তু তিরস্কার বিদ্রূপ প্রাপ্তি অপরিহার্য, হয়ত টাকা কর্জ করা যেতে পারে, কিন্তু কে কোন্ ভরসায় আমাকে এতগুলি টাকা ধার দেবে। এক বিপদ অনেক বিপদ ডেকে আনে। জ্যৈষ্ঠ মাসের সময় প্রচণ্ড রোদ, দিবারাত্রি দৌড় ঝাঁপ, দুর্ভাবনা আহার নিদ্রার অনিয়মহেতু দিনে আট দশবার রক্ত উদরাময় হতে লাগল। একদিন যন্ত্র সাজাবার জন্য অনেকবেলা অবধি প্রচণ্ড রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ঘামে সমস্ত কাপড় ভিজে গেছে পশ্চাৎভাগে রক্তস্রাবহেতু কাপড় ভিজে, রক্ত মেঝেতে বয়ে যাচ্ছে। বাড়ি এসে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। সেসময় অনেক দিন রাত নটার সময় প্রেস হতে এসে বাড়ি পৌছানো মাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। নিজের দুর্দশার কথা কারুকেই জানাতাম না। সাহস করে হেসে হেসে লোকেদের সঙ্গে প্রেস সম্বন্ধে কথাবার্তা করতাম। দৃঢ়ভাবে হাল ধরে বসেছি। এঘোর দুর্যোগে পড়ে মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করলাম প্রেস স্থাপন, নচেৎ জীবন ত্যাগ।

কোনো সৎকার্যে নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণে লেগে থাকলে দয়াময় প্রভু সহায় হন, বালেশ্বরের অন্যতম প্রধান জমিদার এবং মহাজন বাবু মদনমোহন দাসের ভাই বাবু কিশোরীমোহন দাস আমার একজন প্রকৃত বন্ধু ও সহায় ছিলেন। প্রার্থনা করা মাত্র বিনা লেখা পড়ায় আমাকে আটশত টাকা ধার দিলেন। একটি সুপার রয়েল কলম্বিয়ান প্রেস কলকাতা থেকে আনালাম। সে সময় বর্ষাকালে বালেশ্বরী জাহাজের যাতায়াত বন্ধ, সেই হেতু প্রেসটি গোরুর গাড়িতে কলকাতা হতে এল। সে পথ এখন পাথরকুচি ঢালাই করা জগন্নাথ সড়ক (ট্রাঙ্ক রোড), সম্প্রতি পাকা করা হয়েছে কিন্তু সে সময় কেবল মাটির রাস্তা ছিল। বর্ষাকালে তা যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ত। জায়গায় জায়গায় বোঝাই গোরুর গাড়ি কাদায় বসে যেত। পাশের গ্রামগুলি হতে মজুর এনে গাড়ি তোলাতে হত। আমাদের প্রেস বোঝাই গাড়ি দাঁতন বাজারের মাঝ রাস্তায় কাদায় বসে গেল। পনেরো কুড়িজন মজুর দিয়ে বাজারের রাস্তা পার করে দিতে আট দিন লেগেছিল। যাই হোক, প্রেস কলকাতা থেকে বেরিয়ে বাইশ দিনে বালেশ্বরে পৌছলো। বর্তমানে সর্বপ্রকার অভাব দুযোগ গত হয়েছে। মব নিযুক্ত লোকজন কাজ শিখে গেছে। ওড়িয়া একং ইংরেজি সুন্দররূপে ছাপা হচ্ছে। একদিন বালেশ্বর জেলার কলেক্টর বিগ্‌নোলড্ সাহেব আমাকে

ডাকিয়ে খুব আনন্দিত মনে ধন্যবাদ দিলেন এবং আমাদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য কাছারির অনেকগুলি ফরম্ ছাপাতে দিলেন। সেই সমস্ত ফরম্ ছাপিয়ে প্রথম উদ্যোগে অনেক টাকা লাভ হয়েছিল, রথযাত্রার রথ দেখার ন্যায় প্রেস দেখার জন্য দুই তিন মাস ধরে দূর দূরান্তর হতে লোকেরা সারি সারি ছুটে আসছিল। মফঃস্বল হতে জমিদারেরা পাল্কি চড়ে ছাপাখানা দেখতে আসছিলেন এ কথা বললে পাঠক বিশ্বাস করবেন কি? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এটা সত্য ঘটনা। ছাপার কাজ আরম্ভ হবার ছয় মাস পরে বিগ্‌নোলড্ ও পরবর্তী কলেক্টর জন বীমস সাহেবের সঙ্গে উৎকলের পরম হিতৈষী টি. রেভেন্‌শ সাহেব একদিন প্রাতঃকালে ছাপাখানায় উপস্থিত হলেন। প্রেসের সমস্ত জিনিসপত্র দেখলেন। প্রেস স্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে আমাদের দশ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ দিয়ে গেলেন। কিন্তু আমরা সেই টাকা নিজেদের জন্য না নিয়ে সাহেব মহোদয়ের নামে কোম্পানির দুইটি শেয়ার স্বরূপ জমা করে দিলাম। কোম্পানি ভেঙে যাওয়ার পর লাভের সঙ্গে তাঁকে ৩০ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

ছাপাখানার কাজ আরম্ভের দিন হতে অনেক মাস অবধি বালেশ্বরের বাসিন্দারা দলবদ্ধ হয়ে কাজ দেখতে আসছিলেন। আজ ছাপার বহুল প্রচারের দিনে লোকে একথা আশ্চর্য মনে করতে পারে। কিন্তু লণ্ডন শহরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হওয়ার দিন স্বয়ং ব্রিটেনের মহামান্য অধীশ্বর মহামান্যা কুইনের সঙ্গে ছাপারূপ অদ্ভুত ঘটনা দেখতে ছাপাখানায় শুভাগমন করেছিলেন। তা আবার অতি বিশ্রী কাঠের তৈরি যন্ত্র ছিল।

পূজা পার্বণ উপলক্ষে বালেশ্বর শহরস্থ প্রধান ব্যবসায়ী মহাজন বাবু মদন-মোহন দাসের বাড়িতে শহরস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত লোক নিমন্ত্রিত হতেন। বাবু রাধানাথ রায় ও আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। প্রকাশ্য সভায় রাধানাথবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি যেভাবে প্রেস কোম্পানি স্থাপন করেছেন, তা ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত।' হা রাধানাথ! তুমি মহাযাত্রা করে এই কালির অক্ষরে ছাপাখানার উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে রাখার জন্য আমাকে ফেলে গেছ।

ছাপাখানার কাজ সুন্দররূপে চলতে লাগল। কাছারির ফর্ম্ প্রভৃতি ছাপার কার্যে যথেষ্ট টাকা লাভ হচ্ছিল। সময় সময় এক একটা পুস্তকও ছাপা হত। ইতিপূর্বে কটক প্রিন্টিং কোম্পানি "উৎকল দীপিকা" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা

প্রকাশ করতেন। আমাদের প্রেস হতে কোম্পানির কার্য পরিচালনা সমিতি একটি পাক্ষিক পত্রিকা বার করার জন্য প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্ত করলেন, তদনুসারে "বোধদায়িনী" এবং "বালেশ্বর সম্বাদবাহিকা" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হল। বোধদায়িনী অংশ সাহিত্য বিষয়ক এবং বালেশ্বর সম্বাদবাহিকা অংশ সংবাদ প্রচার বিষয়ক। পত্রিকা বেরুলো কিন্তু লেখকের অভাব। আমি সারাদিন স্কুলের ও প্রেসের কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। রাতে বিশেষ কোন কাজ করার শক্তি থাকে না। সুতরাং পত্রিকাটি অনিয়মিত ভাবে বেরোত। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। আট-দশ জনের নিকট হতে মূল্য আদায় হচ্ছিল। অনুমান কুড়ি-পঁচিশ জন মাত্র তাও পড়তেন কি না সন্দেহ। যা হোক ছাপার কাজ সুন্দররূপে চলছিল।

মফঃস্বলে স্কুল স্থাপনের চেষ্টা

আমাদের পূর্বোক্ত সমিতিতে প্রস্তাব হল ভাষার বহুল প্রচার হবার জন্য মফঃস্বল অঞ্চলে স্কুল স্থাপন করা উচিত। স্থির হল মফঃস্বলে প্রত্যেক বড় বড় গ্রামে স্কুল স্থাপন করার চেষ্টা করা হবে। এখন এ প্রসঙ্গ লেখার সময় মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ হাস্যোদ্রেক হচ্ছে। প্রস্তাবকারী সকলেই বিত্তহীন এবং বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য। কি সাহসে এ ধরনের ব্যয়সাধ্য দুরূহ কার্য সাধনের জন্য ইচ্ছা করেছিলাম। যাই হোক আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল হল রেমণা গ্রাম। রেমণা বালেশ্বর শহরের পশ্চিমে, প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে। বহুকাল পূর্ব হতে এই গ্রামের নাম বঙ্গদেশ এবং উৎকলে সুবিখ্যাত, গোপীনাথজীর বিগ্রহ মন্দির এই গ্রামে বিরাজিত। চৈতন্যদেব পুরী যাত্রার সময় এই মন্দিরে বাস করে গিয়েছিলেন, বহু পূর্বে বৃন্দাবন ধাম নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। সেই ধামের মহিমা প্রচারিত হবার কারণ শ্রীচৈতন্যদেব। বৃন্দাবনধামে গোবিন্দজীর বিগ্রহ স্থাপিত হবার পরে বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে তাঁর অর্চনার কী প্রকার ব্যবস্থা হবে এই প্রশ্ন উঠল। পুরীর গোঁসাই মাধব রেমণায় এসে গোপীনাথ জীউর পূজার পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করে গেলেন, সেই ভাবে গোবিন্দজীউর পূজা অর্চনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পূর্বে নিমক তৈরির সময় শহরের প্রধান প্রধান কায়স্থ[১] আমলাদের বাসস্থান ছিল রেমণা। কলিকাতার নিকটবর্তী শালিকাস্থিত প্রধান গোলা হতে কাছারির আমলা নিযুক্ত হয়ে আসতেন। আবার বালেশ্বরের মধ্যে এটি একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র গণ্য হওয়ায় অনেক বাণিজ্য ব্যবসায়ীর এটি বাসস্থান ছিল। আমরা প্রায় সকল সভ্য একটি স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে রেমণা যাত্রা করলাম, আর সঙ্গে গেলেন স্কুলের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর বাবু শিবদাস ভট্টাচার্য। রেমণা কায়স্থ পল্লীর নিকটে স্কুল স্থাপিত হল, আমাদের সহপাঠী বাবু নন্দকুমার

১ উৎকল নিবাসী বাঙালী।

ভট্টাচার্য সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁকে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হল। সেইদিনই কার্যারম্ভ হল।

হিসাব করে দেখা গেল, দুইজন শিক্ষক, একজন চাকর ও অন্যান্য বাইরের খরচ ইত্যাদি নিয়ে মাসিক ব্যয় পঁচিশ টাকা আবশ্যক। হরিবোল হরি, মাস মাস এতগুলি টাকা কোত্থেকে আসবে? অপরিণামদর্শিদের পক্ষে শেষ অবস্থা যা ঘটে, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় হয়ে পড়ল। সভায় বসে সকলে সকলের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম, শেষে চাঁদা তোলার কথা স্থির হল। মহারাজ বাহাদুর (সে সময় বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে) বললেন, চাঁদা তোলার দরকার নেই। সমস্ত ব্যয় তিনি একাকী বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এক বছরের খরচের জন্য অগ্রিম ৩০০ টাকা আমার হাতে প্রদান করলেন। এখন অবধি রেমণা স্কুলের কাজ বেশ উন্নত অবস্থায় চলেছে। রেমণাবাসীরা বৈকুণ্ঠগত মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে[১] বাহাদুরের পবিত্র নাম চিরকাল স্মরণে রাখবেন।

১ উৎকল নিবাসী বাঙালী বংশীয়।

ওড়িয়া ভাষার সঙ্কট

বালেশ্বর জেলার সোরো গ্রামনিবাসী পণ্ডিত সদাশিব নন্দ বালেশ্বর গভর্নমেন্ট স্কুলে ওড়িয়া পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ওড়িয়া আর সংস্কৃত পড়ানো তাঁর কাজ ছিল। নন্দ পেনসন নেওয়ায় তাঁর পদে বঙ্গদেশবাসী কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য নিযুক্ত হয়ে এলেন। বোধ হয় তিনি মনে ভেবে এসেছিলেন ওড়িয়া পড়ানো তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না। ভট্টাচার্য চার ছয় মাস পরিশ্রম করে স্কুলের সমস্ত ছাপানো ওড়িয়া পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়ে ফেললেন। পড়লে কি হবে, ব্যাপারটার মূলে রইল বখেড়া। খুব চেষ্টা করেও ওড়িয়া কথা বলতে পারলেন না। তাছাড়া 'ণ' ও 'ল' উচ্চারণ[১] করা তাঁর পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য হয়ে পড়ল। ভট্টাচার্যের বয়স সেই সময় 'পঞ্চাশতং বনং ব্রজেৎ' প্রায়। বৃদ্ধ আড়ষ্ট জিভে অনভ্যস্ত বর্ণ উচ্চারণ করা কি সহজ কথা? 'ল' কে উচ্চারণ করেন ড়, 'ণ' কে উচ্চারণ করেন 'নো'। যথা 'হে বাড়ক্ গনো'। তাঁর কথা শুনে শ্রেণীর সব ছাত্র খিল খিল করে হেসে ফেলত। এরূপ অপমান এতবড় পণ্ডিতের প্রাণে কতটা সহ্য হয়? কাজ আটকালে বুদ্ধি বেরোয়। একদিন ভট্টাচার্য স্কুলে এসে ছেলেদের সামনে বলে ফেললেন,

'আরে উড়িয়া ত স্বতন্ত্র ভাষা নয়। বাংলার বিকৃতি মাত্র, উড়ে পড়ার আর দরকার নেই।'

অবশ্য আমি ঠিক জানি না, বোধ করি ছেলেগুলি খুব আনন্দে মনে মনে আশীর্বাদ করেছিল, 'পণ্ডিত মশাই দীর্ঘজীবী হয়ে এইখানে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকুন।' কারণ ওড়িয়া সে সময় ছেলেদের পক্ষে বড় গোলমালের কথা ছিল। বর্তমান কালের মতো সে সময় second language হিসাবে ওড়িয়া পড়ার কিছু কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। যার ইচ্ছা হল পড়বে না পড়লেও ক্ষতি নেই।

১ ওড়িয়াতে মূর্ধন্য ণ ও দন্ত্য ন, এ দুটোর উচ্চারণ এক নয়। ল অক্ষরটির একটি ল্যাজশূন্য রূপ আছে। দুটির উচ্চারণ দু'রকম। বাঙালীরা কিছুতেই মূর্ধন্য ণ উচ্চারণ করতে পারে না। ল্যাজকাটা ল তাদের পক্ষে তার চেয়েও কঠিন।

পড়ুয়া ছেলেদেরও এই অবস্থা। এধারে পা থেকে মাথা অবধি সব শ্রেণীতে বাঙালী মাস্টার। ওড়িয়ার পক্ষ নিয়ে কিছু বলার কেউ নেই। পণ্ডিতের হয়ে গেল পোয়া বারো।

'ওড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নয়' কেবল মুখে বললেই ত চলবে না। প্রমাণ করতে হবে। পণ্ডিত মশাই একটি গ্রন্থ রচনা করতে বসে গেলেন নাম হল 'উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নয়'। ছাপার অক্ষরে বই বেরুলো। বাঙালী হেডমাস্টার একখানা বইয়ের সঙ্গে ইন্সপেক্টর সাহেবের কাছে একটা রিপোর্ট পাঠালেন। সে সময় স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন আর. এল. মার্টিন। তাঁর হেড অফিস ছিল মেদিনীপুর। অফিসের সমস্ত কর্মচারী ছিল বাঙালী। হেডমাস্টারের রিপোর্ট বালেশ্বর জেলার বাঙালী ডেপুটি ইন্সপেক্টরের অনুকূল মত পিঠে বহন করে ইন্সপেক্টরের অফিসে উপস্থিত হল। সেখান থেকে অতি শীঘ্র আদেশ বেরিয়ে বালেশ্বর হেডমাস্টারের সমীপে উপস্থিত হল। তার সারমর্ম—

'বালেশ্বর গভর্নমেন্ট স্কুলে কেবল সংস্কৃত আর বাঙলা পড়ানো হবে।'

সে সময় কেবল স্কুলে নয় সরকারি সমস্ত বিভাগে একজনও ওড়িয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন না। সব বাঙালীদের একমত! সকলেই সমান ওড়িয়া বিদ্বেষী আর বিদ্রূপকারী। সম্প্রতি তাদের মধ্যে আনন্দ উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। কান্তি ভট্টাচার্যের আর মাটিতে পা পড়ে না। মনে করলেন ওড়িশায় একটি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গেলেন।

কেবল ইংরেজি স্কুলে নয় আরো অনেক সাহায্যকৃত স্কুলগুলিতে ওড়িয়া তুলে দেবার প্রস্তাব চলতে লাগল। বাঙালী জমিদার মণ্ডলবাবু তাঁর মফঃস্বল জমিদারীতে একটি খাঁটি বাংলা স্কুল বসিয়ে দিলেন।

কেবল বালেশ্বরে নয়, উৎকল দেশবাসী সব বাঙালী রাজকর্মচারীদের এক মত, একই সলাপরামর্শ—উৎকল ভাষা তুলে দেওয়াই সকলের মত এবং চেষ্টা হয়ে দাঁড়াল।

সে সময় উৎকলে বাঙালী ওড়িয়াদের মধ্যে ভয়ঙ্কর দলাদলি চলছিল। অধুনা একপক্ষ আনন্দ উৎসাহের সঙ্গে অনিষ্ট সাধনে নিযুক্ত, অন্যপক্ষ সম্পূর্ণরূপে নীরব এবং নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন।

সহসা আমাদের মাথায় যুগপৎ সহস্র বজ্র পতনের ন্যায় মনে হল। শত্রুদের আনন্দ উৎসব, বিদ্রূপবাণী হৃদয়ে তীরের ন্যায় বিদ্ধ হচ্ছিল। 'অ্যাঁ, এ কি

হোল ? আমাদের মাতৃভাষা কি আর পড়ান হবে না ?' আমাদের সেই ক্ষুদ্র দুর্বল কমিটির অধিবেশন হল। দিবারাত্রি চিন্তা ভাষা রক্ষার উপায় কি ? সন্ধ্যা হতে রাত্রি ছয় ঘড়ি[1] অবধি শহরবাসী প্রধান প্রধান লোকেদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলাম। কাছারিতে আমলাদের একত্র করে আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলাম। সকলে একবাক্যে জবাব দিলেন,

'ওহে বাবু! এটা হল সরকারি মামলা, সরকারি স্কুলে যা পড়ানো হবে, আমাদের ছেলেরা তাই পড়বে। সরকারি হুকুমের উপর কথা বলে কি বিপদে পড়ব ?'

আমলাদের মত শুনে শহরবাসী জমিদার মহাজনগণ আমাদের কথা একদম শুনতে নারাজ। একদল লোক সাফ জবাব দিলেন, 'আমলারা যে কথায় ভরসা পাচ্ছে না আমরা তাতে ঢুকে কি জরিমানা দেব ?'

বাবু গৌরীশঙ্কর রায়ের[2] উদ্দেশে শত সহস্র প্রণিপাত করি। তিনি "উৎকল দীপিকায়" উৎকল ভাষার সপক্ষে প্রতি সপ্তাহে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ বার করতে লাগলেন। আমরা বালেশ্বরবাসী সারা উৎকল হতে কেবল তাঁর অমৃতময় বাণী শুনতে লাগলাম। আমাদের বালেশ্বরে নবপ্রকাশিত "বালেশ্বর সম্বাদ বাহিকায়" কিছু কিছু লিখতাম।

একেবারে আমরা নিবৃত্ত হই নি। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ উপায় অন্বেষণে নিযুক্ত আছি। একদিন কাছারি বন্ধ হলে সমস্ত আমলাদের একত্র করে একটা বক্তৃতা দিলাম। তার সারমর্ম এই—

'হে মহাশয়গণ! এই যে স্কুলগুলিতে ওড়িয়া উঠে গিয়ে বাংলা পড়ান শুরু হয়েছে এটা সরকারের হুকুম নয়, বাঙালীরা চক্রান্ত করে ইন্‌সপেক্টর সাহেবকে ভুলিয়ে এরূপ করেছেন। অল্পদিন পরে কাছারি হতেও ওড়িয়া ভাষা তুলে দেওয়া হবে। এর কারণ কি বুঝতে পারছেন না! এরূপ মোটা মাইনার চাকরি এবং কেরানীগিরিতে বাঙালীরা সব চেপে বসেছে। আপনারা কি ফারসী ভাষায় এতই লায়েক মৌলবীদের মতো ? সেই ফারসী ভাষা তুলে দিয়ে

১ ৩২ ঘড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা। একঘড়ি অর্থাৎ ৪৫ মিনিট। এখানে সূর্যাস্তের পর হতে সাড়ে চার ঘণ্টা অর্থাৎ রাত দশটা এগারটার মতো।

২ উৎকল দীপিকার সম্পাদক রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর উৎকলনিবাসী বাঙালী কায়স্থ। এঁর ভাই রামশঙ্কর রায় ওড়িয়া ভাষায় নাটক ও উপন্যাস লিখে প্রখ্যাত।

বাঙালীরা কেরানীর পদ দখল করলেন। আপনাদের সব বিদ্যা মাটি হল। ওড়িয়া ভাষা উঠে গেলে এই বাঙালীদের ছেলে, ভাই, জ্ঞাতি, কুটুম সকলে আমলা হয়ে যাবে। আপনারা তো নিশ্চয় বরখাস্ত হয়ে যাবেন এর পরে আপনাদের ছেলে নাতিরা আর সরকারি চাকরি পাবেন না।'

আমাদের এই কথাটি শোনা মাত্র সভায় ভারি একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। সকলে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন। 'না না তা কিছুতেই হবে না। আমাদের ছেলেরা স্কুলে ওড়িয়া পড়বে।'

আমাদের সকলে ধরে বসল, 'উপায় দেখ, উপায় দেখ' আমরা উত্তর দিলাম, 'সহজ উপায়। সরকারকে দরখাস্ত পাঠাও স্কুলে ওড়িয়া পড়ানো হবে, সুতরাং কোনো বাঙালী আর আমলা হতে পারবে না।' এখন আর তর সইছে না। সকলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ধরে বসল, 'শীঘ্র দরখাস্ত তৈরি কর।' শুভ কার্যে বিলম্ব অনুচিত। দিন রাত লেগে একটা দরখাস্ত তৈরি হল। প্রায় পাঁচশত লোকের সই করা সেই দরখাস্ত কলেক্টর সাহেবের নিকট দাখিল করা হল। নানা কারণে সে সময় আমাদের অর্থাৎ বালেশ্বরবাসীদের সমস্ত ইংরেজ হাকিম এবং মিশনারীরা অনুগ্রহ করতেন।

আমাদের প্রার্থনায় সকলে আমাদের পক্ষ নিতে লাগলেন। সে সময়ে বালেশ্বরের কলেক্টর জন্ বীম্‌স্ সাহেব একজন ভাষাবিৎ পণ্ডিত বলে গভর্নমেণ্টের কাছে পরিচিত ছিলেন। আমাদের দরখাস্ত তাঁর সমীপে দাখিল হওয়ায় তিনি অনুকূল মত প্রকাশ করে কমিশনর সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ওড়িয়া অতি প্রাচীন স্বতন্ত্র ভাষা। এই ভাষায় দেশে বহুল রূপে শিক্ষা বিস্তার করা উচিত। এই মর্মে একটি ইংরেজি পুস্তক অবধি লিখে সরকারকে পাঠিয়ে দিলেন। ওড়িশার পরম বন্ধুটি রেভেন্‌শ সে সময় উৎকলের কমিশনর ছিলেন। তিনি কলেক্টরের প্রেরিত দরখাস্ত নিজের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে গভর্নমেণ্টকে পাঠিয়ে দিলেন। সরকারের আদেশ এল।

'ওড়িশার সমস্ত স্কুল হতে বঙ্গভাষা সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দেওয়া হোক এবং উৎকল ভাষার বহুল প্রচারের জন্য স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপিত হোক।'

কলেক্টর মহাত্মা জন্ বীম্‌স্ এবং কমিশনর মহাত্মা টি রেভেন্‌শর অনুগ্রহ উৎকলবাসী চিরকাল স্মরণে রাখবে।

সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা

১৮৬৮ সালে ক্যাম্বেল সাহেব বঙ্গ, বিহার, ওড়িশার লেফটনেন্ট গভর্নর ছিলেন। তাঁর মতো অসাধারণ কর্মবীর ও শক্তিশালী লেফটনেন্ট গভর্নর কখনও দেখা যায় নি। সরকারি প্রত্যেক বিভাগে প্রচলিত পুরাতন কার্য-পদ্ধতির পরিবর্তে তিনি নূতন কার্যবিধান স্থাপন করে গেছেন। প্রতিদিন প্রত্যেক মহকুমার মফঃস্বলের হাকিমরা অস্থিরভাবে ডাকের পানে চেয়ে থাকতেন। কিছু নতুন বিধানের নির্দেশ আসবে নাকি। প্রকৃতই প্রতিদিন নূতন নূতন বিধানের প্রচলন সংবাদ প্রতি মহকুমায় আসছিল। কাছারির হাকিম এবং আমলাদের কাছে শোনা যেত, কি আশ্চর্য। একজন মানুষ এত অনুসন্ধান, এত কার্য করতে পারে। সবডেপুটি এবং কানুনগো[১] পদ ক্যাম্বেল সাহেবের দ্বারা সৃষ্ট। ডেপুটি এবং সব ডেপুটিরা ঘোড়ায় চড়া এবং সার্ভে কাজ শিখতে বাধ্য। এ বিধান ক্যাম্বেল সাহেবের সময় হতে চলে আসছে।

লেফটনেন্ট গভর্নর সাহেব প্রচার করলেন যে দেশের সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য সরকারের তরফ হতে ব্যবস্থা করা এবং অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা উচিত। এজন্য সর্বসাধারণের মতামত জিজ্ঞেস করে পাঠালেন। লেফটনেন্ট গভর্নর সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বালেশ্বরে একটি বিরাট সভা ডাকা হল। রাজা শ্যামানন্দদের দেবী মন্দিরের দোতলার বারান্দায় সন্ধ্যা সাতটার সময় সভার অধিবেশন হল। সভায় ডেপুটি, মুনসেফ, ইঞ্জিনিয়র, সমস্ত স্কুল মাস্টার, বড় বড় কেরানী প্রভৃতি তিরিশ-চল্লিশ জন বাঙালী ও ওড়িয়াদের পক্ষ হতে সাত আট জন উপস্থিত ছিলেন। সে সময় বালেশ্বর শহরবাসী মহাজন ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা এ ধরনের সাধারণ সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া পছন্দ করতেন না। সভা-সমিতির নাম শুনলে তাঁদের কোনো রকম অসুখ দেখা দিত অথবা অত্যন্ত জরুরী কাজে ঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবার প্রয়োজন হত। সভা সমিতির অর্থ তাঁরা সাধারণভাবে স্থির করেছিলেন যে চাঁদা দিতে হবে।

১ জমি জরীপ করায় যারা সাহায্য করেন।

সে সময় ওড়িয়া ভাষা নিয়ে বাঙালী ও ওড়িয়া দুই জাতির মধ্যে দলাদলি চলছিল। গভর্নমেণ্ট স্কুলের পণ্ডিত শ্রীকান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য বাঙালী দলের নেতা ছিলেন।

একজন বাঙালী ইঞ্জিনিয়র প্রথমে উঠে দাঁড়িয়ে সভার উদ্দেশ্য সভ্যদের বিস্তারিতরূপে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আর একজন বাঙালী এবং পণ্ডিত কান্তিচন্দ্র বিস্তারিত বক্তৃতা সহযোগে প্রথম বক্তার বক্তব্য অনুমোদন ও সমর্থন করলেন। তাঁদের বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সমস্ত সভ্য বুঝে নিলেন যে গভর্নমেণ্ট হাই এডুকেশন অর্থাৎ উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার স্কুলগুলি শহর হতে উঠিয়ে দিয়ে মফঃস্বলে দেশীয় ভাষার স্কুল বসিয়ে সর্বসাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরের ছেলেপুলেদের শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এর দ্বারা আমাদের ঘোর অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। এই কারণে গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উচিত।

দেশের সর্বসাধারণ ও সামর্থ্যহীন লোকেদের ঘরের ছেলেদের যে কোনো উপায়ে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত—সেই সময় আমার মনে ক্ষীণভাবে এই কথাই উদিত হয়েছিল। এইজন্য আমাদের গ্রামের ও নিকটস্থ গ্রামগুলির ছেলেদের জড়ো করে স্কুলে পড়াচ্ছিলাম। বই কিনতে কিম্বা স্কুলের মাইনে দিতে অসমর্থ ছেলেদের নিজের হাত থেকে পয়সা দিতাম। মিশনারী স্কুলের ছেলেদের মাসিক বেতন মাসে এক আনা কিম্বা দুই আনা ছিল। নিতান্ত অসমর্থ ছেলেরা বিনা বেতনে পড়াশোনা করত।

গভর্নমেণ্ট গরীবের ছেলেদের পড়াবার জন্য প্রস্তাব করেছেন শুনে আমার মনে খুব আনন্দ হল। মনে মনে ভাবলাম সরকার যদি ইংরেজি স্কুল তুলে দেয়, তবে বড়লোকের ছেলেরা যে কোনো উপায়ে পড়াশোনা করতে পারবে। কিন্তু মফঃস্বলে স্কুল বসলে অনেক দরিদ্র ছেলে বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পাবে। তা হলে দেশে অনেক শিক্ষিত ছেলে বেরুবে।

পণ্ডিত কান্তিচন্দ্রের বক্তৃতা শেষ হওয়ায় আমি দাঁড়িয়ে উঠে সর্বসাধারণের শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বোঝাতে লাগলাম। বক্তৃতা শেষ করে আমি নিজের জায়গায় বসামাত্র বারুদে আগুন লাগার মতো কান্তি পণ্ডিত উত্তেজিত হয়ে ভয়ানক চিৎকার করে বক্তৃতা করতে লাগলেন। তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার দাঁড়িয়ে তাঁর যুক্তিগুলি খণ্ডন করে আমার

মতের স্বপক্ষে কতকগুলি কথা বললাম। সে সময় ভয়ানক চিৎকারের শব্দে দোতলার ঘরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। একবার দুবার নয় আট দশবার বাদানুবাদ চলল। একটা কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল রাখা হয়েছিল। বক্তারা মাঝে মাঝে এক এক গ্লাস জল খাচ্ছিলেন। সমস্ত বাঙালী আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কেবল বগলানন্দ নামক একজন বঙ্গবাসী ডেপুটি বাবু সাধারণের শিক্ষার পক্ষে কিছু বলেছিলেন। অবশেষে ধূর্ত কান্তিচন্দ্র পণ্ডিত একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করলেন। দাঁড়িয়ে উঠে খুব উঁচু গলায় চিৎকার করে বললেন, 'হে সভাস্থ মহোদয়গণ, ভেবে দেখুন, গভর্নমেণ্ট হাই এডুকেশন তুলে দেবার পর আপনারা কি মাসে মাসে পঁচিশ-তিরিশ টাকা খরচ করে এক একটি ছেলেকে পড়াতে পারবেন। তবে উচ্চ শিক্ষার স্বপক্ষে যাঁরা আছেন তাঁরা হাত তুলুন।'

সকলে হাত তুললেন। হরি। হরি। যে কজন ওড়িয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও হাত তুলে দিয়েছেন। তৎক্ষণাৎ সকলের কাছ থেকে দস্তখৎ করিয়ে নেওয়া হল। কান্তি পণ্ডিত গলা ফাটিয়ে বললেন, 'ফকীরমোহন বাবুর কাছ থেকে দস্তখৎ নেওয়া হবে না।' আমি মনে মনে বললাম, তথাস্তু।

স্কুল কমিটির মেম্বার

সে সময় উৎকলের সর্বত্র সরকারি প্রত্যেক মহকুমার প্রধান কর্মচারী ছিলেন বাঙালী। ওড়িয়া ভাষা তুলে দিয়ে বাংলা ভাষা চালানোয় সকলের এক মত। আপন আপন মহকুমায় সাধ্যানুসারে বাংলা চালানো সম্বন্ধে সকলে সচেষ্ট। সরকারি কোনো কাজ খালি হলে নিজের লোক নিযুক্ত করায় প্রাণপণ চেষ্টা। পাবলিক ওয়ার্কস এবং ডাক বিভাগে একজনও ওড়িয়ার প্রবেশ অধিকার ছিল না।

সে সময় বালেশ্বর জেলায় বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল ছিলেন সর্বপ্রধান জমিদার। নিবাস চুঁচুড়া। বালেশ্বর জেলায় তাঁর বিস্তৃত জমিদারি ছিল। লোকটি খুব সাহসী, বুদ্ধিমান ও দানশীল কিন্তু ভয়ানক রাগী ছিলেন। দিবারাত্রি মদের বোতল পাশে থাকে, মদের বোতল ও গ্লাস বিছানায় না রাখলে তাঁর ঘুম আসে না। বালেশ্বরে সমস্ত বাঙালী কর্মচারী তাঁকে মুরুব্বী বলে মানতেন। সন্ধ্যা হতে রাত নয়টা অবধি মণ্ডলবাবুর কাছারি ঘরে সমস্ত বাঙালী বাবুর বৈঠক বসত। আজকাল বৈঠকে প্রধান আলোচনার বিষয় কী উপায়ে সরকারি অফিসগুলো থেকে ওড়িয়া তুলে দিয়ে বাংলা ভাষার প্রচলন করা যায়। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, কর্মচারীদের বোঝাবার চেষ্টা, 'সম্বাদ বাহিকা'য় প্রস্তাব লেখা এবং বাঙালীদের সঙ্গে তীব্রভাবে তর্ক বিতর্ক করার জন্য আমি বাঙালী সমাজে পরম শত্রু হয়ে পড়েছিলাম। বাঙালী বাবুরা অতীব ঘৃণাবশে আমার নাম করতেন না। আমার নাম দিয়েছিলেন "বেটা রিং লিডার"।

বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল মফঃস্বলের ঘোর অভ্যন্তরীণ গ্রামে একটি বাংলা স্কুল বসালেন। আসলে সেটা স্কুলের মতো ছিল না। কেবল বাঙালী বাবুদের অনুরোধে একটা লোক দেখানো ব্যাপার হয়েছিল। সেই বিষয় "বাহিকা"য় একটি বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ বাহির হওয়ায় বৃন্দাবনবাবু আমার উপর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। সুযোগ পেয়ে বাঙালী বাবুরা তাঁকে উসকাতে লাগলেন।

বালেশ্বর বারবাটি স্কুলের কমিটির সাতজন মেম্বার ছিলেন তার মধ্যে ছয়জন ছিলেন বাঙালী আর আমি একমাত্র ওড়িয়া ছিলাম। একদিন কমিটি আহুত হল। দৈবাৎ আমি সেদিন অনুপস্থিত ছিলাম। বৃন্দাবনবাবু দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করলেন, 'ফকীরমোহনকে কমিটি হতে বার করে দেওয়া হোক, নচেৎ আমাকে বাদ দেওয়া হোক।' কমিটি ভয়ানক বিপদে পড়ল। কারণ স্কুলটি চাঁদায় চলত। বাঙালী ও ওড়িয়া চাঁদা দাতা সমান সমান। ফকীরমোহনকে ছাড়লে সমস্ত ওড়িয়া বারবাটি স্কুলের সম্পর্ক ত্যাগ করবে। বৃন্দাবনবাবুকে ছাড়লে বাঙালী দলের কাছ হতে চাঁদা আদায় হবে না। কমিটি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ল। নানা তর্কবিতর্কের পর বৃন্দাবনবাবু স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার নেওয়ার জন্য স্বীকৃতি দেওয়ায় আমাকে কমিটি হতে সরিয়ে দেওয়া স্থির হয়ে গেল। বাঙালীবাবুরা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। কিন্তু হায়! পৃথিবীতে কোনো বিষয়ই চিরস্থায়ী নয়। "নীচৈর্গচ্ছতু পরি চ দশা চক্রনেমি ক্রমেন।" সুখদুঃখ পরিবর্তনশীল। বাঙালীবাবুদের আনন্দোল্লাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারল না। উপস্থিত ঘটনার পরবর্তী সপ্তাহে গভর্নমেন্ট গেজেটে বেরুল, Babu Phakir Mohan Senapati is appointed as a member of Balasore Zila School Committee. গেজেট পড়ে বাবুরা একেবারে নীরব। বাবু শ্রীনাথ দত্ত বালেশ্বর জেলা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তিনি ছিলেন ভদ্র, সদাশয় নিরপেক্ষ এবং স্পষ্টবাদী। তিনি বাঙালীদের দলভুক্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদ পছন্দ করতেন না। বারবাটি স্কুল কমিটি হতে আমাকে সরিয়ে দেবার সময় তিনি আমার পক্ষ নিয়ে বিশেষ আপত্তি করেছিলেন। তিনি উক্ত কমিটির একজন মেম্বার ছিলেন। গেজেট বাহির হবার পর একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি হেসে হেসে আমাকে বললেন, 'মহাশয় কিছুতেই আপনার সঙ্গে আঁটতে পারা গেল না।'

বাবুদের পক্ষে আর একটি অপ্রীতিকর ঘটনা সেই সময় ঘটেছিল। আমি ওড়িয়া ভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছিলাম। সেই পুস্তকটি দুইভাগে বিভক্ত ছিল। উৎকলের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে গণ্য হয়েছিল। স্কুল ইন্স্পেক্টর সাতশত টাকা এবং ওড়িষ্যার কমিশনর রেভেন্শ সাহেব তিন শত টাকা সেই বাবদে আমাকে পুরস্কার প্রদান করেছিলেন।

সে সময় বালেশ্বরে মিউনিসিপালিটি ছিল না। টাউনের মধ্যে চৌকিদারি ট্যাকস ছিল। কমিশনরদের মধ্যে আমি এবং বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল দুইজন ছিলাম। কমিটিতে আমাদের দুইজনের মধ্যে সর্বদা মতভেদ হচ্ছিল। সে কথা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

বারবাটি স্কুল কমিটি হতে আমাকে সরিয়ে দেওয়াতে ওড়িয়ারা সকলে চাঁদার বই থেকে নাম তুলে নিলেন। বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল কয়েক মাস মাত্র স্কুলের খরচ চালিয়ে পরে বন্ধ করে দেওয়াতে স্কুলটি উঠে গেল।

সমাজের রীতিনীতি পরিবর্তন

ইংরেজি শিক্ষা উপরন্তু বিদেশীদের সংসর্গ হেতু বালেশ্বরের উৎকলীয় সমাজের মধ্যে একটা বিষম পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হল। বেশভূষা আহার বিহার, রীতি নীতি, পাপ পুণ্য প্রভৃতি সব বিষয়ে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। পূর্বে বালক হতে বৃদ্ধ সকলের মাথায় পেণ্ডা চুল[১] ছিল। এই পেণ্ডাচুলের উচ্ছেদ প্রথমে স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা আরম্ভ হল। তাদের দেখাদেখি শহরবাসী অন্যান্য নবযুবকদের মাথা থেকে পেণ্ডা চুল ক্রমশঃ অদৃশ্য হতে লাগল। কেবল একদল ধর্মপ্রাণ অভিভাবকদের ভয়ে অতি সূক্ষ্মাকারে কয়েকগাছি চুল শিখা নাম ধারণপূর্বক প্রচ্ছন্নভাবে কয়েক বছর অবধি একদল যুবকের মস্তকের উপর বিরাজ করত। কারণ শিখার মূলে গ্রন্থি না পড়লে পিতৃলোক জল গ্রহণ করবে না। পরে দীর্ঘকাল অবধি নিতান্ত হিন্দুধর্মপরায়ণ মহাত্মাদের মস্তকে চুর্কি বা শিখার অস্তিত্ব দেখা যেত। অধুনা দেখা যাচ্ছে স্কুলের ছেলেদের সামনে চুর্কি বা চৈতন শব্দ উচ্চারণ করলে হয় ত বা তারা অর্থ বোঝার জন্য অভিধানের পাতা উল্টাতে বসবে। পূর্বে কেবল একদল কাছারির আমলা কর্তব্যবোধে জুতো, আংরাখা, চাপকান ব্যবহার করতেন। জুতো বার দোর টপকে ভিতরে যেত না। গোরুর চামড়া পায়ে লেগে থাকার জন্য জুতোপরা বাবুরা পা ধুয়ে ঘরের ভিতর যেতেন। ক্রমশঃ হাটে পথে কুর্তা দেখা দিল আর জুতো ক্রমে ঘরের ভিতর আঙিনায় বারান্দায় সঞ্চারিত হল। অন্যান্য চাল-চলন আহার বিহার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। হিন্দু ধর্ম তথা হিন্দু সমাজের পক্ষে তা শুভ কিংবা অশুভ লক্ষণ, বিচার করা উপস্থিত ক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

শহরবাসী বিত্তশালী লোকেদের পুত্র ও স্কুলের ছাত্র যুবকেরা ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। এটা অভিভাবকদের নির্বুদ্ধিতা অথবা শাসনের অভাবের ফল বলা যেতে পারে। পাঁচ কিংবা সাত বছর বয়স হতে ছেলের শিক্ষার জন্য

১ সামনের চুল ছোট করে ছাঁটা ও পিছনের কেশগুচ্ছ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ খোঁপা বাঁধার মতো।

গুরুমহাশয়ের জিম্মা করে দেওয়া, তারপর স্কুল বা মক্তবে[1] পাঠিয়ে দেওয়া পিতা বা অভিভাবকের পক্ষে শেষ কর্তব্য বলে গণনা করা হত। বড়লোকের বাড়ির ছেলেদের বাল্য সঙ্গী ছিল নীচ শ্রেণীর চাকর, গোয়ালা, নাপিত ও যৌবনের সাথী হত চঞ্চল প্রকৃতির সমবয়স্ক হাল্কা স্বভাবের যুবকবৃন্দ। পিতাপুত্রের মধ্যে কদাচিৎ সাক্ষাৎ হত। পিতার সম্মুখে মাথা তুলে চলাফেরা করা বা মাথা তুলে পিতার সঙ্গে কথা বলা পুত্রের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য বলে গণ্য হত। সাধারণতঃ ধীর স্থির হয়ে হাঁটা ধীরে ধীরে কথা বলা সুশীল স্বভাবের লক্ষণ বলে গণ্য হত। হৈ চৈ করে বেড়ানো, জলে সাঁতার কাটা, খেলাধুলো নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ বলে ধরা হত। তবে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে প্রকৃত ধর্মভাবের বিস্তার হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। পূর্বে মিথ্যা ভাষণ অথবা পুরুষের পক্ষে ব্যভিচার দোষের মধ্যে গণ্য হত না। বড়লোক, বিশেষতঃ করণ, খণ্ডায়েতদের গৃহ পিশাচী উপপত্নীদের আরামের বাসস্থান ছিল। একদল নির্লজ্জ বিত্তশালী লোক বারবিলাসিনীদের বসনভূষণে সজ্জিত করা কিম্বা তাদের পাকা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া গৌরবের বিষয় বলে জ্ঞান করতেন।

উৎকোচ গ্রহণ দোষাবহ বলে গণ্য হত না বরং প্রশংসার বিষয় বলে একদল লোক ভাবতেন। যে আমলার যত উপরিলাভ সমাজের তার সেই পরিমাণ প্রতিষ্ঠা ছিল। প্রবাদ ছিল—'অসৎ বণিক, চাকর চোর।' মিথ্যা কথন ব্যভিচার, উৎকোচ গ্রহণ ছিল, আছে ও চিরকাল থাকবে। কিন্তু অধুনা শিক্ষিত লোকেরা মিথ্যা বলতে ভয় পান। মিথ্যাবাদী সম্ভ্রান্ত লোক সাধারণের উপহাস্য হয়। বর্তমানে ব্যভিচারীর ভদ্রসমাজে স্থান নেই। উৎকোচগ্রহণ লোকনেত্রের অন্তরালে অন্তঃসলিলা বস্তুর ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত।

আর ধর্মচর্চা বাড়ির ভিতর অন্যান্য কর্তব্য কাজের মধ্যে করণীয় বলে গণ্য হত। ধর্মানুষ্ঠানের কাজটা বুড়াবুড়ির মধ্যে বিশেষ করে বুড়ির উপরই ন্যস্ত ছিল। স্নানান্তে তিনি জপের ঝুলিটা মেলে সেবা পূজায় বসতেন। ঝুলির মধ্যে থাকত জগন্নাথ মহাপ্রভুর শুকনো মহাপ্রসাদ এবং একটি দড়িতে মালা গাঁথার মতো ছোট ছোট বটুয়ায় গাঁথা থাকত শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রগুলির সঞ্চিত পুণ্য পথরেণু। তিলক কাটা সাঙ্গ হলে মহাপ্রসাদ, নির্মাল্য ও পবিত্র রেণুর এক এক কণা সেবন করার পর একবার মালা ঘুরিয়ে নিলে পূজা

[1] ফারসী শিক্ষার জন্য মুসলমানদের পাঠশালা।

সমাপ্ত হত। প্রত্যেক সচ্ছল গৃহস্থ লোকের বাড়িতে শালগ্রাম শিলা বিরাজ করত। বেলা এক প্রহরের সময় গৃহস্থদের মঙ্গল কামনা এবং পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য পুরোহিত এসে দেবতার উদ্দেশে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে সহস্র নাম পাঠ করে চলে যেত, পুরোহিতের কাছে পূজার আয়োজন করে দেওয়া বুড়াবুড়ির কাজ ছিল। সন্ধ্যার সময় পুরাণ পাঠকে এসে পুরাণ পাঠ করতেন। ভজনমালা হাতে চোখ চেয়ে বা ঢুলতে ঢুলতে পুরাণ শ্রবণ করাও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ বলে গণ্য হত। প্রত্যেক বারব্রত পালন ও উপবাস অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হত। গৃহের কর্তা বিষয়কাজে লিপ্ত, গৃহিণী তো ঘর আগলে বসে আছেন, ছেলেগুলি পড়াশোনা নিয়ে আছে ধর্মানুষ্ঠান করার তাদের সময় কই? আমি বাল্য, যৌবন ও বর্তমান অবস্থা অবধি লক্ষ্য করে দেখে আসছি, এই পৌরোহিত্য-পূজাপাঠ ক্রমশঃ দশ বার আনা অবধি উঠে গেছে। ইংরেজি শিক্ষা আংশিকভাবে এবং লোকেদের স্বচ্ছলতার অভাব এজন্য অধিক পরিমাণে দায়ী। জাহাজের কারবারের সময় পুরোহিতদের বিশেষ লাভ ও সম্মান ছিল। জাহাজ সমুদ্রে যাত্রা করলে পর প্রত্যেক মহাজনের বাড়ি চণ্ডীপাঠ, শিবের কাছে সহস্র কুম্ভ, বিষ্ণুর সহস্র নাম জপ, সত্যনারায়ণ পূজার জন্য তিন চারজন পুরোহিতের আবশ্যক হত। বালেশ্বরে এত পূজারী কোথায়? কটক এবং পুরী জেলার অনেক পূজারী ব্রাহ্মণের যজমানী এবং বাৎসরিক আয় নিরূপিত ছিল। শীতকালেই জাহাজের কারবারের সময়। সেই পুরোহিতরা এ সময় এসে পূজা পাঠ সম্পাদন করার পর নির্ধারিত অর্থ নিয়ে চলে যেতেন। সকলের ধারণা ছিল জাহাজ ধর্মনৌকা, ধর্মানুষ্ঠান না করলে তরী ডুবে যাবে। হায়! হায়! বালেশ্বরের কোন্ মহাপাপ হেতু সেই ধর্মতরীগুলি চিরকালের মত ডুবে গেছে।

আমরা বালেশ্বরবাসীরা বাঙালী বাবুদের সংস্রবে এসে সভ্যতা, সাধু ব্যবহার, বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছি। একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য। অপিচ অশেষ দুর্গতির মূল মদ্যপানটা যে বাঙালী বাবুদের আদর্শে শিক্ষা লাভ করেছি. একথা সাহসপূর্বক বলতে আমি প্রস্তুত। আমি যে সভ্যতা বা তথাকথিত জ্ঞান সঞ্চারের কথা বলছি, মদ্যপান সে সভ্যতার অঙ্গবিশেষ বলে সে সময় গণ্য হত। সে সময় বালেশ্বরে ছোট বড় যে কজন বাঙালী কর্মচারী ছিলেন সকলেই প্রায় মদ্যপ ছিলেন। কেবল তিন চারজন মদিরাবিদ্বেষী স্কুল মাস্টারের

নাম অদ্যাবধি আমার মনে আছে। সে সময় মদ্যপানে অনভ্যস্ত শিক্ষিত যুবক তথাকথিত সভ্যসমাজে অবজ্ঞার পাত্র ছিল। মদ্যপানে বিরত কোনো কোনো শিক্ষিত যুবক আপনার মানসম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য মদ কিনে এনে একটি ছোট কাচের পেটমোটা বোতলে ভরে রাখতেন। তথাকথিত কোনো ভদ্রসমাজে যাবার সময় লোকে নিজের নিজের গোঁফে সামান্য মদ লাগিয়ে দিয়ে নেশা হবার ভান করতেন।

প্রথমে আমি মদকে বিষতুল্য ঘৃণা করতাম। সে সময় যুবক সমাজের মধ্যে ফিস্ট বা ভোজ বিশেষ একটি চিত্ত বিনোদনের বিষয় ছিল। যুবকেরা প্যালা করে ভোজ দিতেন। ভোজের মুল খাদ্য ছিল মাংসের তরকারি। মিষ্টান্ন প্রভৃতি অন্য খাদ্য আনুষঙ্গিক মাত্র। যে ভোজে নানা শ্রেণীর লোক থাকার কথা, সেখানে গোপনে মদ্যপান চলত। কেন জানি না যুবক সঙ্ঘ আমাকে ফিস্টিতে সম্মান এবং ভয় করত। আমি মদ না খেলেও কেউ ভরসা করে আমাকে কিছু বলতে পারত না।

বালেশ্বরে সর্বপ্রধান ব্যবসায়ী বাবু মদনমোহন দাসের ভ্রাতা বাবু কিশোরী-মোহন দাসের একটি সুন্দর বাগান ছিল। উদ্যানটি বালেশ্বর মোতিগঞ্জ বাজারের পূর্বপ্রান্তবর্তী একটি নির্জন স্থানে অবস্থিত। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা হতে রাত এগারটা পর্যন্ত সেখানে একটি বন্ধু সম্মিলন হত। সমিতিতে তাস, সতরঞ্জ, মদ, চরস, মদত্[১]. বাঈনাচ ইত্যাদি কোন প্রকার আমোদের অভাব ছিল না। আমোদ-প্রমোদের সমস্ত ব্যয় একজন ধনী লোক আনন্দের সঙ্গে বহন করতেন। সভ্যদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। প্রথমে তাস খেলা হল। তারপর একটি টেবিলের উপর নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত হল। টেবিলে মাঝখানে একটি স্বচ্ছ বোতলে সুরাদেবী বা পিশাচী স্থাপিতা। জানি না কেন মদিরার প্রতি আমার যে এত বিদ্বেষ, এত ঘৃণা ছিল, তা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেল। আমি অভ্যস্ত লোকের ন্যায় সহজ মনে বন্ধুদের সঙ্গে পান ভোজন করলাম। তারপর হতে প্রতি শনিবার কিশোরীমোহন বাবুর বাগান বাড়ি হতে নিমন্ত্রণ পেতে লাগলাম। আমি মদ্য পানে অভ্যস্ত

[১] বিবিধ মাদক দ্রব্য বা নেশা।

ছিলাম না, কেবল মজলিসে, সভায় সময় সময় বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পান করতাম। সেই সাময়িক পানাসক্তি আমার পক্ষে স্বাস্থ্য সম্ভ্রম ও আংশিক সম্পত্তি বিনাশের কারণ হয়েছিল। অবশেষে সেই মদিরাপান যদি বিষবৎ পরিত্যাগ না করতাম তবে আমার কলঙ্কিত অতি তুচ্ছ জীবন চরিত লিখে নির্লজ্জ ভাবে সাধারণকে জানাবার জন্য আজ অবধি আমার সত্তা পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকত না।

ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন

বাল্যকালে দেব দেবীর প্রতি আমার বিশেষ ভয় ও ভক্তি ছিল। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটি অতি পুরাতন বকুল বৃক্ষের মূলে গ্রামের ঠাকুরানী বাড়ি বিরাজিত ছিল। একটা মাটির কলসীর মুখের উপরে পোড়া মাটির মানুষের মাথার মতো একটা মাথা রাখা ছিল তার নাম বকুলমঙ্গলা। তাঁর সামনে এক পোয়া ওজন হতে দুই সের অবধি ওজনের গোটা আট দশ মাঙ্কড়া[১] ও অকর্মশিলা অনামিকা ঠাকুরানী বিরাজিতা। পূজক মালির ঘর ঠাকুরানীর বেড়ার লাগাও। ঠাকুরানীদের দেহে এত সিঁদুর মাখানো হত যে চেঁছে তুলতে গেলে গাদা গাদা সিঁদুর বেরিয়ে পড়বে। ঠাকুরানীর কাছে অনেকগুলি মাটির তৈরি ভাঙা ও আস্ত বিচিত্র আকারের ঘোড়া, হাতি জমা থাকত। এগুলি ঠাকুরানীর বাহন। ঠাকুরানীকে এইসব বাহনের উপর চড়তে কখনও দেখি নি, কেবল পূজার সময় কালিশি[২] এলে সেই বাহনগুলি হতে একটি দুটি নিয়ে কাঁধে ফেলে নাচতে দেখেছি। বসন্ত বা ওলাওঠা হলে গাঁয়ের চাঁদার পয়সায় ঠাকুরানীর মাজনা[৩] হত। মানসিক পূজাও ঢের হত। গ্রামের মধ্যে বিবাহ উৎসবে প্রথমে গ্রাম্য দেবতাকে পূজা দেবার বিধি ছিল। পূজার সময় কালিশি এসে গাঁয়ের সুখ-দুঃখের কথা বলতেন। আমি সর্বদা সেই ঠাকুরানীকে গড় করে আসতাম। কোন ব্যারাম দেখা দিলে অথবা কোন বিপদে পড়লে ঠাকুরানীকে সিঁদুর মানত করতাম। পরে এক পয়সার সিঁদুর দিলে মালি (পূজারী) ঠাকুরানীর দেহে লেপে দিত ও এক পয়সা দক্ষিণা নিত।

গ্রামের মধ্যে আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে ন্যাড়া গোঁসাইর মঠ ছিল। মন্দিরের আভ্যন্তরীণ সিংহাসনে চৈতন্য, নিত্যানন্দের বড় বড় দুটি মূর্তি (বোধ করি কাঠের) এবং পাষাণ ও পিতলের আরো অনেকগুলি মূর্তি বিরাজিত

১ মাঙ্কড়া পাথর বাড়ি রাস্তা মেরামতের কাজে লাগে।
২ দেবতা ভর হওয়া লোক।
৩ দেবতার স্নানপর্ব।

ছিল। সেই মন্দিরের সম্মুখের বকুল গাছের গোড়ায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল। আমি সেই পাঠশালায় পড়তাম। পড়তে গিয়ে ঠাকুরদের দর্শন করতাম, গড় করে আসতাম। সেই সময় মনে ভাবলাম বকুল মঙ্গলার চেয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু বড়। ঠাকুরানীর উপর আর ভক্তি রইল না। ঠাকুরমা স্নান সেরে পুজো করতেন, সন্ধ্যেবেলা মালা জপতেন। তাঁর দেখাদেখি আমিও স্নান করার সময় "পাপঽহং পাপ কর্মঽহং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে স্নান সেরে আসতাম। স্নান সেরে উমা, কাত্যায়নী, গৌরী ইত্যাদি দুর্গা এবং মহাদেবের নাম যা অভিধানে পড়েছিলাম সেই দেবতাদের নাম আবৃত্তি করতাম। ঠাকুরমাকে মালা জপ করতে দেখে আমারও মালা জপ করায় মন হল। তুলসীর মালাটি কোথায় পাব মনে মনে খুঁজে বেড়াই একদিন বিকাল বেলা মতিগঞ্জ বাজার হতে বাড়ি আসছি. আমার সামনে পথের মাঝে একটি সুন্দর তুলসী মালা পড়ে আছে দেখলাম—সেই মালাটি যেন আমায় জন্য কে রেখে গেছে। আমি যে মনে মনে একটি মালা খুঁজছি নিশ্চয়ই একথা আমি কাকেও বলি নি। প্রভু আমাকে এই মালাটি দিলেন এই মনে করে মালাটি নিয়ে এলাম।

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'

ঠাকুরমা এই মন্ত্র পড়ে মালা জপতেন। আমিও সন্ধ্যার সময় মালা জপতে শুরু করলাম।

আমাদের বাড়িতে শালগ্রাম শিলা ছিল। পুরোহিত প্রতিদিন পুজো করে সহস্র নাম পাঠ করতেন। সময় সময় চণ্ডীপাঠ হত। আমার মন্ত্রপাঠ শুনলে কেউ কেউ হাসতেন।

আমাদের বাড়ি থেকে আধক্রোশ দূরে জুয়াবাজারের কাছে ঝাড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির ছিল। আমার জ্যেঠিমা সেই মহাদেবের বড় ভক্ত ছিলেন। বাগানের পাকা কলা আর দুধ দই গুড় এই সব জিনিস দিয়ে পঞ্চামৃত হয়। এই পঞ্চামৃত মহাদেবের কাছে ভোগ লাগে। জ্যেঠিমা বাড়িতে একজন ব্রাহ্মণের হাতে পঞ্চামৃত তৈরি করিয়ে মহাদেবের ভোগের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। মহাদেবের পাণ্ডা ব্রাহ্মণ মহাদেবের বহুবিধ মহিমার কথা প্রচার করত। সে বলত, 'মহাদেবকে ভোগ দিয়ে যে যা বর চাইবে সে সেই বর পাবে।' ছেলেবেলায় দেখেছি মহাদেবের বহুবিধ মহিমার কথা প্রচারিত ছিল। অসুখ ভাল হবার

জন্য অনেক লোক ধরনা দিত। কাছারির কাছে মহাদেবের মন্দির। অনেক মামলার বাদী, প্রতিবাদী দুই পক্ষ মামলায় জয়ী হবার আকাঙ্ক্ষায় মহাদেবকে ভোগ মানত করত। পূর্বে মহাদেবের কাছে মাতব্বর লোকেদের অনেকে মিষ্টান্ন ভোগ লাগাত। ইদানিং অনেক কমে গেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি লবণ তৈরি করবার পূর্বে ঝাড়েশ্বর মহাদেবকে পূজা দেওয়া হত। পূজারী পাণ্ডা আমাদের কাছে এসে বলত, 'ঝাড়েশ্বর প্রত্যক্ষ দেবতা, ডাকলে জবাব দেন, আর জল ও দুধ মিশিয়ে মহাদেবের মাথায় ঢাললে, জল বয়ে যায় আর দুধটুকু ছেঁকে তিনি পান করেন।'

ঝাড়েশ্বরকে দর্শন করতে গেলাম। বোম্ বোম্ বাবা বাবা বলে পূজারী শিবলিঙ্গের উপর দুধমেশানো জল ঢেলে দিলে মহাদেবের মাথা হতে ভুড় ভুড় শব্দ শোনা যেত। জলের ভুড়ভুড়ি দেখে আমার হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তি জাত হল। বিশ্বাস করলাম, সত্য কথা ডাকলে মহাদেব জবাব দেন। দর্শন করবার জন্য প্রতি সোমবার, কদাচিৎ অন্যদিনে যেতাম। পূজারী পাদোদক অর্থাৎ মহাদেবের উপর ঢালা জল ও বেলপাতা এনে দিত। আমি ভক্তিপূর্বক পান করতাম। অনেকদিন অবধি ভাল করে দেখলাম দুধ আর জল মিশিয়ে মহাদেবের মাথায় ঢেলে দিলে ঠিক সেই জল মেশা দুধ বয়ে যায়। মহাদেব দুধ ছেঁকে পান করেন, খালি জল বয়ে যায়, সে কথা কই হয়? আমার মন নিতান্ত দুর্বল। আবার বুদ্ধি ও ভক্তি ততোধিক দুর্বল। মহাদেবের প্রতি ভক্তি কমে গেল।

সেই সময় বাইবেল এবং অন্যান্য পুস্তক পাঠ এবং পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে কথোপকথন দ্বারা জানতে পারলাম একমাত্র প্রভু পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি কর্তা এবং প্রভুর পুত্র যীশুখ্রীষ্ট আত্মার ত্রাণকর্তা। খ্রীষ্টের নামে 'ডুবিত' না হলে মৃত্যুর পরে অনন্ত নরকে পড়তে হবে। সেই সময় মনের মধ্যে ধারণা হল—ঈশ্বর পৃথিবীতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপাসনা করলে তিনি উদ্ধার করবেন। এ সব দেবদেবীরা কে? প্রতি গ্রামে গ্রামে দেবতা, মন্দিরগুলিতে কত দেবতা—এতগুলি দেবতাকে কিরূপে পূজা করব? এরা ত ত্রাণ করতে পারবে না, পূজা করলে হবেই বা কি? কবি রাধানাথ বাবুকে এসব কথা বললাম এবিষয়ে কি করা কর্তব্য। দুইজন অনেকদিন অবধি বসে বিচার করলাম। শেষে দুইজনই একই দিনে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করা স্থির করলাম। শেষে একদিন

রাধানাথবাবু হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করতে পারবেন না বলে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করলেন। একা খ্রীষ্টান হতে আমার সাহস হল না।

অধুনা দেবদেবীদের উপর আর আস্থা নেই। মনের মধ্যে ঈশ্বরের চিন্তা করতাম, কিন্তু ঈশ্বরকে কিভাবে পূজা করতে হবে জানি না। এই সময় কলিকাতা হতে একজন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক বালেশ্বরে এলেন—নাম ঈশানচন্দ্র বসু। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তাঁর সঙ্গে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন হত। ঠিক সেই সময় বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস প্রথম বেরিয়ে ছিল—বালেশ্বরে আসে নি। ঈশানবাবু কলকাতায় সেই পুস্তকখানি পড়ে এসেছিলেন। সেই পুস্তকের ভাষা এবং বিষয়বস্তুর খুব প্রশংসা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করতে চাইলেন বাংলা ভাষা খুব ভাল। ওড়িয়া ভাষা ভাল নয়। একবার দুইবার নয় তিন চার দিন অবধি তিনি ধর্মচর্চা ছেড়ে কেবল ভাষা চর্চা করতে লাগলেন। আমার মনে ভারি ক্রোধ জাত হল, আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম না।

এই ঘটনার অনেকদিন পরে বালেশ্বর নিমক মহালে একজন কেরানী বঙ্গদেশ হতে এলেন—নাম প্রসন্নকুমার চ্যাটার্জি। শুনলাম সেই লোকটি ব্রাহ্ম। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। প্রসন্নবাবুর বাসাঘর ঝাড়েশ্বর মন্দিরের পশ্চাৎভাগে। বাবুর বাসা ও মন্দিরের মধ্যভাগে একটি সরু গলির মাত্র ব্যবধান। প্রতি রবিবার রাত্রে প্রসন্নবাবুর বাসায় ব্রহ্মোপাসনা হত। উপাসনার শেষে আমরা উপাসকেরা একত্রে বসে মদ্য পান করতাম। সে সময় একদল ব্রাহ্মদের মধ্যে মদ্য পানটা উপাসনার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। বঙ্গদেশে ঋষিতুল্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্ম মহাত্মারা মদ্য পান হতে বিরত ছিলেন না। অবশেষে সেই মহাত্মারা বিষবৎ মদ্য পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই মহাত্মাদের একান্ত যত্ন হেতু বঙ্গদেশীয় যুবকদের মধ্যে বহু পরিমাণে মদ্যপান নিবারিত হয়েছিল।

কয়েকমাস পরে প্রকাশ্যভাবে একটি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করা হবে স্থির হল। আমরা উপাসকেরা অর্থাৎ দামোদরপ্রসাদ দাস, গোবিন্দপ্রসাদ দাস, জয়কৃষ্ণ চৌধুরী, ভোলানাথ বাবু সেই সভার সভ্য ছিলাম। এঁদের ছাড়াও সময় সময় অন্যান্য কয়েকজন সতীর্থ উপাসনায় যোগ দিতেন। বালেশ্বরে মোতিগঞ্জ বাজারের পশ্চিম প্রান্তে ময়ূরভঞ্জ মহারাজার একটি পাকা বাসাঘর ছিল। শহরের মধ্যে সেই পাকাবাড়ির ডাক নাম 'রাজা কোঠা' (বর্তমানে সে

বাড়িতে ময়ূরভঞ্জের কোনো অধিকার নেই। স্বর্গীয় মহারাজা মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব ব্রাহ্মসমাজকে বাড়ি দান করায় রাজার পুরাতন কোঠা বাড়ি ভেঙে একটি বৃহৎ উপাসনা মন্দির প্রস্তুত হয়েছে) উক্ত রাজবাড়িতে ১৮৬৭ অথবা ৬৮ সালে সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকালে উপাসনার কাজ আরম্ভ হল। উক্ত সময় অবধি বালেশ্বর-বাসী ব্রাহ্মধর্মের নাম শোনেন নি। সমাজ স্থাপনের কথা শুনে গণ্যমান্য লোকেরা চমৎকৃত হলেন। প্রশ্ন উঠল—ব্রাহ্মধর্ম কি? কাছারিতে সভা বসে গেল। অনেক আলোচনার পর জ্ঞানী বহুদর্শী মহাত্মারা অর্থ করলেন—ব্রাহ্মধর্মের অর্থ আবার কি—ঠাকুর দেবতাকে ছুঁড়ে ফেলবে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মানবে না, তাদের জাত নেই, ব্রাহ্মসমাজের অর্থ একটা বড় পাতায় ভাত বাড়া হবে তার উপরে মদ ছেটানো হবে ব্রাহ্মণ পাণ[1] মুসলমান ছত্রিশ জাতি এক সঙ্গে বসে খাবে। কাছারিতে হুলুস্থূল পড়ে গেল। স্থির হল এটা হচ্ছে সেই মিচ্‌কে শয়তানের কাজ। কুল মহত্ত্ব সব তো জলাঞ্জলি দিয়েছে, এবারে জাতি খোয়াতে বসেছে। বস্তুতঃ কথাটা সত্য না মিথ্যা চোখে দেখা দরকার। প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পরে রাজার বাড়িতে উপাসনা হয়। রাধানাথবাবুর পিতা সুন্দরনারায়ণ বাবু এবং কয়েকজন আমলা প্রচ্ছন্নভাবে দেখতে এলেন। উপাসনার সময় বাইরে থেকে ফাঁক দিয়ে দিয়ে চেয়ে দেখলেন। দুই তিনবার এইরূপ দেখে নিয়ে কাছারিতে প্রকাশ করলেন 'না হে না হে ভাত-টাতের কথা নয় চার পাঁচজন বসে প্রথমে গান করলেন তারপরে বই পড়া হল, তারপর চোখ বন্ধ করে বসলেন, শেষে গান গেয়ে উঠে চলে গেলেন।' গোলমাল শেষ হল, সোডা বোতলের ছিপি ফট্ করে উঠে পড়ে গেল।

প্রায় চার ছয় মাস পরে চাঁদা করে একটি সমাজ গৃহ প্রস্তুত করানো হয়েছিল। সেই কাঁচা ঘর ভেঙে গিয়েছে। বালেশ্বরে অল্প সংখ্যক ব্রাহ্ম থাকলেও প্রভুর কৃপায় চারিটি স্বতন্ত্র সমাজ মন্দির প্রস্তুত হয়েছে।

এই সময় নারীজাতির পরিবর্তন সম্বন্ধে 'সম্বাদবাহিকায়' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল শীত নিবারণ এবং সম্ভ্রম রক্ষার জন্য নারীজাতীর পরিধেয়ের পরিবর্তন আবশ্যক। সেখানে লেখা ছিল—শাড়ীর নিচে আরো একটা কোনোরকম সেলাই করা জামা বরঞ্চ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে ও সম্মান রক্ষা হবে। বর্তমান শিক্ষিত সমাজের মহিলারা সেমিজ পরছেন।

---

১ 'পাণ' অস্পৃশ্য জাতি বিশেষ। উচ্চারণ পাণ-অ।

লেখক সেইরূপ পোশাকের জন্ম প্রস্তাব করেছিল। অবশ্য সেমিজ নির্মাণ কৌশল তাঁর মনে উদিত হয় নি। প্রবন্ধটি পড়ে সাহেবরা প্রকাশ্যে লেখকের প্রশংসা করেছিল। লেখা পড়ে আমলারা খুব হাসলেন। স্ত্রীলোকেরা আঙরাখা পরবে, এ প্রকার অসঙ্গত অদ্ভুত বিষয় তাদের হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়েছিল। কথাটা হাসি তামাশায় উড়ে গেল। এ প্রকার অদ্ভুত অসঙ্গত প্রস্তাব করার জন্ম লেখককে কেউ আক্রমণ পর্যন্ত করল না।

দ্বিতীয় বিবাহ

ঠাকুরমার মৃত্যুর পর গৃহবাস আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হয়ে পড়ল।

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যাচাপ্রিয়বাদিনী, সে গৃহে সুখ শান্তি প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনামাত্র। জ্যেঠিমা মাসের মধ্যে একবার মাহিনার টাকা গুনে নেন, নিজের একটি মাত্র টাকা ব্যয় করলে তর্জন গর্জন করেন॥ তাঁর সঙ্গে আমার এই একদিনের সম্পর্ক। আমার মাহিনার টাকার অধিকাংশই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের পোশাকে ও নিজের জন্য অলঙ্কার প্রস্তুত করানো এবং আমোদ প্রমোদে ব্যয় হত। আমার আহারের প্রতি কারও দৃষ্টি ছিল না। বিকেলে তাঁর ছেলেদের জন্য জলখাবার তৈরি হত। আমার জলখাবার আমি বাজার থেকে কিনে আনতাম। তাও কখনও কখনও কোনো অজুহাতে নিজের ছেলেদের জন্য নিয়ে নিতেন। সেদিন আমার উপবাস। আমি সকাল বেলাটা কেবল বাড়িতে আহার করে বেরিয়ে যাই। সমস্তদিন বাইরের কাজে লিপ্ত থাকার জন্য বিনা ক্লেশে সময় কেটে যায়। সন্ধ্যাবেলা ছাপাখানার একজন চাকর দুটি আটার রুটি সেঁকে দেয়। কেবল সেই শুকনো রুটি দুখানা খেয়ে ঘরে ফিরি। অতিরিক্ত পরিশ্রমহেতু শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ত অনিয়মিত আহার ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। 'সম্বাদবাহিকা' পরিচালনা ভিন্ন আর কোনো রকম লেখা-পড়া করার শক্তি ছিল না। সপ্তাহের ছয়টা দিন নানা রকম কর্তব্য কার্য সাধনে অতিবাহিত হত। শনিবার রাত্রিটা আমোদ প্রমোদ করার জন্য নির্ধারিত ছিল। শনিবার সন্ধ্যা হতে রাত এগারোটা অবধি বাবু কিশোরীমোহন দাসের উদ্যানে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হত। আমোদ প্রমোদের অর্থ তাস, সতরঞ্জ খেলা, নানা প্রকার আহার্য ভোজন, মদ্যপান, কখনও কখনও বাঈনাচ। সময় সময় অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু কোনো কোনো বাবু মাতাল হয়ে পড়তেন। মদ্যপদের স্বভাব অন্যলোককে অধিক পরিমাণে পান করার অনুরোধ করা। কিন্তু তাদের মধ্যে আমি অত্যন্ত সচেতন থাকতাম। নেশা হবার ভয়ে অতিমাত্রায় মদ্যপান করতাম না। বস্তুতঃ শরীরের জন্যে অল্পপরিমাণে পান

করাও আমার পক্ষে অতিরিক্ত হয়ে পড়ত। চার ঘণ্টা মাত্র আমোদ করার লোভে পড়ে চারদিন অবধি যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। মদ্যপানের পরের দিন হতে যে পরিমাণ অবসাদ আনত তা মিটাতে চার পাঁচদিন লাগত। অথচ অনেক বাবু আমার চেয়ে চার পাঁচ গুণ মদ্যপান, তারপর আফিমের গুলি সেবন করেও বেশ সুস্থ শরীরে থাকত। সেই শিথিল চরিত্র বন্ধুদের সঙ্গে সম্মিলন এবং শনিবাসরীয় নৈশ দোষাশ্রিত আমোদ প্রমোদ সে সময় আমার জীবনে একমাত্র চিত্ত বিনোদক বিষয় ছিল। গার্হস্থ্য সম্পর্ককে যন্ত্রণার বিষয় জ্ঞান করতাম।

আমার পত্নী ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, ক্রমশঃ ব্যাধি বৃদ্ধি হয়ে একবছরের পর জানা গেল পীড়া দুশ্চিকিৎসা এবং মারাত্মক। রোগিণীর উত্তম চিকিৎসা এবং সেবার জন্যে তাঁর পিতামাতা তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেই পিত্রালয়ে তাঁর জীবনাবসান হল। সে সময় আমি পুরীক্ষেত্রে বাস করছিলাম।

দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ না করলে আমরা পিতৃপুরুষের নাম বিলুপ্ত হবে। আমার পিতৃলোকে পিণ্ডপ্রাপ্তি হতে নিরাশ হয়ে পড়বে। এই আশঙ্কায় আমার একজন হিতৈষিণী আত্মীয়া আমাকে বুঝিয়ে কন্যা অন্বেষণ করতে লাগলেন। কন্যা স্থির হয়ে গেল, নাম কৃষ্ণকুমারী দেঈ। নিবাস মোতিগঞ্জ বাজারের সমীপবর্তী পাটলজাত গ্রাম। আমার বিবাহ হয়ে গেল, তৎকালীন বালেশ্বরস্থ অভিজাত এবং গণ্যমান্য বংশ শ্রেণীর মধ্যে আমার শ্বশুর বংশ অন্যতম ছিল। আশি নব্বই বৎসর পূর্বে বালেশ্বরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি পলটন ছিল। আমার শ্বশুরের পিতা চৌধুরী বলরাম মল্ল সেই পলটনে গোমস্তা ছিলেন। আমার শ্বশুর শিবপ্রসাদ মল্লচৌধুরী বালেশ্বরে ফৌজদারি হেডক্লার্ক ছিলেন। শিবপ্রসাদবাবুর পুত্র প্রসন্নকুমার মল্লচৌধুরী কাস্টম হেডক্লার্ক ছিলেন। প্রসন্নবাবু হতে সেই বংশের পতনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী কালের মদ্যপ দুর্বৃত্ত ও লোকেদের অপবিত্র নাম উল্লেখ করতে ইচ্ছা করলাম না। নানা প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন এবং দুশ্চরিত্রতা হেতু সে বংশ উচ্ছন্নে গেছে। কুলের নাম উল্লেখ করার জন্য বংশে কেউই বিদ্যমান নেই। বাস্তুভিটা, প্রশস্ত ইষ্টকালয়, সুন্দর আম্রকানন যুক্ত পতিত উদ্যানভূমি পরহস্তগত।

সাংসারিক সমস্ত প্রকার দুঃখ দুর্দশা মোচন, সৌভাগ্য সুখ ও সম্পত্তি বর্ধনের জন্য যেন দয়াময় পরমেশ্বর কৃষ্ণকুমারী দেঈকে ভার্যা স্বরূপে আমার নিকট পাঠিয়েছিলেন। সত্যনিষ্ঠা পতিপরায়ণতা, ধর্মভাব সর্বপ্রকার সদ্গুণ তাঁর

স্বভাবে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল আমার সেবা করা সর্বপ্রকারে সর্ব বিষয়ে আমার আজ্ঞানুবর্তিনী হয়ে থাকা তাঁর কাছে একমাত্র কর্তব্য ও ধর্ম। তিনি আমার কিরূপ সেবা করতেন শত সহস্র ঘটনার মধ্যেই একটি মাত্র ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি। আমার বিবাহের অল্পদিন পরে (সে সময় আমার স্ত্রীর বয়স তের বৎসর মাত্র) আমি জ্বর রোগে শয্যাগত হয়ে পড়লাম। আমার পায়ের কাছে বসে তিনি দেহে হাত বুলোচ্ছিলেন। রাত্রে আমার ঘুম হত না দেখি সারা রাত বসে উনি পায়ে হাত বুলোচ্ছেন। আমি বললাম শুয়ে পড়। 'হাঁ শোব' বলে শুলেন না। আমি সামান্য বিরক্ত হলে চট করে পায়ের তলায় 'শুয়ে পড়ে' আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি চোখ বুজলে উঠে বসে পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। তাঁর অভিলাষ কোন উপায়ে যেন আমি কিঞ্চিৎ আরাম পাই। ঠিক তিনদিন তিনরাত পরে গ্রামবাসিনী একটি আত্মীয়া মহিলা এসে বকুনি দিয়ে বললেন 'বউ, তুই আজ তিনদিন হল একটা জায়গায় বসে আছিস, উঠিস নি, দাঁতও মাজিস নি, মরে যাবি নাকি?' আমার কথা বলার বিশেষ শক্তি ছিল না। চেয়ে দেখলাম তিনি এতদূর শীর্ণ হয়েছেন যে আমি চিনতে পারলাম না। বিরক্ত হয়ে তাঁর পানে চাওয়াতে হাত জোড় করে বললেন, 'আমি এই মাত্র স্নান করতে যাচ্ছি তুমি বিরক্ত হোয়ো না অসুখ বেড়ে যাবে।'

একবার দুবার নয়, আমার প্রতি অসুখের সময় এই প্রকার ব্যবহার পেয়েছি। আমি রোগশয্যা ছেড়ে না উঠলে তিনি আমার কাছ ছাড়া হন নি। পৃথিবী হতে আমার দরদ পাওয়া শেষ হয়ে গেছে। এখন আমার জীবন শূন্য।

নীলগিরিতে দেওয়ানি চাকরি

নীলগিরি[১] রাজ্যের[২] দেওয়ানের পদ খালি হলে বালেশ্বর জেলার কলেক্টর জন বীম্‌স্‌ সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে গড়জাত অঞ্চলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাকে সেই পদে নিযুক্ত করে পাঠালেন। নীলগিরির রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মর্দরাজ হরিচন্দন আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। রাজ্যের সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত হল। রাজাসাহেব রাজ্য সম্বন্ধে কোন কাজই বুঝতেন না। আমার কোনো কাজ তাঁর কাছে অপ্রীতিকর হলেও মুখ খুলে আমাকে কিছু বলতেন না। আমার সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত চক্ষু লজ্জা ছিল। আমার উপর অসন্তুষ্ট হলেও তিনি এমন প্রীতির সঙ্গে হাস্যকৌতুক করে কথাবার্তা বলতেন যে তাঁর মনের কথা বোঝা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

প্রথম বছর বিনা বাধায় কাজ করে গেলাম। নীলগিরি গড় হতে প্রায় এগার মাইল। বালেশ্বরে যাতায়াতের জন্য দুটি পথ ছিল। একটি পথে কিল্লা হতে ঠিক পূর্ব দিকে প্রায় চার মাইল এসে শেরগড় চটিতে পৌঁছতে হয়। সেই স্থান হতে বড় রাস্তা দিয়ে বালেশ্বর অবধি আসা সহজ। আর একটি পথ কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে গ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে গেছে। আমি প্রতি শনিবার নিজের বাড়ি যেতাম। বর্ষাকালে ক্ষেতের পথ খালের নালার জলে পূর্ণ হয়ে যেত। ঘোড়া কিম্বা পালকী সহজে যেত না। আমি হাতির পিঠে যাওয়া আসা করতাম। নীলগিরি গড় হতে শেরগড়ের কাছে বড় রাস্তা অবধি যে চার মাইল দূরত্ব বর্ষাকালে আলের পথ ঘোরানো সর্পগতির ন্যায় বাঁকা হওয়ায় তা প্রায় ছয় মাইল হয়ে দাঁড়াত।

মনে ভাবলাম নিজ গড়[৩] হতে ঠিক পূর্বদিকে সোজাসুজি রাস্তা প্রস্তুত করে বড় রাস্তায় মিশিয়ে দিলে যাতায়াতের পক্ষে বড়ই সুবিধা হবে। রাস্তার কাজ আরম্ভ করে দিলাম। প্রায় আধ মাইল দূরে একটি পার্বত্য নদী পড়ল। বর্ষার সময়

---

১ বালেশ্বর জেলার নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। কিল্লা অর্থ এখানে রাজ্য।

২ ফকীরমোহন যেখানে যেখানে 'কিল্লা' লিখেছেন সেখানে রাজ্য অর্থ চান। বাংলা কেল্লা বা জেলা নয়।

৩ দেশীয় রাজ্যের সদর অর্থাৎ রাজা যেখানে বাস করেন সেটিকে বলে নিজ গড়।

গড়ের নিকটবর্তী সুনচোট পর্বত হতে জল বয়ে এসে সময় সময় পথিকদের পক্ষে পথ অগম্য করে তুলত। কদাচিৎ তিন-চার হাত অবধি গভীরে জলের বেগ থাকত। সেই নালার নিকটবর্তী স্থান নিবিড় কাঁটার বাঁশবনে আচ্ছন্ন ছিল। পর্বতটি বনের পার্শ্ববর্তী থাকায় ভাল্লুকদের এমন উপদ্রব ছিল যে সন্ধ্যার পর পথ বন্ধ হয়ে যেত। পথিকরা যাওয়া আসা করতে পারত না। সূর্যাস্তের পর গ্রামের পাশে চরবার জন্য ভাল্লুকের পাল ও বরাহের পাল পর্বত হতে নেমে আসত। একদিন ঠিক সূর্যাস্তের সময় একটা ভাল্লুককে পাহাড় থেকে নেমে আসতে আমি নিজে দেখেছিলাম। বাঁশবন সব কাটিয়ে সেই নদীর উপর একটি পাথরের সাঁকো বানিয়ে দিলাম, গড় থেকে পূর্বদিকে তিন মাইল পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। জমিটা পাথুরে ও উঁচু নিচু হওয়ায় গাছের গোড়া তুলে ফেলে রাস্তা প্রস্তুত করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল।

নীলগিরিতে হাট বাজার কিছুই ছিল না। খাদ্য বা অন্য কোন জিনিস দরকার হলে বালেশ্বর মোতিগঞ্জ বাজার কিম্বা উত্তরে ছয় মাইল দূরবর্তী রেমণায় লোক পাঠাতে হত। রেমণার সাহাজি হাট হতে দুই তিন জন বিধবা তরি-তরকারি নিয়ে সপ্তাহে দুইতিনবারে গড়ে বিক্রয় করতে আসত। কদাচিৎ কেউ গড়ে মুদির দোকান খুলে বসত। আমলা এবং রাজার লোকেরা বাকিতে সওদা নিয়ে দাম দিত না। অগত্যা দোকানি পুঁজিপাটা হারিয়ে ছেড়ে পালাত। সকলে এই কারণে হয়রানে পড়ত। আমি এই অভাব দূর করার জন্য গড়ের সম্মুখে শঙ্করখুণ্টা নামক পুকুরের পূর্বপাড়ে আমবনে একটা হাট বসিয়ে দিলাম। নূতন রানী 'মণিমার'[১] নামানুসারে সেই হাটের নামও রাখা হল নির্মলা হাট। সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শনিবার দুবার হাট বসত। চারদিক হতে চার পাঁচ ক্রোশ দূর হতে লোকে এসে কেনা বেচা করতে লাগল। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর গত হয়েছে। এখন অবধি নীলগিরি হাট, কারবারী জায়গা বলে বালেশ্বরে, নীলগিরি ও ময়ূরভঞ্জে খ্যাত।

সে সময় নীলগিরিতে লেখাপড়ার কোনো চর্চা ছিল না। রাজাসাহেবের বার-চোদ্দ বছরের দুইটি পুত্র[২] এবং বাবু সাহেবের চোদ্দ বছরের একটি ছেলে এই

১ রাজা বা রানীকে সম্মান দেখানোর জন্যে মণিমা বলা হয়। যেমন 'His Highness', 'Her Highness'।

২ রাজা অপুত্রক ছিলেন। সম্ভবত ফুলবাঈর পুত্র দুইটিকে লেখক ১২-১৪ বছরের পুত্র বলে লিখছেন—প্রকাশক।

তিনটি ছেলেই বকাটে ছেলেদের সঙ্গে দিনরাত খেলাধুলা করে বেড়াত। বুলবুল পাখি পোষা তাদের একটি বিশেষ আনন্দের খেলা ছিল। সেই ছেলে তিনটির শিক্ষার জন্য আমি বালেশ্বর হতে একটি মাস্টার এনে নিযুক্ত করে দিলাম। মাস্টার মশাই তাঁদের ইংরেজি পড়াতে লাগলেন।

নীলগিরির মহারাজারা কতকগুলি ব্রাহ্মণ পাড়া স্থাপন করে গেছেন। তাদের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ নিষ্কর ভূমি গচ্ছিত থাকায় পাড়ার বিপ্রমণ্ডলী নিশ্চিন্তমনে ঘুরে বেড়াত। তাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চার নাম গন্ধও ছিল না। সমস্ত রাজ্যের মধ্যে একজনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিল না। আমি সরকারি খরচে নিজগড় মুকামে একটি সংস্কৃত টোল বসালাম। গড়নিবাসী ব্রাহ্মণদের ছেলেরা টোলে পড়তে লাগল। গড়ে থেকে সংস্কৃত টোলে পড়া পাড়ার ছেলেদের পক্ষে সুবিধা হল না। হিসাব করে দেখলাম যতগুলি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি আছে প্রতি তিনবিঘা জমির উপর বার্ষিক দুই পয়সা করে চাঁদা আদায় করলে মফঃস্বল অঞ্চলে অনেকগুলি টোল বসানো যেতে পারে। মফঃস্বলের শাসনী[১] ব্রাহ্মণদের ডাকিয়ে আমার অভিপ্রায় জানালাম। শিক্ষার উপকারিতা এবং ব্রাহ্মণ ছেলেদের পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় অনেকদিন অবধি অনেক রকমে বোঝালাম। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা আমার প্রস্তাবে একাধারে অসম্মতি প্রকাশ করল। বিদ্যাশিক্ষার মর্যাদা এরা বুঝল না। অধিকন্তু মনে করল নিষ্কর ভূমির উপর কর বসানো একটা অজুহাত মাত্র, আসলে চাঁদা নয় ওটা খাজনা। আজ তিন বিঘায় দুই পয়সা করলে পরে একটাকা খাজনা ধার্য হবে। নানারকম যত্ন ও কৌশলে ব্যর্থকাম হয়ে মনে মনে বিচার করলাম আকাট মূর্খ লোককে বিদ্যার উপকারিতা বোঝানো বিড়ম্বনা মাত্র। কিছু ক্ষমতা আরোপ করে চাঁদা আদায় করা উচিত। ব্রাহ্মণদের পাণ্ডার উপর চাঁদা ধার্য করে তাহার একটি টাট্টু ঘোড়া নিলাম করিয়ে টাকা উসুল করলাম।

আত্মকৃত দুষ্কৃতির প্রতিফল ভোগের সময় অবিবেকী লোকেরা কপালের দোষ দেখান সত্যি। কিন্তু সাধারণ লোকেরা আপনার অজ্ঞতাজনিত কার্যের ফলাফল ভোগের সময় অতি সহজে নিজের ভুলের গুরুত্ব অনুভব

১ উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণদের উত্তর ভারত থেকে আনিয়ে যে গ্রামে বা পাড়ায় বসানো হত তাকে বলা হত 'ব্রাহ্মণ শাসন'। ব্রাহ্মণ শাসনে বাস করত বলে তাঁদের বলা হত 'শাসনী ব্রাহ্মণ।'

করতে পারে। বলপ্রয়োগে ব্রাহ্মণদের বিদ্যাশিক্ষা দেবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে যে নিতান্ত অবিবেচনার কাজ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। কোনো প্রকারে টোল তো বসানো গেলই না, উপরন্তু ব্রাহ্মণেরা সকলে একত্র হয়ে আমার সর্বনাশ সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়ে রইল।

আমি যে ক্রমশঃ রাজাসাহেবের বিরাগভাজন হয়ে পড়ছি, সে কথা বুঝতে পারি নি। আমার উপর রাজার একই ভাবে মৌখিক অনুগ্রহ দেখানো তার কারণ। রাজাসাহেবের আমার প্রতি বিরক্তির কারণ হচ্ছে—রাজাসাহেব অপুত্রক ছিলেন। বাবুসাহেব হরিহর ভ্রমরবর রায়ের একমাত্র পুত্র জাত হবার সময় সেই পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করার মনস্থ করলেন। পরে তার মতের পরিবর্তন হল। সেই ভাইপোকে পরিত্যাগ করে একজন ফুলবাঈর[১] পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করার সঙ্কল্প করলেন। এই সূত্রে রাজভ্রাতা হরিহর ভ্রমরবর রায়ের সঙ্গে রাজার মনোমালিন্য ঘটল। ক্রমশঃ বিবাদ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। রাজাসাহেব কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করতে লাগলেন। রাজার ভয়ে পরিচারকরা বাবুসাহেবকে ছেড়ে পালালো। রাজাসাহেব বাবুসাহেবের সমস্তরকম আয় বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁকে অন্ন বস্ত্রের জন্য দারুণ কষ্ট ভোগ করতে হল। বাবুসাহেব গড়জাত মহালের সুপারিনটেনডেণ্ট মহাত্মা রেভেনশ সাহেবের নিকট পুনঃ পুনঃ নালিশ করতে লাগলেন। সাহেব মহোদয় দুই ভায়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা করে অকৃতকার্য হওয়ায় রাজাসাহেবের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। সাহেব মহোদয়ের বিশেষ তদন্তের ফলে প্রকাশ পায় দেওয়ান দামোদর মহাপাত্র সমস্ত বিবাদের মূল কারণ। এটা প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁকে পদচ্যুত করে আমাকে দেওয়ানের পদে নিয়োগ করে পাঠানো হয়েছিল।

রাজপরিবারের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাছাড়া এই ভ্রাতৃবিবাদের জন্য আমার পূর্ববর্তী দেওয়ান পদচ্যুত হয়েছিলেন। শান্তি স্থাপন করে হাকিমদের তুষ্ট করা আমার কর্তব্য। বিশেষতঃ রাজভ্রাতা হরিহর ভ্রমরবর রায়ের সঙ্গে আমার নীলগিরি যাবার পূর্বে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। এই সমস্ত কারণবশত. আমি অবসর সময় সর্বদা বাবুসাহেবের মহলে

১ উপপত্নী—বিবাহের সময় রানীর সঙ্গে যৌতুক হিসাবে দাসদাসী আসত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সদ্বংশীয়া, রূপগুণ সম্পন্না ও নৃত্যগীত নিপুণা হত।

যাতায়াত করতাম। রাজাসাহেব অবধি বাবুসাহেবের এলাকায় এসে বসতেন। উভয় ভাইয়ের মধ্যে সম্প্রীতি জাত হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। অপিচ অন্তর্বহ্নি যে প্রচ্ছন্নভাবে থেকে গেছে বুদ্ধির অল্পতা হেতু বুঝতে পারি নি। বিবাদের মূল কারণ হল পোষ্যপুত্র গ্রহণ নিয়ে। ফুলবাঈর ছেলেকে গদিতে বসানো রাজাসাহেবের নিতান্ত ইচ্ছা। কথাটা মনের মধ্যে সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল—আমি সাহায্য করলে তাঁর বাসনা সফল হবে।

আমি সর্বদা বাবুসাহেবের মহলে যাই, বাবুসাহেবও দেখা সাক্ষাৎ করতে সর্বদা আমার কাছে আসেন। এই কারণে রাজা সাহেবের আন্তরিক বাসনা আমার কাছে দীর্ঘকাল অবধি প্রকাশ করেন নি। কিন্তু আর অধিককাল স্থির থাকতে পারলেন না। একদিন আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, 'যে প্রকারে হোক উমাকান্তকে উত্তরাধিকারী করতে হবে। তুমি এ বিষয়ে যত্নবান হও।' রাজাসাহেবের ফুলবাঈর ছেলের নাম উমাকান্ত। আমি বিবেচনা করলাম এ বিষয়ে বৃথা যত্নবান হতে গিয়ে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় বিবাদাগ্নি পুনর্বার প্রজ্বলিত হবে। আবার কার্যে সফল হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। রাজাসাহেবকে অন্ধকারে ফেলে রাখা ভাল নয়। তাঁর মন হতে এ বৃথা আশা দূর করে দেওয়া উচিত। স্পষ্টভাবে উত্তর দিলাম, 'হুজুর, এরূপ ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। গড়জাতের আইন পঁচিশ ধারা অনুসারে বর্তমানে ভ্রাতুষ্পুত্র থাকায় ফুলবাঈর পুত্র উত্তরাধিকারী হতে পারে না।' সেই সময় গড়জাতের রাজারা আইন কানুন কিছু বুঝতেন না। তাঁদের মনে ধারণা ছিল, তাঁরা রাজেশ্বর যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। সরকার তাঁদের রাজ্যে আবার কে? রাজাসাহেব মনে মনে ভাবলেন আমি তাঁর শত্রুপক্ষের। আমি নীলগিরির দেওয়ান থাকলে তাঁর ইচ্ছা সফল হবে না। আমি বর্তমানে সম্পূর্ণ রূপে শত্রুপক্ষের। আমার উপর রাজাসাহেবের আর বিশ্বাস রইল না। যেহেতু আমি গড়জাতের সুপারিনটেণ্ডেন্ট দ্বারা নিযুক্ত, আমায় কিছু বলার তাঁর কোনো অধিকার ছিল না। আমার দেওয়ানীর তৃতীয় বছর আরম্ভের সময় নীলগিরিতে একটি ভয়ঙ্কর প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হল।

নীলগিরি পর্বত শ্রেণীর মধ্যে একটি পর্বতের নাম বিষ্ণুপুর পাহাড়। এই পর্বতশৃঙ্গটি নীলগিরি গড়ের দক্ষিণ দিকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। এই পর্বতে

মুংনী[1] পাথরের দুইটি খনি আছে। একটি খনির নাম বিষ্ণুপুর, অন্যটির নাম তালসজিআ। এক শ্রেণীর লোক আছে তাদের নাম পাথুরিয়া। পাথুরিয়া অর্থ খনি থেকে যারা পাথর কেটে এনে তা দিয়ে থালা, বাটি, গেলাস ইত্যাদি বাসন তৈরি করে। এই বাসন বঙ্গদেশবাসীদের বড় প্রিয়। বার্ষিক কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকার বাসন বঙ্গদেশে রপ্তানি হয়। পাথুরিয়ারা বাটালি মুগুর দিয়ে পাথর কাটে। মুগুর পিছু রাজার খাজনা সাড়ে-ছয় টাকা। যারা পাথুরিয়াদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে, তাদের উপাধি ছিল মহালদার। প্রতিবছর মহালদারি নিলাম হয়। যে সব চেয়ে অধিক টাকা দিতে রাজি হয়, মহালদারি সে পায়।

আমার দেওয়ানী গ্রহণ করার প্রথম বছরে কন্হেই মিশ্র নামক একজন লোক বার্ষিক চার হাজার টাকা জমা দিয়ে পাথরের খনি ঠিকা নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করল। এর পূর্বে বার্ষিক আড়াই হাজার টাকার বেশি উসুল হত না। পাথুরিয়াদের খাজনা না বাড়ালে কি উপায়ে অধিক টাকা উসুল করবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় উত্তর দিল, 'অনেক লোক ঠিকাদারির টাকা জমা না দিয়ে চোরা-ভাবে পাথর কেটে নেয়। তাদের কাছ থেকে টাকা উসুল করে দাখিল করব।' রাজ সরকারের অধিক লাভের প্রলোভনে উক্ত মিশ্রর কাছ হতে ঠিকাদারির কবুলিয়ত নিয়ে মহালদারির সনন্দ তাকে দেওয়া হল।

পর্বতের উপর পড়ে থাকা পাথরগুলি অব্যবহার্য ছিল। গভীর খনি খুঁড়ে একে-বারে নিচের পাথরগুলি বাসন করার উপযোগী। সেই খনির মধ্যে বিভাগ অনুযায়ী পৃথক পৃথক স্থান থাকে। যে যার নিজের খনি থেকে পাথর কাটে। এক জনের নামে পাট্টা থাকে সত্যি কিন্তু পাট্টাদারের ছেলে ভাইরা মিলিত হয়ে পাথর কাটে। পূর্ব-মহালদারদের ঘর ছিল পাথরমহালে। পাড়া-পড়শীর প্রতি চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে এই পাথর কাটার প্রতিবাদ করে না। কিম্বা কিছু কিছু টাকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়।

কন্হেই মিশ্রর ঘর পাথরমহালে। খনির অবস্থার কথা সে সবিশেষ জানে। সে মহালদারি পেয়ে যার নামে কবুলিয়ত সে ছাড়া অন্য সকলকে পাথর কাটতে নিষেধ করে দিল। একজন পাথুরিয়া সরকারের কাছ হতে পাট্টা নেয়। তার সংসারে ছেলে ভাই যে কজন আছে সকলে মিলে পাথর কাটে। এইরূপে

১ যে পাথর দিয়ে থালা বাটি তৈরি হয়।

চিরকাল যারা ভোগদখল করে আসছে এখন তা বন্ধ করে দিলে তাদের সবিশেষ ক্ষতি হয়। সহজে কি তারা মেনে নেবে? ভয়ানক গোলমাল হতে লাগল। সকলে এক জোট হয়ে পাথর কাটা বন্ধ করে দিল। কহ্নেই মিশ্রের বেশ কিছু সাহস ছিল এবং তেমনি সে অত্যাচারীও ছিল। সে পাথুরিয়াদের উপর অত্যাচারও করেছিল। নীলগিরির সমস্ত এলাকার প্রজারা নিতান্ত সরল এবং নিরীহ, কেবল পাথরমহালের প্রজারা কিন্তু বুদ্ধিমান, বদমায়েস এবং ঠক। খড়াপুর মহালে তিন চারটা হাট বসে। সেই হাটগুলিতে প্রতিদিন অনেক টাকার পাথরের বাসন বেচা কেনা হয়। নানা স্থান হতে ব্যবসায়ীরা এসে পাথরের বাসন কেনেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে পাথুরিয়ারা সেয়ানা হয়ে উঠেছিল। পাথুরিয়াদের যথেষ্ট আয় ছিল, কিন্তু সকলেই প্রায় অমিতব্যয়ী। এই হেতু সকলে দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত। পাথরের ব্যবসায়ী মহাজনদের পাথর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ অগ্রিম নিয়ে অধিকাংশ সময় পরিশোধ করে না। এক এক জন পাথুরিয়া পাঁচ সাত জন মহাজনের কাছে ঋণী। একটা প্রবাদ ছিল, 'পাথুরিয়া জাতি কর্জ পেলে কেনেন হাতি।'

কহ্নেই মিশ্রের অত্যাচারের বিষয় উল্লেখ করে তাকে মহালদারি হতে বরখাস্ত করার জন্য সকলে দরখাস্ত দিতে লাগল। সেই সময় মিশ্রকে মহালদারি হতে বরখাস্ত করলে রাজ্যের মধ্যে কোনো প্রকার গোলমাল হবার সম্ভাবনা থাকত না। আমি দেখলাম, কহ্নেই মিশ্রকে মহালদারি হতে বরখাস্ত করলে বর্ধিত খাজনা উসুল হতে পারবে না। তাছাড়া রাজ সরকার যাকে নিযুক্ত করেছে, পাথুরিয়াদের প্রার্থনায় তাকে বরখাস্ত করলে সরকারের সম্ভ্রম নষ্ট হবে। এই কারণে পাথুরিয়াদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করতে লাগলাম।

এখন প্রজারা রাজ সরকারের সমস্ত প্রকার হুকুম অমান্য করে প্রকাশ্যে একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করল। রাজ্যের ব্রাহ্মণেরা এবং সদর কাছারির একদল আমলা প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্রোহে যোগ দেওয়ায় তাদের সাহস বেড়ে গেল। পাথুরিয়াদের বিশ্বাস (আসলে কথাটা সত্যি) আমার পক্ষপাত হেতু কহ্নেই মিশ্রকে বরখাস্ত করা হল না। তাদের ধারণা আমি এবং কহ্নেই এই দুইজন তাদের শত্রু।

প্রজাদের মধ্যে এই বাবদে তোলা হল চাঁদা। কুড়ি পঁচিশ জন প্রজা খরচের টাকা নিয়ে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে নালিশ করতে কটক গেল।

তাদের অভিযোগ হল দেওয়ান এবং মহালদার দুইজন কর্তৃক উৎপীড়ন হেতু প্রজারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘর দোর ছেড়ে পালিয়েছে। নানাপ্রকার মিথ্যা অত্যাচারের বিষয় বর্ণনা করে সাহেবের সমীপে দরখাস্ত দাখিল করায় খোদ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রেভেন্‌শ সাহেব মামলা তদন্ত করতে অকুস্থল নীলগিরি কিল্লায় এলেন। সাহেব মহোদয়ের সূক্ষ্ম তদন্ত হেতু দরখাস্তে লিখিত অত্যাচারের বিষয় মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হল। সাহেবের তদন্ত দ্বারা সিদ্ধান্ত হল পাথরের খনির খাজনা বৃদ্ধি বিদ্রোহের কারণ। বেআইনীভাবে লোকেদের সংঘবদ্ধ করায় কয়েকজন বিদ্রোহী সরদারের দুই তিন মাস করে জেল যাবার সাজা হল। মহালদার কহ্নেই মিশ্র কয়েকজন পাথুরিয়ার উপর অত্যাচার করার জন্য মহালদারি হতে বরখাস্ত হল। আমি প্রজাদের পরিচালনা করতে পারি নি, কহ্নেই মিশ্রর অত্যাচার দমন করতে পারি নি ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে সাহেব আমাকে তিরস্কার করলেন। রাজাসাহেব পূর্ব হতে আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। বর্তমান প্রজা বিদ্রোহের জন্য এক বছরের পাথর খনির খাজনা নষ্ট হয়ে গেল ইত্যাদি কারণে রাজাসাহেব আমার উপর ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁর স্বভাবজাত চক্ষুলজ্জার জন্য তিনি আমার সঙ্গে পূর্বের ন্যায় ব্যবহার করতেন কিন্তু তাঁর মনের ভাব কথার মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগল। আমি আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য নীলগিরি হতে চলে এলাম।

নীলগিরি রাজ্যে শিক্ষা বিস্তার, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি, যাতায়াতের জন্য পথ নির্মাণ প্রভৃতি জনসাধারণের কার্যে সবেমাত্র হাত দিয়েছিলাম। নীলগিরি গড় হতে জগন্নাথ সড়ক অবধি সরল ভাবে যে রাস্তা তৈরি আরম্ভ করেছিলাম, তার তিন মাইল অবধি ও মধ্যে একটি পাথরের সেতু মাত্র তৈরি হয়েছিল।

নীলগিরি নিজগড়ে একটি সংস্কৃত টোল বসেছিল। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে বালেশ্বরনিবাসী কপি, মটরসুঁটি প্রভৃতির চাষ জানত না। বিলাতি আলু গাছের ফল না মূল, তা কারও জানা ছিল না। নীলগিরি গড়ে একটি পুষ্পোদ্যান ও কপি প্রভৃতির চাষ আরম্ভ করিয়ে কৃতকার্য হয়েছিলাম। একটি তুঁতের বাগান করে রেশমের চাষ আরম্ভ করেছিলাম। আমার নীলগিরি ত্যাগের পূর্বে দুটি মাত্র রেশমের কাপড় বোনা হয়েছিল।

নীলগিরিতে চায়ের চাষ হতে পারে কিনা পরীক্ষা করার জন্য পুস্তক অনুসন্ধান করে এবং আসাম চা বাগান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কয়েকজন সাহেবকে

জিজ্ঞেস করে একটি পর্বতের উপত্যকায় বাগান আরম্ভ করেছিলাম। আমার নীলগিরি ত্যাগের সময় চা গাছের চারা আট দশ ইঞ্চি মাত্র উঁচু হয়েছিল। ফলতঃ কোন কার্যের সাফল্য দর্শন শেষ অবধি আমার অদৃষ্টে ঘটে নি। কেবল যে নারিকেল গাছ রোপণ করেছিলাম, সে সমস্ত গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল ফলছে শুনতে পাই।

কটক যাত্রা

নীলগিরি হতে চলে এসে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। গৃহে পরিবারের মধ্যে একজনও আমার সহায় কিম্বা সমব্যথী নেই। বরঞ্চ আমার দুঃখ দুর্দশা দেখে কেউ কেউ উৎফুল্ল। কেবল পনেরো বছরেরও বালিকা পত্নী সুখে দুঃখে সর্ব সময় ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে আছেন। মনের দুঃখে যাতে কাতর হয়ে না পড়ি সে দিকে সতত তাঁর দৃষ্টি। তিনি একদিন আমাকে বললেন, 'কেন এমন অস্থির হচ্ছ? আমার যত সোনার অলঙ্কার আছে সব বিক্রি করে দাও। স্বচ্ছন্দে দুই তিন বছরের খরচ চলে যাবে। এর পরে ভগবান কোনো প্রকার উপায় করে দেবেন বৈকি।'

অবশেষে চিন্তা করে দেখলাম, বালেশ্বরে কোনো প্রকার উপায় নেই। কটক চলে যাব বলে স্থির করলাম। সে সময় আমার পরম সহায় মহাত্মা জন বীমস্ সাহেব কটকে কলেক্টর ছিলেন। উক্ত মহাত্মা আমার জন্য কোনো উপায় করে দেবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কটক যেতে হলে পথ খরচা আবশ্যক। আমার স্ত্রী তাঁহার বাক্স ঝেড়ে ঝুড়ে চোদ্দটি টাকা, কয়েক আনা পয়সা ও একটি জয়পুরী মোহর বার করে দিলেন। মোহরটি বন্ধক স্বরূপ রেখে কিছু টাকা আনার জন্য একজন খুব নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়ের কাছে গেলাম। আত্মীয়টি ধনবান ও উপার্জনক্ষম। আমি সম্প্রতি নিঃস্ব এইকারণে আমার প্রতি তাঁহার স্নেহপ্রীতি কমে গেছে। সহজ বুদ্ধি দ্বারা অথবা বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু আমি তা বুঝতে পারি নি। আমি টাকার বিষয় উল্লেখ করা মাত্র তিনি তর্জন-গর্জন করে বললেন, 'আমার কাছে টাকা দেখে ছুটে এসেছেন।' মনে দুঃখ পাবে বলে স্ত্রীর কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না। নিকটস্থ প্রতিবেশী গভর্নমেণ্ট প্লিডার ভুঁইয়া আবদুস্ শোভন খাঁর কাছে মোহরটি বাঁধা রেখে কয়েকটি টাকা ধার করলাম। আশ্চর্যের বিষয় তিনবছর পরে আমার সেই অপমানকারী বন্ধু একটি গুরুতর ফৌজদারি মামলায় জড়িত হয়ে জেলে গেলেন। আসলে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন। এই ঘটনার সময় মদ্যপান করে এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের ঘরে বাস করার ফলে

তাঁর ভাগ্যে এই ভীষণ দুর্যোগ ঘটেছিল। তাঁকে জেল হতে উদ্ধার করার জন্য আমাকে দুইমাস পর্যন্ত প্রচণ্ড পরিশ্রম ও নিজের হাত থেকে প্রায় ছয়শত টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। দয়াময় প্রভু তাঁর পরলোকগত আত্মার সদ্গতি করুন।

কটকে যাব, সেখানে আমার সকলেই অপরিচিত। রায়বাহাদুর বাবু গৌরীশঙ্কর রায়, এবং নর্মাল স্কুল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে কেবল পত্রযোগে পরিচয়। রায় বাহাদুর বাবু সুদামচন্দ্র নায়ক সে সময় বালেশ্বরে ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায়বাহাদুর বাবু নারায়ণচন্দ্র নায়ক টাউনের সার্ভে কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর নামে একটি পরিচয়পত্র সুদাম বাবুর কাছ হতে লিখিয়ে নিয়ে কটক যেতে প্রস্তুত হলাম।

অর্ধরাত্রি, পৃথিবী অন্ধকারময়, আমার মন ও অন্তর সেইরূপ তিমিরাচ্ছন্ন। পরিবারের সকলেই গৃহে নিদ্রিত। কেবল আমার পত্নী জাগরিতা। পূর্বে আমার পদস্থ অবস্থায় বিদেশ যাত্রার সময় আমাকে বিদায় দেবার জন্য কতলোকে উপস্থিত থাকত। বর্তমানে তারা কোথায়?

"অবস্থা পূজ্যতে রাজন্
ন শরীরং শরীরিণাং।"

ঘর হতে বেরিয়ে পিছুপানে চেয়ে দেখলাম একটি বিষাদময়ী বালিকা মূর্তি অন্ধকারে দরজা ধরে জড় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও সহানুভূতিই বিপদগ্রস্ত ও নিরাশ হৃদয়সম্পন্ন মানবের সান্ত্বনা ও ধৈর্য লাভের প্রকৃষ্ট অবলম্বন। পূর্ব বন্দোবস্ত অনুসারে ডাকের পালকী দুয়ারে উপস্থিত ছিল। কটক যাত্রা করলাম। আমার প্রথম জামাতা বাবু রঘুনাথ প্রসাদ চৌধুরী সে সময়ে কটক কলেজে এফ. এ. পড়ছিলেন। চাঁদনীচকে তাঁর বাসা ছিল। আমি সেই বাসায় রইলাম।

কটকের নাবালক জমিদারি মহালের অডিটারের পদ শূন্য হল। মাসিক বেতন সত্তর টাকা। কলেক্টর মহাত্মা জন্ বীমস্ সাহেব আমাকে সেই পদে নিযুক্ত করার আদেশ করলেন। অনুসন্ধান দ্বারা বুঝলাম কটক জেলায় ছোট ছোট নাবালক জমিদারদের মহালগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত মহালে ঘুরেই মফঃস্বল তহশীলের আয়ব্যয় পরীক্ষা করতে হবে। একটি পাল্কীর জন্য আটজন বাহক এবং একজন রসুয়া চাকর রাখার নিতান্ত প্রয়োজন। তাদের

মাহিনা ও খোরাকির জন্য মাসিক ষাট টাকা আবশ্যক। এই কারণে সত্তর টাকা বেতনে চালানো একজন ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সাহেব মহোদয়কে এ বিষয় জানানোতে তিনিও আমার প্রস্তাবকে যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করলেন। মাসিক সত্তর টাকার স্থলে পঁচানব্বই টাকা স্থির করার জন্য বোর্ডকে রিপোর্ট করলেন। আদেশের অপেক্ষায় আমাকে বসে থাকতে হল।

ডোমপাড়ার দেওয়ানী (১)

কটকে অবস্থান কালে বাবু নারায়ণচন্দ্র নায়ক আমার প্রধান বন্ধু, সহায় ও পরামর্শদাতা ছিলেন। কাছারি ফেরৎ তিনি আমার কাছে আসতেন নয়ত আমি তাঁর কাছে যেতাম। দুইজন একত্র রাত্রি দশটা অবধি বেড়িয়ে বেড়াতাম। ছোট বড় অনেক বাবুর গৃহে বৈঠক বসত। সতরঞ্চ খেলা, মদ্যপান ও ভোজন হত। সে সময় কি বাঙালী কি ওড়িয়া সকল সভ্য বাবুরা সুরা সেবন করতেন। কটকে সর্বপ্রথম প্রধান উকিল ছিলেন পরশুরাম লালা, আর শ্রীরাম বোস ও ঈশানচন্দ্র বাঁড়ুয্যে। প্রথম দুই বংশ বিলুপ্ত, ঈশানবাবুর পুত্র কালীপদ বাঁড়ুয্যে একজন শিক্ষিত, উৎসাহী ও আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। সন্ধ্যার পরে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে অনেক বাবু সম্মিলিত হতেন আমি ও নারায়ণবাবুও সেখানে উপস্থিত হতাম। রাত্রি দশটা অবধি তাস, পাশা খেলা গল্প পানাহার ও আমোদ প্রমোদে কাটত, নারায়ণবাবু সঙ্গে থাকায় সময়টা বেশ আমোদ প্রমোদে কাটত। এধারে বোর্ডের হুকুমের পথ চেয়ে বসে আছি। আজ কাল করে প্রায় দেড় মাস কাল অতিবাহিত হল। হাতে যে কটি টাকা ছিল ফুরিয়ে গেল। একদিন সকালে রাঁধুনে বামুন' বলল, বাসায় রাত্রের জন্য রান্নার সরঞ্জাম কিছু নেই। কি করি কোন উপায় দেখছি না। আমার যাই হোক, বাসায় ছেলেটি যে উপবাসে থাকবে। বাসায় মন টিকল না, বেলা চারটার পরে কালেক্টরী কাছারির পূর্ব দিকে কাঠজুড়ি কূলের পাথরের বাঁধের উপর চুপ করে বসে উদাসভাবে নদীর দিকে চেয়ে বসে আছি। পেছন থেকে একজন বাবু ডাকলেন, 'ওহে ফকীরমোহন এখানে একলা বসে কি করছ?' পিছু ফিরে দেখলাম নর্মাল স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তী। দ্বারীবাবুকে আমি খুড়োর মতো সম্মান করতাম। তিনিও আমাকে পুত্রসম স্নেহ করতেন। দ্বারীবাবু বললেন, 'এস ফকীরমোহন আজ তোমার হিসাব নিকাশ করা যাবে।' সম্প্রতি আমার মনে দারুণ ভাবনা ঢুকেছে, হিসাব পত্রের কথা কি আর ভাল

লাগে ? আমি বললাম, 'আজকে আমাকে ক্ষমা করুন, আজ আপনার বাসায় যেতে পারলাম না।' দ্বারীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ আসতে হবে. নিশ্চয়ই আসতে হবে।' আমি হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। কিন্তু দ্বারীবাবু আমার বাহু শক্ত করে ধরে তাঁর বাসা নর্মাল স্কুলে টেনে নিয়ে গেলেন। স্কুলের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসলাম। দ্বারীবাবু ঘরের ভিতর থেকে আটাশ টাকা কত আনা (ঠিক মনে নেই) আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমার কাছে তোমার আটচল্লিশ টাকা পাওনা ছিল, তুমি একটা বন্দুক নিয়েছিলে তার দাম কুড়ি টাকা কেটে নিলাম। বাকি আটাশ টাকা কত আনা নাও।' চারবছর আগে দ্বারীবাবু আমার কাছ থেকে কয়েকখানা ভারতবর্ষের ইতিহাস কিনেছিলেন। সেই বাবদে আটচল্লিশ টাকা যে তাঁর কাছে পাওনা বাকি ছিল সে কথা আমার মনে ছিল না। টাকা কটা আমার হাতে পড়ায় বেশ আমোদ প্রমোদে দিন কাটতে লাগল। উপস্থিত অবস্থার উপর দৃষ্টি রেখে খরচ করলে কিছু অধিকদিন চলত। কিন্তু আমি চিরকাল অপরিণামদর্শী, অর্থ ব্যবহার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন আমার ললাটে লেখা নেই। নিতান্ত অর্থাভাব উপস্থিত, সম্প্রতি অনেক ধনবান লোকের সঙ্গে আন্তরিকতা আছে, ধার চাইলে পেতে পারি কিন্তু ধার চাইতে ইচ্ছা হল না। অভাবের কথা বন্ধু নারায়ণবাবুকেও বললাম না, মনে ভাবলাম তিনি আমার অভাবের কথা শুনলে নিশ্চয় জোর করে কিছু টাকা আমার হাতে গুঁজে দেবেন কিন্তু পরিশোধ করার কোনো পথ নেই। নারায়ণবাবুর হাতেও যথেষ্ট টাকা ছিল না। চিরকাল তাঁর মনটা উঁচু। চাল চলন বড়লোকি, খরচ পত্র নবাবী ধরনের। সদাই আমোদে মত্ত। তাঁর একটি সুন্দর পেগু টাট্টু ছিল, আমারও একটা কাঠিয়াওয়াড়ি ঘোড়া ছিল। পরে অর্থাগম হওয়ায় আমি ঘোড়াটিকে বালেশ্বর হতে কটকে আনিয়ে ছিলাম। দুইজন ঘোড়ায় প্রতিদিন সকাল বিকেল ভ্রমণ করতাম। মোদ্দা কথা তিনি আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমাদের দুই বন্ধুর ও কবিবর রাধানাথবাবুর উন্নতির মূলে ছিলেন মহাত্মা জন বীমস্ সাহেব। একমাত্র ভরসা ও অবলম্বন কলেক্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। দেখা হওয়া মাত্র সাহেব মহোদয় বললেন, 'আমি সেই কথাই ভাবছি, আপনি কাঁহাতক বোর্ডের চিঠির অপেক্ষায় অনর্থক চেয়ে বসে থাকবেন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ হুজুর, অনর্থক বসে থাকা আমি কষ্টকর বোধ করছি।' সাহেব বললেন, ঠিক সত্য কথা, সব ব্যায়াম অপেক্ষা নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা হচ্ছে অত্যন্ত কষ্টকর।' আমাকে এই কথা বলে কয়েক মিনিট স্থির ভাবে উপর পানে চেয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা আপাততঃ আপনাকে ডোমপাড়া[১] রাজ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করি, আপনি কি যেতে সম্মত হবেন?' মনে মনে হাসলাম, আমার আবার সম্মতি, প্রার্থনার পূর্বেই বর প্রাপ্তি। পাগলা ভাত খাবি? না হাত ধোব কোথায়? তৎক্ষণাৎ বললাম, 'হ্যাঁ হুজুর, যেখানেই পাঠাবেন যেতে সম্মত আছি।' সাহেব বললেন, 'তবে যান, আপাততঃ সেখানে তিন মাস চুপচাপ বসবেন। কিছু কাজ করবেন না—করতে পারবেনও না। পাঁচ বছর ধরে রাজা ও প্রজার মধ্যে ভয়ানক গোলমাল চলছে। নানাপ্রকার মামলা মকদ্দমার খবর আসছে। আপনি দৃষ্টি রাখবেন যেন গোলযোগ বেশি না বাড়ে। আপাততঃ আপনার এই অবধি করণীয়। গভর্নমেণ্ট থেকে হুমকি দিয়ে চিঠি এসেছে। যে করেই হোক এই বছরের মধ্যে গোলযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে। আর—একটা কথা রাজাটা পাগলা, কে জানে আপনাকে হায়রান করবে। কাল চিঠি লিখে কাছারি হতে তিন মাসের অগ্রিম বেতন আনিয়ে দেব। সেই টাকা পেলে ডোমপাড়া রওয়ানা হবেন। জগমোহনবাবুকে বলে দেব, সে রাজার কাছ হতে শীঘ্র অর্থ আনিয়ে আপনাকে দেবে।' সে সময় বাবু জগমোহন রায় কটক জেলার প্রধান ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। ডোমপাড়া রাজ্য সম্পর্কে ভবিষ্যত প্রসঙ্গ বর্ণনার সুবিধার জন্য উল্লিখিত গোলমালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থানে প্রকাশ করা উচিত মনে করি।

ডোমপাড়ার পূর্বরাজা পুরুষোত্তম মানসিংহ ভ্রমরবর রায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক যাত্রা করায় তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা রঘুনাথ মানসিংহ ভ্রমরবর রায়কে রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলে মহামান্য গভর্নমেণ্ট ঠিক করলেন। সে সময় প্রকৃত রাজা নিতান্ত নাবালক ছিলেন। তাঁর একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিল। গভর্নমেণ্ট এই দুইটি বালককে শিক্ষিত করাতে কলকাতা

১ ডোমপাড়া (ওড়িয়াতে ডোমপড়া) কটক জেলার সামিল একটি জমিদারি। এটি দেশীয় রাজ্য নয়। বোধহয় পূর্বে গড়জাত ছিল। পরে ইংরেজরা খাস করে নেয়। এ রকম আরো কয়েকটি রাজ্য ছিল যা আসলে জমিদারি, কিন্তু গড়জাতের মতো সামন্তশাসিত।

নিয়ে গেলেন। সে সময় নাবালক রাজপুত্রদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় একটি স্কুল নির্দিষ্ট ছিল। সুবিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই স্কুলের তত্ত্বাবধান করতেন।

রাজাসাহেব সাবালক হয়ে রাজ্যের ভার নিলেন। রাজ্যের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করলেন। কোর্ট অফ ওয়ার্ডের সময় ম্যানেজার কম খাজনায় জমির বন্দোবস্ত করে গিয়েছেন এবং অনেক বছরের আবাদি জমি বিনা খাজনায় প্রজারা ভোগ করে আসছে। রাজাসাহেবের ইচ্ছা সমস্ত রাজ্যের জমি জরিপ করে চৌহদ্দি অনুযায়ী কর ধার্য করা। কিন্তু প্রজাদের অভিপ্রায় সাবেক খাজনার হার হতে এক পয়সাও বেশি না দেওয়া। এই সূত্র ধরে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হল। সমস্ত প্রজা একজোট হয়ে বিদ্রোহের উপক্রম করল। রাজার পূর্বতন দেওয়ান নিধি পট্টনায়ক বিদ্রোহীদের নেতা হল। পট্টনায়ক অত্যন্ত সাদাসিধে লোক ছিলেন। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে রামচন্দ্রের দূতের বংশধর বিশেষ। বিদ্রোহী দলের দরবার হতে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হল রাজাকে কেউ খাজনা দেবে না। রাজভবনে কেউ যাবে না বা রাজার কাছে কেউ কোনো রকম চাকরি করবে না, ধোপা নাপিত বন্ধ। শান্ত শিষ্ট প্রজারা বিদ্রোহে যোগ না দেওয়ায় বিদ্রোহীদের সর্দার তাদের ঘরের সর্বস্ব লুঠতরাজ করে নিয়ে তাদের নির্দয়রূপে প্রহার করতে লাগল। চাকরেরা রাজবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। রাজপরিবারের ময়লা কাপড় সব কটকে কাচা হতে লাগল। রাজার প্রাসাদ হতে কটক শহরের দূরত্ব প্রায় মাইল কুড়ি। রাজ্যের নানা প্রকার ফৌজদারি মামলা উভয় পক্ষ হতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট দায়ের হতে লাগল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাজাসাহেবকে উপদেশ দিলেন, 'আপনি আপাততঃ কোনো প্রকারে প্রজাদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করুন। প্রজারা যে হারে খাজনা দিতে রাজি হচ্ছে তাতেই সম্মত হয়ে যান।' রাজাসাহেব তাতে সম্মত না হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চটে গেলেন। রাজা এবং কলেক্টর সাহেবের মধ্যে এ ধরনের প্রত্যয়ের অভাব হওয়াতে প্রজাদের সাহস বেড়ে গেল। ইত্যবসরে দেওয়ান নিধি পট্টনায়ক বারংবার কলেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে সাহেবকে বোঝাতে লাগলেন যে রাজা সাহেবের মাথা খারাপ ও তিনি অত্যাচারী। রাজা-সাহেবের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে পড়ল। খাজনা এক পয়সাও আদায় উসুল হচ্ছে না। এধারে রাজার অত্যন্ত ভয়ের উদ্রেক হয়েছিল। তাঁর ধারণা

হল কলেক্টর সাহেবের পক্ষে কোনো মামলার সূত্র ধরে, তাঁকে জেলে দেবার মামলা অবধি ফাঁদা কিছু অসম্ভব নয়। রাজাসাহেব কলকাতা ও কটক এই দুই জায়গায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। নিজের খরচ ও মামলার খরচের জন্য তাঁর কর্জ ক্রমে বাড়ছিল। এধারে রাজবাড়ির ভিতরের অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। রাজভবনে আবদ্ধ রাজমাতা ও রাজভ্রাতা বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে অন্ন বস্ত্রাভাবের কষ্ট অসহ্য হওয়াতে খোরাক পোশাকের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করলেন। কলেক্টর সাহেব বললেন, 'তাই তো, রাজার কেবল যে মাথা খারাপ তা নয়, তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুর।' পরিচারক ও সর্বসাধারণের বিশ্বাস-ঘাতকতা, মাতা ও ভ্রাতার অভিযোগ উপরন্তু রাজাসাহেবের দেনা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমশঃ তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। জগত সংসারের প্রতি অবিশ্বাস। কেউ যদি ভাতে বিষ মিশিয়ে তাঁকে মেরে ফেলে এই ভয়ে অন্নাহার ত্যাগ করে খই আর দুধ খেয়ে জীবন রক্ষা করছিলেন। কটকে আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় দেখলাম শরীর তাঁর অস্থিচর্মসার, নিরন্তর দুর্ভাবনা হেতু দেহ ও মন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। কটকের চাঁদনীচকে তাঁর বাড়ির দোতলার উপর বৈঠকখানায় আমরা দুজন মুখোমুখি চেয়ারে বসে। মাঝখানে ব্যবধান একটি বড় টেবিল। রাজাসাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছেন। আমার প্রতি তাঁর পরবর্তী ব্যবহার হতে তাঁর মনের কথা জানতে পেরেছিলাম। সেই সময় তিনি মনে ভাবতেন, এ আবার একটি আপদ কোত্থেকে এসে জুটলো। লোকটা নিশ্চয় কলেক্টর সাহেবের গুপ্তচর। নিশ্চয় আমাকে ধরিয়ে দিতে এসেছে। এ ধারে রাজাসাহেবের শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হল। মনে মনে ভাবলাম এই বিপদগ্রস্ত রাজার কোনো উপকারে যদি আসতে পারি তবে আমার আগমন সফল হবে। রাজাসাহেব আমার তিন মাসের বেতন অগ্রিম দাখিল করে দিলেন। আমি জগমোহন বাবুর কাছ থেকে টাকা গুনে নিলাম। রাজাসাহেবের কনিষ্ঠ, রাজবাড়ির ছোট কর্তা আমাকে গড়ে পৌঁছে দিতে বেরুলেন। সময় জুলাই বা অগস্ট মাস, কাঠজুড়িতে জল বেড়ে ভরে গেছে। আমরা দুজন পাল্কীতে বসে গড়ের অভিমুখে রওনা হলাম। সন্ধ্যার সময় গড়ে উপস্থিত হলাম। রাজার প্রাসাদ কই? চতুর্দিকে আগাছা পূর্ণ জঙ্গলের মধ্যে একরাশ ভাঙাচোরা কোঠা বাড়ি এবং ভগ্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি মাটির ঘর।

প্রতিদিন সকালে রাজভবন হতে উপযুক্ত সিধে আসত। বাসা বাড়ির সম্মুখে একটি বৃহৎ আমগাছের তলায় মাছিয়া[১] একটা পেতে চুপ করে বসে থাকি। নিধি পট্টনায়ক প্রভৃতি পুরাতন আমলা এবং গ্রামের মোড়লদের (সম্প্রতি বিদ্রোহীদের সর্দার) ডাকিয়ে অবস্থার খবর নিতাম। গড়ে আমার উপস্থিতির দিন হতে রাজ্যের মধ্যে তত উৎপাত ছিল না। আমি সরকারের তরফ হতে প্রেরিত বলে সর্দাররা কিঞ্চিৎ শান্তভাবে অবস্থান করছিল।

পাঁচ বছর হোল রাজ্য থেকে খাজনা আদায় হয় নি। খাজনার জন্য তলব করলাম, মোড়লরা কেবল একবছরের খাজনা দিতে রাজি হল। আর আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, 'আচ্ছা দেওয়ানবাবু তোমার একটি দুধেলা গাই আছে তাকে পাঁচদিন দোয়ানো হয় নি তারপর একদিন দুইতে যাবেন একদিনে পাঁচদিনের দুধ পাবেন কি ?' বিভিন্ন সময় যখন যে মোড়লকে যে কোনো কথা জিজ্ঞেস করি সকলের সেই একই উত্তর।

আমার কার্যক্ষেত্র সম্প্রতি সঙ্কটসঙ্কুল, কোনো কাজে হাত দিতে ভরসা পাচ্ছি না। রাজা প্রজা দুপক্ষই আমাকে অবিশ্বাস করছে। এধারে কোনো কাজ না করে রাজ্য পাহারা দেওয়ার জন্য কলেক্টর সাহেবের আদেশ। সময় সময় কটক গিয়ে রাজা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। অনেক বিষয় প্রস্তাব করি, আদেশ ভিক্ষা করি। কেবল হাঁ-না এই দুই শব্দের মধ্যে একটি কথা শুনি। তাও সহজলভ্য নয়। রাজাসাহেব অনেক ভেবেচিন্তে এক একটি কথার উত্তর দেন। আসলে প্রত্যেক বিষয় আমার প্রতি অবিশ্বাস।

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে সাহেব মহোদয় কটক হতে ডোমপাড়া সফরে বেরুলেন। প্রথম ছাউনি পড়ল কটকের সীমান্ত বাআঁরা মৌজায়। সাহেবের পশ্চাতে ছিল কুড়িজন কনস্টেবলের সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট স্নপারিন্টেনডেন্ট সাহেব, একজন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পেস্কার, মুন্‌সি, আমলা চাপরাশি প্রভৃতি প্রায় শতাধিক লোক। আগে থেকে আমি পরওয়ানা পেয়ে সমস্ত বিষয় ঠিক করে রেখেছিলাম। ডোমপাড়ায় কিছু কিনতে পাওয়া যেত না। সরকার পক্ষে কোনো প্রকার দ্রব্যের কিছুমাত্র অভাব না ঘটে সেদিকে আমার দৃষ্টি রাখা এখন কর্তব্য বলে মনে করলাম। রাজাসাহেবও বা-আঁরা গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কোনো কথায় কান দিতেন না বা কিছু বুঝতেন না। যেন একাজ তাঁর নয় বা তাঁর

১ বাঁশ দড়ির চার পায়া বসার বস্তু। সাধারণতঃ মাছধরার সময় বসা হয়।

কোনো কর্তব্য নেই, সব আমার। সাহেবের কুকুরগুলি হতে সেরেস্তা অবধি সকলের জন্য রান্নার ব্যবস্থা বোঝা-শোনা আমাকে করতে হবে। এধারে আসল কথা হচ্ছে মামলার চিন্তা। দিবানিশি কাজে ব্যস্ত থাকি, সহায় কেউ নেই। হাকিমের গতিবিধি দেখে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হল। গভর্নমেন্টের সবিশেষ তাগিদ হল যে কোনো উপায়ে ডোমপাড়া রাজ্যের গোলমাল নিষ্পত্তি করতে হবে। বর্তমানে সঙ্কট সমস্যা উপস্থিত। হয় রাজ্য রাজার হাতে থাকবে, নচেৎ রাজার অযোগ্যতা উপলক্ষ্য করে সরকারের খাস দখলে চলে যাবে। খুব সম্ভব সরকারের হয়ে যাবে। কারণ রাজাসাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কথা না শুনলে তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট হওয়া একেবারে ধ্রুব নিশ্চিত। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রাজার পক্ষে কোনো লোক উপস্থিত নেই। এধারে আমার প্রতি তাঁর ঘোর সন্দেহ। রাজাসাহেব দারুভূতো মুরারির ন্যায় একটি প্রজার ক্ষুদ্র খোলার ঘরে চুপ করে বসে থাকতেন। আমি রাজাসাহেবকে নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালাম। বিনয়ের সঙ্গে করজোড়ে প্রার্থনা করলাম ভয় দেখালাম, শেষে অসহ্য হওয়ায় তিরস্কার করলাম। তবুও সেই এক কথা খাজনা বৃদ্ধির বন্দোবস্ত নিশ্চয় হওয়া চাই। আমি স্পষ্ট করে বললাম, 'আপনি মত পরিবর্তন না করলে রাজ্য ইংরেজ সরকারের হয়ে যাবে।' রাজা অবিচলিত কণ্ঠে দৃঢ়রূপে উত্তর দিলেন, 'যাক, খাস হয়ে যাক।' রাজার কথাগুলি ছিল নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। নিতান্ত অল্প। রাজা তিনটি শব্দ উচ্চারণ করে যেরূপ দৃঢ়-ভাবে আমার দিকে চাইলেন আমি বুঝতে পারলাম তাঁর মনের ভাব যে রাজ্যে আমার কথার মূল্য নেই এবং প্রজাদের জন্য আমি লোকচক্ষুতে পরাজিত। এমন রাজ্যে আমার প্রয়োজনটা কি? দুইজন দুইজনের মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মিনিট ধরে চেয়ে বসে থাকি। মুহূর্তের জন্য রাজাকে প্রশংসা করলাম, ক্ষত্রিয় বটে। পর মুহূর্তে বিরক্তি জন্মাল। মনে ভাবলাম এটা একটা অনর্থক সাহস প্রদর্শন। এরপর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজাকে অনুরোধ করলাম। রাজা কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'না।' আমি 'না' শব্দের অর্থ বেশ বুঝলাম। মামলা চলছে আমার ন্যায্য প্রাপ্য পাবার জন্য, খোসামোদ করতে যাব কেন?

পৌষ মাসের দিন সাহেবরা বাআঁরা মৌজায় পৌঁছানোর সময় হতে অসময়ের বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় বাদল অবিরাম চলতে লাগল। সকলে যে যার জায়গায় বসে। আমি একা জল কাদা ঘেঁটে দিন রাত ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছি।

অপরাহ্ণ সময় কলেক্টর সাহেবের ডেরায় গিয়ে সাক্ষাৎ করলাম। অন্যান্য প্রসঙ্গের পরে ডোমপাড়া বিদ্রোহের কথা উঠল। সে সময় সাহেব মহোদয়কে যা জানালাম তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। "আমি আজ প্রায় চার মাস ধরে ডোমপাড়া গড়ে থেকে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছি। কুড়ি বছর পূর্বে রাজ্যের বন্দোবস্ত হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক পতিত জমি আবাদ হয়ে গেছে। পূর্বে খুব কমহারে খাজনা ধরা হয়েছিল। রাজার ইচ্ছা নূতন বন্দোবস্ত করা হোক। জমির খাজনা আইন অনুসারে—চৌহদ্দি নির্দেশ হওয়া উচিত অর্থাৎ গড়জাত তিগিরিয়া, খাসমহাল বাঙ্কি, খোরদা এবং মোগলবন্দি নরাজ প্রভৃতির সীমা অনুসারে খাজনা ধার্য হওয়া উচিত। তবে রাজাসাহেব একসঙ্গে পুরাপুরি খাজনা ধার্য করতে ইচ্ছে করেন না। তিন বিঘায় কেবল দুই পয়সা অধিক কর ধার্য করবেন। হুজুরের হুকুম অনুযায়ী রাজা সাহেব বন্দোবস্তের কার্য আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু মোড়লরা জমি জরিপ করতে দিল না। সম্প্রতি যে গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে তা বস্তুত রাজা ও প্রজার মধ্যে বিবাদ নয়, কেবল মোড়ল ও পুরাতন আমলারা গোলযোগ উপস্থিত করেছে। হাল আবাদি জমির প্রজারা আসলে নিষ্করভাবে ভোগ করছে না, প্রধান ও আমলারা তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে আত্মসাৎ করেছে। উপস্থিত গোলমালের জন্য রাজা ও প্রজা দুই পক্ষেরই নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়েছে। আমি দেখলাম রাজাসাহেব নিতান্ত সদাশয়, অতি নির্বিরোধী ও শিক্ষিত ব্যক্তি। আজ পাঁচবছর হল প্রজারা খাজনা দিচ্ছে না। রাজা সাহেব কর্জ করে খাজনা[১] দাখিল করেছেন। রাজাসাহেবের এতটা অর্থাভাব যে কেবল রাজকর দেওয়া নয়, রাজমাতা, রাজভ্রাতা ও মহালের দাস দাসীদের অন্নবস্ত্রের অভাবে দারুন কষ্ট উপস্থিত হয়েছে। সম্প্রতি হুজুর কেবল তিনবিঘায় দুই পয়সা মাত্র বৃদ্ধি খাজনা বন্দোবস্ত করতে হুকুম দিলে সহজে সমস্ত গোলযোগ নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, প্রজারাও সহজেই জমির বন্দোবস্ত করতে দেবে।"

সাহেব মহোদয় স্থিরভাবে বসে আমার সমস্ত কথা মনোযোগপূর্বক শুনলেন। শেষে বললেন, 'বাবু, বন্দোবস্ত সম্পর্কে যে কথাগুলি বললেন সে

১ গভর্নমেন্টের রেভিনিউ।

সমস্ত খাঁটি কথা। যে কোনো উপায়ে হোক এবছরই জমির খাজনা নির্ধারণ করা হবে। মোদ্দা কথা খাজনা বৃদ্ধি হবে না। আমরা প্রজাদের জানিয়ে দিয়েছি খাজনা বৃদ্ধি হবে না।'

মহাত্মা জন বীমস্ সাহেব একজন অসাধারণ বিদ্বান প্রজাহিতৈষী ও উৎকলের উন্নতিকামী ও গরীবের মা বাপ ছিলেন। অবশ্য তাঁর একটি দোষ ছিল—ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক, যা একবার হুকুম দেবেন তার কোন প্রকার অন্যথা হবে না। আমি আর অধিক কোনো কথা না বলে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। রাত্রে পুনর্বার রাজাসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাহেবের অভিপ্রায় জানালাম। রাজাসাহেব বললেন, 'দেওয়ান বাবু, আমি যা বলেছি তা হতে অন্যথা হবে না। আপনি দুই পয়সা বৃদ্ধিতে রাজ্যের বন্দোবস্ত করে দিন। মফঃস্বলে আমাদের পাঁচ বছরের খাজনা বাকি পড়ে আছে! সমস্ত উসুল করে নিন, তা হতে আমরা এক পয়সাও নেব না।'

সে সময় রাজার দুরবস্থা দেখে আমার অন্তরে বেদনা হল। নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি ভগ্ন গৃহের একটি কোণে রাজা নীরব হয়ে বসে আছেন। একটি মাটির পিদিমে একটি সলতে মিট মিট করে জ্বলছে। রাজার সঙ্গে দুটি মাত্র পরিচারক। হায় হায় রাজ্যটা কি খাস হয়ে যাবে। রাজাসাহেব কি বিপদ হতে উদ্ধার পাবেন না? বাআঁরা গ্রামের দক্ষিণ দিকে গ্রামের লাগোয়া কটক বক্সি সড়ক। সড়কের দক্ষিণে স্থিত একটি মহাদেবের মন্দির। মন্দিরটি ছিল একটি ছোট চালাঘর। মন্দিরের ভিতর সাপ আছে শুনেছিলাম। কটক যাতায়াতের সময়ে সেই গ্রামে কতবার থাকতে হয়েছে। সাপের ভয়ে রাত্রে মন্দির পানে যেতাম না। আর কোনো লোকও রাত্রে সে মন্দিরে থাকত না। অন্যত্র স্থানাভাবে আজ সেই মন্দির আমার আশ্রয়স্থল। দিন মানের সমস্ত কাজ সমস্ত করে মন্দিরের সামনে মণ্ডপ ঘরে শিবের বাহন পাষাণময় বৃষভের কাছ ঘেঁষে শুয়ে পড়লাম। আজ সাপের ভয় মন হতে একেবারে চলে গেছে। সারা রাত বাইরে ঝড় বাদল। এধারে মনের মধ্যে প্রবল চিন্তার ঝড়! এ অবস্থায় কি ঘুম আসে! বিছানায় পড়ে উপায় চিন্তা করছি। উপায়ের একটি ক্ষীণ বিদ্যুৎ রেখা মনের মধ্যে খেলে গেল।

রাজ্যের সকল মৌজার প্রধানদের নামে সরকারের তরফ হতে পরওয়ানা জারি হয়ে গেছে। আজ বিকালে চারটার সময় সমস্ত প্রধান ও প্রজা কাছারিতে

উপস্থিত হবে। আজ পাঁচবছরের গোলোযোগ শেষ হয়ে যাবে এবং রাজা সাহেবের ভাগ্য পরীক্ষা হবে।

বাআঁরা গ্রামের নিকটবর্তী ভগীপুর ও শঅলবাঙ্ক এই কয়েকটা মৌজার প্রজারা রাজার স্বপক্ষে ছিল। ভোর হওয়া মাত্র সেই সমস্ত মৌজায় পেয়াদা পাঠিয়ে প্রধান ও মাতব্বর প্রজাদের ডেকে আনলাম। বহু আশ্বাস বাক্যে কোমল-ভাবে তাদের বললাম 'তোমরা চিরকাল রাজভক্ত। রাজাসাহেব তোমাদের বহু প্রশংসা করেন। তোমরা রাজাসাহেবের হয়ে আজ কাছারিতে হাকিমকে যদি এক টুকরো কথা বল তবে রাজাসাহেব তোমাদের কথা চিরদিন মনে রাখবেন আর প্রতি জনকে ৩০ বিঘা করে ভাল জমি জায়গীর দেবেন। সেজন্য তোমাদের একপয়সাও খাজনা দিতে হবে না।

সকল প্রজা এক সঙ্গে হৈ চৈ করে বলে উঠল, 'বলুন বলুন দেওয়ানবাবু, আপনি যা বলবেন আমরা তাই করব।'

আমি বললাম কাছারির সময় হাকিমকে তোমরা এই কথা মাত্র বলবে—'হুজুর আমাদের রাজা প্রজার মধ্যে যা গণ্ডগোল চলছে এর মীমাংসার জন্য হুজুর যে দেওয়ানকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই আমরা মধ্যস্থ করলাম। হুজুর হুকুম করুন তিনি সমস্ত গোলমাল রফা করে দেবেন।' ছেলেদের পাঠ শেখাবার মতো পাখিপড়া করে সারা বেলাটা ধরে সমস্ত প্রজাদের এই কটা কথা শেখালাম। প্রতি জন দুই তিনবার করে পাঠ বলে গেল। তারা সাহেবকে কিরূপে সেলাম করবে, কি ভাবে সারবন্দি হয়ে দাঁড়াবে, প্যারেড শেখাবার মতো তা অবধি শিখিয়ে দিলাম। আমার অভিপ্রায়, এরা ঠাসাঠেসি করে সারবন্দি হয়ে দাঁড়ালে অন্য প্রজারা এগিয়ে এসে কথা বলার সুযোগ পাবে না। আজ সারাদিন বৃষ্টি ও বাতাসের বিরাম নেই। নিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে চারিদিক সাঁঝের মতো ছেয়ে গেছে।

আবার বিকেল বেলা প্রায় চারটার সময় বৃষ্টি একটু থেমেছে, তবুও ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে প্রবলভাবে ঝড় বইছে। হাকিমের ডেরার নিকট কাছারির ডেরায় আমি, রাজাসাহেব, কাছারির তিন চারজন আমলা ও চাপরাশি উপস্থিত। আমি সাহেবের ডেরার ভিতরে গিয়ে জানালাম, 'প্রজারা আমাকে মেনে নিয়েছে। তাদের ইচ্ছা, হুজুর মঞ্জুর করলে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যে বিবাদ চলছে তা বুঝে সুঝে নিষ্পত্তি করে দেব।' সাহেব আমার কথা শুনে বেজায়

খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ কথা বাবু বেশ কথা আপনি এ কাজটি উদ্ধার করে দিলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব। তুবছর হল বারংবার সেই একই কথা শুনে শুনে বিরক্তি ধরে গেছে!'

বেলা প্রায় চারটা পেরিয়ে গেল, হাকিমের ডেরার সামনে একজন চাপরাশি যুবক চড়াগলায় বার বার হাঁকতে লাগল, 'ডোমপড়াকা প্রধান লোক প্রজালোক হাজির হ্যায় ডোমপড়াকা প্রধান লোক, প্রজালোক হাজির হ্যায়।' আম্রকুঞ্জের তলা থেকে, গ্রামের লোকের ছাঁচতলা থেকে, বারাণ্ডা হতে, ঘরের ভেতর হতে দলে দলে লোক বেরিয়ে এল। একদল পৌঁছাতে পারে নি। উঠি পড়ি করে ছুটে আসছে। সাহেবের ডেরার সামনে সারি সারি দাঁড়িয়ে গেল। লোক সংখ্যায় প্রায় তুহাজার হবে। আমি ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার লোকেরা কই। সারা সকাল ধরে যাদের বুঝিয়ে শুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে রেখে ছিলাম, তারা কই? আমার পক্ষে এখন দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকারময়। হৃদয় অভ্যন্তর সেইরূপ তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কোনো উপায় ঠিক করতে পারছি না। সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলে জবাব কি দেব? ডোমপাড়া রাজবংশ রক্ষার আর কোনো উপায় নাই। উপস্থিত সম্পর্ক ধরতে গেলে যদিও আমি রাজার দেওয়ান বই তো নয়। যদিও রাজাসাহেব আমাকে হাকিমের গোয়েন্দা ভেবে নিতান্ত অবিশ্বাসের চোখে দেখছেন। তা সত্বেও রাজাসাহেবের এবং রাজবংশের তুর্দশা দেখে আমার মনের ভিতর দারুণ কষ্ট অনুভব হচ্ছিল। এদের উপকার সাধন নিমিত্তে মন প্রাণ সমর্পণ করেছি।

রাজাসাহেব স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে আমাকে অনেকবার বলেছেন বেশি খাজনার বন্দোবস্ত করিয়ে দেবার পরিবর্তে তিনি মফঃস্বলের বকেয়া খাজনা সব উসুল করে আমাকে নিয়ে নেবার অধিকার দেবেন। কিন্তু আমি সে কথায় অবজ্ঞা ভরে কর্ণপাত করি নি। রাজাসাহেবের উপকার করা আমার একমাত্র লক্ষ্য।

হাকিম সাহেব মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বিলিতি কম্বল জড়িয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সাহেবের কেবল চোখ তুটি আর মুখ দেখা যাচ্ছিল। সাহেবের সামনে আমি আর পেস্কার একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। হাকিম হিন্দী ভাষায় বললেন, 'উয়েল প্রজারা, তোমরা বলছ রাজার সঙ্গে তোমাদের যে বিবাদ চলছে, দেওয়ান বাবু ফকীরমোহন মধ্যস্থ হয়ে সেই গোলমাল নিষ্পত্তি করে দেবেন।' চার পাঁচজন প্রধান নেতা চিৎকার

করে বললেন, 'দেওয়ান বাবু যদি গণ্ডগোল নিষ্পত্তি করে দেবেন, আপনি তবে কি জন্য এ হেন ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে কটক থেকে ছুটে এসেছেন?' সাহেব তাদের কথা বুঝতে না পেরে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কি বলছে?' আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, 'এরা বলতে চায় দেওয়ান বাবু আমাদের মামলা নিকাস করে দেবেন, আপনি এ ঝড় বৃষ্টিতে কটক থেকে এসে কষ্ট করছেন কেন?'

সাহেব বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা দেওয়ান বাবু সব ব্যাপার নিষ্পত্তি করে দেবেন। তিনি একজন যোগ্য লোক। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি সেলাম সেলাম প্রজারা, বিদায় বিদায়।' এইটুকু বলে শীঘ্র ডেরার ভিতর ঢুকে পর্দা টেনে দিলেন। প্রধানরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন। এ আবার কি হল? হাকিমটা কি বুঝল? আমলারা আমার বন্ধু, চাপরাশিরা আমার অনুগত। তৎক্ষণাৎ তাঁবুর কাছ থেকে প্রজাদের তাড়িয়ে দিলেন।

সেদিনের কথা মনে পড়লে অত্যন্ত কষ্ট হয়। আমার উপর সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আমি প্রজাদের কথা তাঁকে অন্যরূপে বুঝিয়ে দিয়ে কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কেবল এই নয়, অনেকবার মিথ্যা কথা বলেছি। নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। রাজা ও রাজ পরিবারের উপকার সাধনের জন্য সে সময় আমার পাপ পুণ্য জ্ঞান ছিল না।

ডোমপাড়ার দেওয়ানী (২)

দ্বিতীয় দিন বাআঁরা হতে পাঁচক্রোশ দূরে পাথরপুর মুকামে হাকিমদের কাছারির তাঁবু পড়ল। আজ মামলা মকদ্দমা সব বন্ধ, ঝড় বৃষ্টি আগের দিনের মতো চলেছে। সরকারি লোকেদের রসদ জোগাবার জন্য একমণ ঘি ও চার পাঁচ মণ দুধ ও দই সরবরাহ করার জন্য গোয়ালা ভারীদের নামে পরওয়ানা জারি করেছিলাম। রাজবাড়ির দরকারের সময় এবং সরকারি কাজ উপস্থিত হলে গোয়ালাদের বেগার দুধ ও দই জোগান দেওয়া প্রথা ছিল। প্রায় সমস্ত গড়জাতে চিরকাল এই নিয়ম প্রচলিত। গোয়ালাদের গোরু ও মহিষ রাজার জঙ্গলে চরে, সেই হেতু তাদের এ ধরনের বেগার জোগান দিতে হয়। ডোম পাড়ায় প্রজা বিদ্রোহের জন্য গোয়ালারা এরূপ দুধ দই জোগান দেওয়া বন্ধ করেছিল। সকালবেলা এক ঘড়ি[1] সময় একটা বারান্দায় বসেছিলাম। আমলা পেয়াদারা আমায় ঘিরে রেখেছিল। টিপির টিপির বৃষ্টি হচ্ছিল। ডোমপাড়া এলাকার ঘিঠ[2] গোয়ালা একটা মাটার পাত্রে সের দুই ভাল দুধ আর একটি ছোট পাত্রে আধসের ভাল ঘি নিয়ে উপস্থিত হল। তাকে দেখা মাত্র আমার ভয়ঙ্কর রাগ হল। আমার সামনে গাঁয়ের রাস্তায় একটা মোটা শাল কাঠের গুঁড়ি পড়েছিল। বৃষ্টির জন্য পথটায় বেজায় কাদা হয়েছিল। দুটি পেয়াদাকে হুকুম দিলাম—এই ঘিঠটাকে কাদায় শুইয়ে দিয়ে কাঠের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দাও। আর একজন পেয়াদা তার পিঠে ঘি আর দুধ ঢালুক, অন্য একজন পেয়াদা বেত নিয়ে তার পিঠে প্রহার করুক। সঙ্গে সঙ্গে হুকুমটা কার্যে পরিণত হল। ঘিঠের পিঠে দুই চার বেতের আঘাত পড়েছে মাত্র এই সময় আট দশজন গোয়ালা বেহারা ছুটে এল। পায়ের তলায় তারা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে আর্তনাদ করতে লাগল। 'ধর্মাবতার, ঘিঠকে ছেড়ে দিন, এখনই বেগার দুধ দই হাজির করে দিচ্ছি।' সত্যি সত্যি আধঘণ্টার মধ্যে ভারে ভারে দুধ ঘি পৌঁছে গেল বিনা

১ সূর্যোদয় হতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

২ গোয়ালাদের মোড়ল।

তলবে। মাছের ভারও এসে পৌছাল। কর্তব্যের কথা তাদের ভালো রূপেই জানা। তবে প্রজা বিদ্রোহ হয়েছে এই সুযোগে যদি কিছু দিতে না হয়, সেটা গোয়ালাদের লাভের মধ্যে গণ্য হবে।

রাজ্যশাসনের চারট পন্থা—সাম, দান, দণ্ড, ভেদ। যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রথম দুটিতে অকৃতকার্য হয়েছি, সম্প্রতি শেষ দুটি পন্থার আশ্রয় নেওয়া। রাজ্যের রাজমন্ত্রীরা কার্যক্ষেত্রে এই চারটি উপায় অবলম্বন করেন। অতি ক্ষুদ্র ডোমপাড়া রাজ্যের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রাজমন্ত্রী হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে মহাজনদের পন্থা অবলম্বন না করে চলতে পারি কি? বিদ্রোহীদের দু-চারজন নেতাকে প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে রাজার সপক্ষে টেনে এনেছি।

সন্ধ্যার সময় সংবাদ পেলাম, শিমিলিপুর মৌজায় বিদ্রোহীদের নেতাদের বিরাট একটা সভা বসেছিল, সেই সভায় স্থির হয়েছে কাল কাছারিতে উপস্থিত হয়ে হাকিমকে বোঝাতে হবে দেওয়ান রাজপক্ষীয় লোক, সে কখনও প্রজাদের সপক্ষে ন্যায় বিচার করবে না। হাকিম স্বয়ং তাদের অভিযোগ শুনুন।

পরদিন সকালে তাঁবুতে গিয়ে হাকিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। দেখলাম সাহেব নিতান্ত ব্যস্ত। গত রাত্রে বৃষ্টির জল ডেরার মধ্যে ঢোকায় জিনিস-পত্র ভিজে গেছে। সাহেব নিজে সেগুলি টানাটানি করে এ কোণে সে কোণে গুছিয়ে গাছিয়ে রাখছেন। আমাকে দেখে তাঁর গত রাত্রিতে হয়রান হওয়ার কথা বললেন। তার পর স্থির হয়ে বসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবু, খবর কি?' আমি বললাম, 'হুজুর, গত পরশু বিকেল বেলা দুই হাজার প্রজা হুজুরের সাক্ষাতে আমাকে মধ্যস্থ করেছিল, তা তো হুজুর জানেন?'

সাহেব, 'হাঁ,, হাঁ, প্রজারা তো আমাদের সামনে সে কথা বলে গেছেন। আবার কি হল?'

আমি বললাম, 'হুজুর, গতকাল বিকেলবেলা প্রধানেরা সকল প্রজাকে ডাকিয়ে নির্দেশ দিয়েছে, সে দিনের কথা অমান্য করে পুনর্বার গোলযোগ আরম্ভ করবে।' সাহেব, 'কি জন্য প্রজারা ওই মন্দ লোকেদের কথায় চলছে।' আমি বললাম, 'হুজুর, গরীব প্রজারা প্রকৃত নিরীহ লোক। সমস্ত উৎপাতের মূল কারণ মোড়লরা। কোনো প্রজা, প্রধানদের কথায় না চললে তার সম্পত্তি সব লুঠতরাজ করে নিয়ে ঘোর দোর ভেঙে ফেলছে। ঘরের প্রত্যেক লোককে

নির্দয়রূপে প্রহার করছে। এই কারণে সম্পত্তি নাশ ও প্রহৃত হবার ভয়ে তারা সর্দারের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।'

সাহেব বললেন, 'এরূপ অত্যাচার কোন্ কোন্ প্রজার উপর হয়েছে?'

আমি বললাম, 'পূর্বে তো অনেক লোকের উপর অত্যাচার হয়েছে। আপাততঃ চারদিন পূর্বে একটা ধোপা রাজভবনের পরিজনদের কাপড় কেচেছিল বলে তার ঘরের সম্পত্তি সব লুঠতরাজ করে নিয়ে তাকে নির্দয়রূপে প্রহার করা হয়েছে।'

সাহেব—আচ্ছা, কেবল মামলাটা প্রমাণ করুন। আমি বললাম, 'হুজুর প্রধানদের ভয়ে কোনো প্রজা সাক্ষ্য দেবে না।'

সাহেব, 'আচ্ছা যান, চেষ্টা করুন।'

আমি সাহেবের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে উঠে এলাম। মাথাটি কাৎ করে ধীরে ধীরে বাসায় আসছিলাম। মনের মধ্যে গভীর চিন্তা দেখা দিয়েছে। এখন করি কি? রাজার কাছ হতে তো কোনো প্রকার সাহায্য পাবার আশা নেই। কথাটা সত্যি হলেও আমার কথায় কে সাক্ষ্য দেবে। এই সব কথা ভাবছি এমন সময় এই কথাগুলি আমার কানে এল।

'কি হে দেওয়ান, সাহেবের ডেরা থেকে এমন মাথা হেলিয়ে ধীরে ধীরে আসছ কেন?'

চেয়ে দেখলাম নিধি পট্টনায়ক, একটি ছোট বারান্দায় বসে আছে। আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, 'কি বলব তোমায় পট্টনায়ক[১], গেল গেল সব গেল! আজ হতে করণ কুলে কালী পড়ল।' পট্টনায়ক বারান্দা থেকে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়ে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কথা, ব্যাপার কি দেওয়ান।'

আমি বললাম, 'না হে না পট্টনায়ক, আমায় ছেড়ে দিন আমি যাই। কথাটা হচ্ছে আপনাকে এ এলাকায় কেনা জানে। সারা কটক জেলায় নিধি পট্টনায়কের নাম ডাক। বংশের একজন হাতকড়া পরে হাড়ির হাতে ভাত খেলে কার বা জাত বজায় থাকে কে তাকে ছোঁয়। গেল গেল, সব শেষ হল। আপনার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সত্যি। কিন্তু সরকারি কায়দা কানুনের কথা বলতে পারব না। আমায় ছেড়ে দিন, আমি যাই।'

১ পট্টনায়ক করণ জাতির পদবীবিশেষ।

আমি চেয়ে দেখলাম লোকটা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

নিধি পট্টনায়ক আমাকে শক্ত করে ধরে বলল, 'না না বাবু, আমি কোন মতে ছাড়ব না। আমাকে বলতেই হবে।'

আমি বললাম, 'কি বলব, পট্টনায়ক মশায়, আপনার সঙ্গে এত হৃদ্যতা—আপনি আবার পরে বলবেন এই ঘোর বিপদের সময় আমি একটি কথাও বললাম না।' চারিদিকে খুব সাবধানে তাকিয়ে একটু নিরালা জায়গায় গিয়ে পট্টনায়কের কানে চুপি চুপি বললাম, 'চারদিন পূর্বে প্রধানেরা নিস্তিপুরের অমুক শেঠীর (ধোপা) ঘর থেকে জিনিসপত্র সব লুঠতরাজ করে। তাকে প্রহার করার কথা আপনি ত জানেন? ডোমপাড়া রাজ্যের বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত কে না জানে? কয়েকজন খারাপ লোক সাহেবকে বলে গেছে, জগু কতকগুলো লোক নিয়ে এসব কাণ্ড করেছে। হাঁ হে পট্টনায়ক, এ কথা কি সত্যি? আমি ত জগুর নাম শুনি নি। এর মধ্যে শিমিলিপুরের জগুনি, সুবুদ্ধি আর জনকয়েক ছিল আমি এই জানি। দেখে এলাম সাহেব হুকুম দিলেন, পুলিশ হাতে কড়া, পায়ে বেড়ি দিয়ে জগুকে ধরে আনবে। ঘরের ভিতরে ঢুকে জগুকে ধরে বেড়ি পরাবে, গাঁয়ের মাঝ রাস্তা দিয়ে হেঁচ্‌ড়াতে হেঁচ্‌ড়াতে টেনে কাছারিতে নিয়ে আসবে। হায় হায়! হল কি! যান যান তাড়াতাড়ি উপায় করুন, একদণ্ড দেরি করলে চলবে না।'

নিধি পট্টনায়ক আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাবু, জগুকে রক্ষা করবার কি উপায় আছে বলুন। আপনি এর উপায় বের করুন।' আমি চিন্তা করার ভান করে একদণ্ড অবধি চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, 'শুনুন, পট্টনায়ক মশায়, হাকিমের আপনার উপর খুব বিশ্বাস। আপনি যা বলবেন হাকিম তা বিশ্বাস করবেন। অবশ্য একটি শর্ত, মিছে কথা জুড়ে দিয়ে কিম্বা জেনে শুনে কোন কথা লুকোলে চলবে না। এ আবার কি কথা! একজন দোষ করবে, আর একজন সাজা পাবে এতো কখনও উচিত নয়। আপনি জেনে শুনে কেন মিছে কথা বলে মান সম্ভ্রম খোয়াবেন। আপনি হাকিমকে এইটুকু মাত্র বলবেন, জগু নিস্তিপুরের শেঠীর ধোপার ঘর লুঠতরাজ করে নি। তা হলে জগু একেবারে খালাস হয়ে যাবে। আর কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করে সোজাসুজি হাকিমের নিকটে চলে যান। সাবধান, আর সময় নেই।'

নিধি পট্টনায়ক আমার হাত ধরে টেনে হাকিমের ডেরার দিকে চলল। 'আসুন বাবু, আপনি আমার সঙ্গে না এলে চলবে না। আমার জন্য আপনিও দুটি কথা বলবেন।'

আমি বললাম, 'কি আর বলব, আপনি এত করে ডাকছেন, না যাই কি করে? দুটো কথা কেন আপনার জন্য ঢের কথা বলব। শুনবেন চলুন।'

নিধি পট্টনায়ককে ডেরার সামনে দাঁড় করিয়ে ভিতরে গিয়ে হাকিমকে বললাম, 'হুজুর, নিস্তিপুর মৌজার শেঠী ধোপার বাড়ি লুঠতরাজের কথা নিধি পট্টনায়ক সব জানে। হুজুর তাকে জিজ্ঞেস করলে সে সব কথা বলবে। আর আমার প্রার্থনা, এখনই তার জবানবন্দি নেওয়া হোক, নচেৎ সে পরে প্রধানদের সঙ্গে মিলিত হলে সত্যি কথা বলবে না।'

সাহেব তাঁর কাছারির টেবিলের কাছে বসে নিধি পট্টনায়ককে ডাকলেন। নিধি উপস্থিত হওয়া মাত্র ত্বরিতে বলে ফেলল, 'সাহেব সাহেব, ধোপার ঘর লুঠ তরাজের সময় জগু সেখানে ছিল না আমি জানি।' হাকিম সাক্ষীর ফরম পূর্ণ করে নিধি পট্টনায়কের কথিত বিষয় লিখে নেবার পর আমি প্রশ্ন করলাম।

প্রশ্ন—আচ্ছা পট্টনায়ক মশায়, যে ধোপার বাড়ি লুঠতরাজ হয়েছে তার ঘর কোন গাঁয়ে। তার নাম কী?

উত্তর—তার ঘর নিস্তিপুর, নাম—(এখন আমার মনে পড়ছে না)।

প্রশ্ন—আর কোন্ কোন্ সর্দার লুঠতরাজের সময় ছিলেন?

উত্তর—জগুনি সুবুদ্ধি আর অমুক অমুক ছয় জন (প্রত্যেক লোকের নাম বলল)।

প্রশ্ন—জগবন্ধু পট্টনায়ক আপনার কে?

উত্তর—অতি নিকট ভাইপো।

প্রশ্ন—এক বাড়িতে একই অন্নবর্তী কি না?

উত্তর—হাঁ, এক বাড়িতে এক অন্নে আছি।

হাকিম আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিসকে ওয়ারেন্ট দিয়ে আমাদের বিদায় দিলেন।

নিধি পট্টনায়ক পথে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবু, জগুর তাহলে কি হবে?'

আমি বললাম, 'আপনি সব ঠিক ঠাক করে দিয়ে এসেছেন। নিশ্চিত হয়ে বাড়িতে বসে থাকুন।'

আজ প্রাতে শয্যাত্যাগ হতে বেলা দশটা অবধি যে সমস্ত কথা বলেছি, যে সব আচরণ করেছি সে সব মিথ্যা প্রতারণাপূর্ণ এবং নিষ্ঠুরতাময়। সম্প্রতি নির্লজ্জের ন্যায় সে সমস্ত বিষয় লিখে ভদ্রপাঠকদের সমীপে প্রকাশ করলাম। পাঠক মহাশয়রা আমাকে যদি মিথ্যাবাদী প্রতারক স্থির করেন, আমার কলঙ্কিত নামে দোষারোপ নিন্দাবাদ করেন, তবে তাঁদের সমীপে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য ও তাঁদের বাক্যের প্রতিবাদ করার নিমিত্ত আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ভাষার অভাব হবে। তবে এই জঞ্জালময় জগতে সময় সময় কার্য কারণ সম্বন্ধের সূত্র ধরে এরূপ অনেক ঘটনা উপস্থিত হয় যে জন্য সাধারণত আমার মতো দুর্বলচেতা স্বল্পমেধাবিশিষ্ট লোকের পক্ষে সত্যমার্গে অবিচলিত ভাবে স্থির থাকা সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। অপিচ আত্মসান্ত্বনার জন্য ঐ বিষয় স্মরণ করে দেখি প্রকৃত মূল সত্য সাব্যস্ত এবং ন্যায় বিচারের পোষকতার জন্য অন্যায় উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল। অত্যাচারিত লোকের প্রতি ন্যায় বিচার, অত্যাচারীর প্রতি দণ্ড বিধান এবং ভবিষ্যতে গরীব, নিরুপায় প্রজাদের প্রতি অকারণ অত্যাচার নিরোধ, বিশেষত বিপদগ্রস্ত রাজপরিবারকে সহায়তা করা সে সময় আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বুদ্ধিমান লোক গোলাপ গাছের গোড়ায় অত্যন্ত দুর্গন্ধময় পচা মাছ ও খোল দিয়ে বৃক্ষকে পল্লবিত এবং সুন্দর সুগন্ধময় গোলাপ ফুল উৎপাদনের চেষ্টা করে থাকেন।

বেলা বারোটার সময় মহানদীকূলস্থ শিমিলপুর ও করবর মৌজার দিক হতে আট দশজন প্রধান আগে আগে এবং তাদের সঙ্গে এক হাজার প্রজা পাথরপুরের পথে খুব খোসমেজাজে এগিয়ে চলেছে। সর্দারেরা প্রজাদের খুব ভরসা দিচ্ছে আজ তাদের মামলা ডিক্রী হবে। এক পয়সাও কর বেশি দিতে হবে না কিম্বা জমি জরিপ হবে না। প্রধানের দল রণ নদীর দক্ষিণ তট হতে যে সময় নদীগর্ভের বালিতে নেমেছেন, ঠিক সেই সময় আট দশজন কনেস্টবল, একদল গ্রামের পাহারাদারকে সঙ্গে নিয়ে রণ নদীর উত্তর কূলের খাড়া পাড় থেকে নদীর বালিতে নেমে এল। নদীর ঠিক মাঝখানে দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হল। একজন কনেস্টবল ডাক দিল, 'জগুনি সুবুদ্ধি কে ?' নাম ডাকা মাত্র হাত কড়া পড়ে গেল। জগবন্ধু পট্টনায়ক কে ? লাগাও হাত কড়ি। আর অমুক প্রধান, অমুক প্রধান এইভাবে তৎক্ষণাৎ হাতকড়ি পড়ে গেল, পিছনে যে হাজার জন প্রজা আসছিল তারা পিছনে ঘুরে পড়ে দৌড় দিল, মহানদীর কূল ধরে একদল

মাঠে নেমে পড়ে ছুটে পালাল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওয়ারেণ্ট সহিত আসামী, কনেস্টবল ও চৌকিদার ছাড়া আর জনপ্রাণীর দেখা নেই।

দুপুরবেলা হাকিমের কাছারিতে নিস্তিপুর শেঠী ধোপার মামলা হল। প্রধানরা গ্রেপ্তার হওয়ায় অন্য দুই জন প্রজা চাক্ষুষ সাক্ষ্য দিতে বেরিয়ে পড়ল। দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় আসামীদের ছয় মাস করে কয়েদ হয়ে গেল।

আমি নিধি পট্টনায়কের সঙ্গে যে প্রকার অসদ্ব্যবহার করেছিলাম, ডোমপাড়া পরিত্যাগ করার পূর্বে তার কিছু প্রায়শ্চিত্ত করে এসেছি। রাজস্ব আদায় না করতে পারায় পট্টনায়কের সমস্ত চাষ জমি বে-দখল হয়ে গিয়েছিল। সে সময় তার যেরকম দুরবস্থা তাতে রাজস্ব আদায় করে জমি দখল করা তার পক্ষে কোন প্রকারে সম্ভব ছিল না। আমি তার দেয় বকেয়া খাজনা ছিয়ানব্বই টাকা নিজের হাতে দিয়ে চিরস্থায়ী রূপে তাঁর নামে জমি বন্দোবস্ত করে দিয়ে এসেছি।

কটক মুকামে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে ডোমপাড়া নিবাসী তিনজন প্রজা আমার নামে নালিশ দায়ের করেছিল। প্রধানদের মকদ্দমা শেষ হবার পরে সেই মামলা উঠল। মামলার বিশেষ বিবরণ উদ্ধৃত হল। সম্প্রতি মামলার বাদী তিনজন রাজভবনের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত সরকারি একটা পুরানো বাগান হতে আখমাড়া ঘানির খুঁটি করার জন্য একটা তেতুঁল গাছ কাটছিল। আমার কাছে খবর পৌছনোর পর আমি সেই বৃক্ষছেদনকারী তিনজনকে ধরিয়ে এনে একটি ঘরে অবরোধ করে রেখেছিলাম। পুলিসের কাছে চালান দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল। রাজার অনুমতি আবশ্যক, সেই সময় রাজা-সাহেবের আমার প্রতি ঘোর অবিশ্বাস ও ঘোর সন্দেহ বর্তমান। তাঁর ধারণা হয়েছিল আমি হচ্ছি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গোয়েন্দা। হয়ত তাকে কোনরকম বিপদে ফেলবার জন্য আমি এই মামলা ফেঁদে বসেছি। রাজাসাহেবের কাছে মামলার কথা উত্থাপন করা মাত্র তিনি চিৎকার করে বললেন, 'না না আমি কিছু জানিনা।' আমাকে এইটুকু বলে আর একটা ঘরে ঢুকে পড়ে কপাট ভেজিয়ে দিলেন। সুতরাং আমাকে গাছ কাঠুরেদের ছেড়ে দিতে হল।

কটক কলেকটরটে আমার নামে দরখাস্ত দাখিল হওয়ায় আমি মামলা সম্পর্কীয় সমস্ত সঠিক বৃত্তান্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানিয়ে ছিলাম। এখন প্রধানদের মামলা শেষ হবার পর আমার নামে অন্যায় ভাবে আটক করার জন্য ফৌজদারি মামলা দায়ের হল—বাদীপক্ষের এজাহার নেবার পর তাদের পক্ষের

তিন চার জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হল। বাদীরা প্রায় সমস্ত সত্যি কথা বলেছিল। কিন্তু সাক্ষীরা তৈরি করা। প্রকৃত কথা, ঘটনার সময় তারা অকুস্থলে উপস্থিত ছিল না, সাক্ষীদের বর্ণনার সারমর্ম দেওয়া হল, 'দেওয়ানবাবু ফকীর মোহন সেনাপতি বাদী তিনজনকে গিরিধারী ঠাকুরের মন্দিরের বেড়ার ভিতর একটি পাকা কুঠরীতে কয়েদ করে রাখতে তারা প্রত্যক্ষ দেখেছে। ঘটনার সময় তারা বেড়ার বাইরে অবস্থিত একটা তেঁতুল গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখেছে।' সরেজমিন তদন্তের জন্য সেদিন মামলা স্থগিত রইল।

পরের দিন বিকেল বেলা পাথরপুর হতে হাকিমের ছাউনি তুলে নিয়ে সকলে তালবস্ত মুকামের অভিমুখে রওনা হল। রাজবাড়ির সম্মুখ ঘেঁষে তালবস্ত যাওয়ার পথ। দিনের প্রায় শেষ সময় হাকিম তিনজন, ঘোড়ায় চড়ে রাজপুরীর দ্বারে উপস্থিত হলেন। হাকিমেরা ভালরূপে দেখলেন যে-ঘরে বাদীরা অবরুদ্ধ ছিল এবং সাক্ষীরা যেখানে দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখেছিল বলে নথিতে লেখা আছে। এদের মাঝখানে দুটি ঘরের দেওয়ালের ব্যবধান। তাছাড়া একটা ইটের উচ্চ দেওয়ালেরও ব্যবধান ছিল। ঘরের দরজা পূর্বমুখী,সাক্ষীরা পশ্চিম-দিকে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং ঘরের মধ্যের ঘটনা বা কোন প্রকার কার্যকলাপ সাক্ষীদের দেখতে পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। মামলা অ্যাসিসট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ছিল। হাকিম মামলা ডিস্‌মিস করে দিলেন।

ডোমপাড়া রাজ্যের মধ্যে তালবস্ত বৃহত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রাম। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে একটি আমবনে হাকিমদের ডেরা পড়ল। গ্রামের মাঝখানে এক তেলী মহাজনের বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। আমলা ও সরকারি অন্যান্য লোকদের থাকার জন্য গ্রামের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ঘর খালি করানো হয়েছিল।

আমি প্রাতঃকালে মহাজনের ঘরে রাস্তার দিকে উঁচু বারাণ্ডায় কাছারি বসালাম। বারাণ্ডার নীচে দশ বারজন যুবক পাঠান[১] পাহারাদার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে গ্রামের প্রধানকে খাজনার জন্য তলব করলাম, তারপর প্রজাদের। বিদ্রোহীদের দরবারে রাজকর দেবার বিষয় স্থির হয় নি, পাঁচ বছর হল অভ্যাসটা চলে গেছে। এখন কি সহজে তারা কর দেবে? আধ

১ ওড়িশা কিছুকাল পাঠান রাজত্বে ছিল। তখন থেকে মুসলমানদের সবাইকে মনে করা হয় পাঠান। ওরা সবাই উর্দু ভাষায় কথা বলে।

মাইলের মতন দীর্ঘ গ্রামে কুয়ো বলতে ছিল একটি। সেটা আবার গ্রামের মাঝামাঝি খালের রাস্তার উপর। কুয়োটা হচ্ছে সরকারি। আমাদের দরবারে ন্যায় বিচার হয়ে স্থির হল, প্রজারা যখন রাজস্ব দিতে রাজি নয় তখন তাদের রাজার কুয়োর জল নেবার কি অধিকার আছে? কুয়োর কাছে দুজন পাঠান পাহারাদার পাহারায় রইল। গ্রামের মধ্যে প্রায় তিনশ ঘর। সকলের রান্না বন্ধ। আমলা ও অন্যান্য সরকারি লোকেদের রসদ দেবার জন্য কটক থেকে তরিতরকারি এসেছিল। রসদ ঘরের করণ[1] জানাল সব শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে আমাদের কাছারির হুকুম এবং কার্যের গতি ন্যায়মার্গ হতে বহুদূরে সরে গেছে। তবে রসদঘরে আনাজ নেই, গাঁয়ের লোকেদের বাগানে আছে ত। হুকুম পাওয়া মাত্র সরকারি কনেস্টবলের সঙ্গে চাপরাশি প্রভৃতি রাজ সরকারের পেয়াদাদের সহায়তায় বাগানগুলি হতে বেগুন, কলা, কুমড়ো যা কিছু ছিল সমস্ত লুঠ করে আনা হল। বস্তুত কেবল ডোমপাড়া বলে নয়, আমি জানি, ওড়িশার সমস্ত গড়জাতে আগন্তুক হাকিমদের রসদের সমস্ত সরঞ্জাম প্রজাদের দেবার নিয়ম চিরকাল ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছিল। আপাততঃ বিদ্রোহের জন্য প্রজারা দেয় নি।

তালবন্তের বিদ্রোহীদের সকল নেতাদের নাম আমার জানা ছিল না। তালবন্তের নিকটবর্তী তুলনাপুর মৌজার সবকারি ধানের গোলার খামারি আমার কাছে বসে তাদের নাম ডেকে যাচ্ছিল। এক একজন সর্দারকে ডাকতে চার চারজন পেয়াদা ছুটছিল। আজ কাছারিতে ন্যায়ের অপলাপ দেখে জোয়ান অশিক্ষিত উদ্ধত পাঠান পেয়াদারা নিতান্ত অত্যাচারী হয়ে পড়ল। আবার বহুদিন থেকে প্রজাদের হাতে তারা লাঞ্ছিত হয়ে আসছিল। সম্প্রতি সে সমস্তর প্রতিশোধ নেবার পালা এসেছে। একজন সর্দারকে তলব করলে তার ছেলে, ভাই, মামা, শালা সকলে বাঁধা হয়ে আসছিল। প্রত্যেক বাড়িতে টাটির কবাট বন্ধ। পেয়াদারা ডাকলে ভেতরে কবাটের কোণ থেকে ক্ষীণস্বরে উত্তর আসছিল—পুরুষ কেউ বাড়িতে নেই। কোন স্ত্রীলোককে অসম্মান করা কিম্বা কোন বালক বালিকার দেহ স্পর্শ করা পাইকদের প্রতি বারংবার দৃঢ়রূপে নিষেধ করা হয়েছিল। নচেৎ কে জানে কত লোকের ঘরের কবাট ভাঙা হয়ে যেত।

---

১ ওড়িয়াদের মধ্যে কায়স্থের সমান পর্যায়ের জাত।

বেলা প্রায় এক প্রহর হবে এই সময় আমার কাছারির সম্মুখে গ্রামের পথ দিয়ে একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ত্বরিতে চলে যেতে দেখা গেল। বিপ্রবরের বয়স কলিষঠা[1] অতিক্রম করে গেছে। একহারা গড়ন, মুখ দন্তবিহীন, গৌরবর্ণ, পরিধানে তসরের যথা[2]। ধান ঘরের থামারি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে আমাকে বললেন, 'ওহো! এই যে পণ্ডিত গোসাঁই যাচ্ছেন ইনি একজন জবরদস্ত সর্দার, বিদ্রোহীদের মাঝখানে বসেন।'

চলার পথের মাঝে পণ্ডিতের দুইবাহু ধরে তিনবার দৌড় করানোর জন্য কাছারিতে হুকুম জারি করলাম। হুকুম পাওয়া মাত্র দুজন পাঠান পেয়াদা হুকুম পুরোপুরি তালিম করল।

বেলা বারোটার পর থেকে দুটো অবধি সারা গাঁয় উনুন ধরে নি। মনে কষ্ট হল, হুকুম দেওয়া হল. সরকারি অথবা রাজসরকার তরফ হতে পেয়াদা বা কোন পুরুষ পথে বেরুবে না, স্ত্রীলোকেরা এসে জল নিয়ে যাবে। হুকুম পাওয়া মাত্র প্রত্যেক ঘরের বৌ ঝি দুতিন জন বুড়ি মাটির কলসী, পেতলের ঘড়া, ঘটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কুঁয়োতলায় বেজায় ভিড় জমল, সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

বিকেল বেলা চারটার সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারি বসার হুকুম গ্রামের মধ্যে ঘোষণা করা হল।

নির্ধারিত সময়ে রাজপক্ষের লোকেরা এবং প্রজারা হাজির হল। প্রায় হাজারজন লোক কাছারিতে উপস্থিত হয়েছিল। আমার নামে দুই নম্বর নালিশ উপস্থিত হল। প্রজাদের তরফ হতে প্রথম নালিশ—'দেওয়ানবাবু ফকীরমোহন সেনাপতি ছোট পদিকা[3] দিয়ে জমি জরীপ করাচ্ছেন।' আমার কাছে অনেক-গুলি পদিকা ছিল, সেগুলির মধ্যে একটা কাঠের পদিকা, মাপ চব্বিশ দস্তি হিসাবে ১০ ফুট পাঁচ ইঞ্চি দুই যব। সেই পদিকাটি কলেকটরেট সদর কাছারি হতে এসেছিল। সেটাতে একটি কাগজের টিকিট লাগানো, স্বয়ং কলেক্টর সাহেবের দস্তখত ছিল। দেখা গেল সেই মাপে সমস্ত পদিকা তৈরি হয়েছে। এই কারণে হুকুম হল প্রজাদের অভিযোগ ডিস্‌মিস।

দ্বিতীয় নম্বর—তালবস্ত নিবাসী একজন প্রজা অভিযোগ করল। তার

১ কলিযুগে লোকের পরমায়ু ষাট বছর কাল।

২ ধুতি চাদর এক সঙ্গে বোনা।

৩ মাপ নেওয়ার ফিতে বা কাঠি।

মর্ম—দেওয়ানের হুকুমে তার খড়কুটোর গাদা লোকে লুঠতরাজ করে নিয়ে গেছে।

হাকিম আমার মুখের পানে চাইলেন। আমি জবাব দিলাম—সরকারের তরফের লোকেদের জন্য রসদ দরকার ছিল। ডোমপাড়ার লোকদের টাকা সাধলেও মূল্য নিয়ে রসদের সরঞ্জাম দিলে না। কটক থেকে সব আনালাম, কেবল পোয়াল আনাতে পারলাম না। গত রাত্রিতে বৃষ্টির জন্য হুজুরের ঘোড়া কাদায় দাঁড়িয়েছিল। তার শোবার জন্য এই লোকের খড়ের গাদা হতে কিছু পোয়াল আনিয়েছিলাম। দাম দিতে আমি প্রস্তুত আছি, পকেট থেকে একটা টাকা বার করে দেখালাম। বাদীর অভিযোগ যে ডিস্‌মিস এ কথা লেখা নিষ্প্রয়োজন।

ঠিক এই মুহূর্তে সকালের সেই সর্দার পণ্ডিত মশাই সাহেবের সাক্ষাতে উপস্থিত হলেন। কাছারির ডেরা হতে পণ্ডিতের বাসা প্রায় আধ ক্রোশ পথ। মনে হল ছুটতে ছুটতে এসেছেন। বুড়ো মানুষ হাঁপাচ্ছেন। ক্রোধে আপাদমস্তক কম্পমান দুই কানের দুটি সোনার মকর কুণ্ডল দুই গালে ঠপ ঠপ করে ঠেকছিল। তার উপর আবার ফোকলা মুখ, সমস্ত দুর্যোগ একত্রীভূত। সাধ্যানুসারে উচ্চস্বরে তাঁর নালিশ বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে লাগলেন। গলা ভেঙে গিয়ে কেবল হাউ হাউ শব্দ বেরুচ্ছিল। সাহেবের সাধ্য কি যে তার মধ্য থেকে একটিও শব্দের অর্থ বোঝেন। আমি অতি কষ্টে তাঁর নালিশের মর্ম এই কয়টা কথা সংগ্রহ করলাম। তিনি সোনার মকর কুণ্ডল আর পাটজোষী পদ পেয়েছেন। আঠগড়, তালচের ও ঢেঙ্কানল রাজার দরবারে বসেন। আজ সকালে দেওয়ান পাঠান পেয়াদা দিয়ে তাঁকে দৌড় করিয়েছে. ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাটজোষীর কপালে ফোঁটা এবং কাঁধে ঝোলানো পইতা দেখে সাহেব স্থির করলেন, এ লোকটা পুরোহিত হবে। তাঁর তীব্র কটাক্ষপাত হতে অনুমান করলাম। সাহেবের মনে একটা ধারণা ছিল, পুরোহিতরা ভণ্ড ও আলস্যপরায়ণ, তারা কোন কাজ করে না, কেবল লোকদের ভাঁড়িয়ে টাকা রোজগার করে।

সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এই লোকটা কি বলছে? আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, 'এ লোকটা মোড়লদের পুরোহিত তাদের পূজো করে। সে সম্প্রতি প্রার্থনা করছে হুজুর তার যজমানদের মামলা ডিক্রী করে দেন।' সাহেব আমার কথা শোনা মাত্র গম্ভীরভাবে ডাকলেন 'কোই হায়?' হাতজোড় করে দুজন

পাঠান চাপরাসী সামনে এসে দাঁড়াল। হুকুম হল, এই ব্রাহ্মণটিকে তাড়িয়ে দাও। হুকুম পাওয়ামাত্র পাঠান চাপরাসীদ্বয় পাটজোষীর দুইবাহু শক্ত করে ধরে তাদের শক্তি অনুযায়ী সাহেবের দৃষ্টির বাহির অবধি দৌড় করিয়ে নিয়ে গেল। পাটজোষীর দুর্গতি দেখে প্রধান ও প্রজার দল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে মরি পড়ি করে পলায়ন করল।

সাহেব আমাকে বললেন, 'আমরা যতদূর ভেবে চিন্তে দেখলাম রাজার তরফ হতে কোন রকম জুলুম নেই তবে কিজন্য প্রজারা এরকম গোলমাল করছে?' আমি বললাম, 'আসল কথা প্রজারা কোনরকম গোলমাল করছে না, কয়েকজন স্বার্থপর দুষ্ট মোড়ল এই সব উৎপাতের মূল। ইদানিং গণ্ডগোলটা তাদের ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের সঙ্গে মামলা করে সমস্ত জমি নিষ্কর ভাবে দখল করিয়ে দেবে প্রজাদের এই প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা চাঁদা নেওয়া হচ্ছে। একদল সর্দার কটকে থাকেন, একদল মফঃস্বল হতে টাকা আদায় করেন। উসুল করা টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। কোন প্রজা চাঁদার টাকা না দিলে তার ঘর লুঠতরাজ করে নেওয়া হয়। প্রজারা পাঁচ বছর হল রাজাকে খাজনা দেয় নি। কিন্তু প্রধান সর্দারেরা অনেক টাকা উসুল করে নিয়েছে। আর যে সব প্রধান সর্দারেরা আছে তারা আবার গোলমাল শুরু করবে আমি ভয় করি। হুজুর ত প্রত্যক্ষই দেখলেন, অকারণে কতকগুলি প্রজাকে একত্র করে মামলা করতে এসেছিল।'

সাহেব, 'আর যে সব দুষ্ট প্রধানরা থেকে গেছে তাদের নাম লিখিয়ে দিন।'

বিদ্রোহের সর্দার প্রধানদের নাম বললাম। হাকিম নিজে তাদের নাম লিখে নিলেন। একবছরের জন্য সোজা পথে চলার নিমিত্ত জামিন দেবার জন্য তাদের নামে পরোয়ানা জাহির হল।

ডোমপাড়ার দেওয়ানি (৩)

পরের দিন সকালে আমি বাসা থেকে বেরিয়ে কাছারির বারাণ্ডায় বসা মাত্র দশ বার জন প্রধান এবং একদল মুখ্য প্রজা বারাণ্ডার তলায় চলার পথে কাদায় লম্বা লম্বা হয়ে পড়ে গেল। 'ধর্মাবতার, রক্ষা করুন, হুজুর আমাদের মা-বাপ রক্ষা করুন।'

আজ চার মাস হল এই লোকেদের কত রকমে বুঝিয়েছি, কত রকমের যুক্তি দেখিয়ে রাজা-প্রজার মধ্যে মিলনের জন্য কত যত্ন করে ব্যর্থকাম হয়েছি। এই লোকেদের পাঁচবার ডাকলেও শুনত না, বরঞ্চ আমাকে অবজ্ঞা করে কথা বলত। এই দুদিনের মধ্যে আমি ধর্মাবতার হয়ে গেলাম। আবার এদের মা-বাপ আর রক্ষাকর্তাও হয়ে গিয়েছি। এর কারণ আজ তিন দিন হল আমার ন্যায় অন্যায় জ্ঞান নেই, অত্যাচার করতে আমি কিছু কুণ্ঠিত হই নি, মিথ্যা কথা বলতে আমার কিছুমাত্র ভয় হয় নি, সুতরাং আমি একটি ধর্মাবতার, কেবল আমি একা ধর্মাবতার নই। খুঁজতে গেলে সংসারে আমার মতো অনেক ধর্মাবতার পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ আমি সর্বদা প্রজাসাধারণের পক্ষপাতী, তারাই লোকসমাজের মেরুদণ্ড, তাদের শুভ অশুভে দেশের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে। আর প্রজাশক্তি রাজশক্তিরূপ বৃক্ষের শিকড় স্বরূপ। শিকড়ই বৃক্ষের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন ও সহায়। রাজশক্তির উপাসকেরা প্রজাশক্তিকে উপেক্ষা করে রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ান। বর্তমান ক্ষেত্রে প্রজাসাধারণের অনিষ্টসাধন আমার উদ্দেশ্য নয়। কেল্লায় শান্তি স্থাপন ও অকারণ অত্যাচারপীড়িত রাজসংসারের দুর্দশা মোচনই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। কর্তব্য সাধনের জন্য মধ্যবর্তী স্বার্থপর অত্যাচারী লোকেদের দমন করতে আমি প্রস্তুত। ন্যায় অন্যায় ও সত্য মিথ্যার প্রতি সম্প্রতি আমার দৃষ্টি নেই। আমি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে পশ্চাৎপদ নই। বিদ্রোহী সর্দারের মুখে আর কোনরকম কথা নেই, গলায় পটকা[১] দিয়ে

১ কোচার খুট।

উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছেন, 'ধর্মাবতার। আমাদের রক্ষা কর।' হুকুম হল—'তোমরা যদি আমাদের কথা অনুযায়ী কার্য কর তবে রক্ষা পেতে পার।' সকল প্রধান সমস্বরে বলে ফেলল—'আদেশ করুন আদেশ করুন।' আমাদের প্রথম কথা—'তোমরা আপন আপন জমি জরীপ করিয়ে দেবে, কোনরকম গোলমাল করবেনা।' প্রধানেরা—'আজ্ঞে, আজ্ঞে, আজ্ঞে।'

দ্বিতীয় আদেশ—কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি জমায় খাজনা নির্ধারণ হবে।

প্রধানেরা—আজ্ঞে, আজ্ঞে, আজ্ঞে।

তৃতীয় আদেশ—গত পাঁচ বছরের খাজনা জরিমানা সঙ্গে আজ সূর্যাস্তের পূর্বে সমস্ত মৌজার প্রধানেরা দাখিল করবে।

এই বিষয় নিয়ে অনেক প্রার্থনা, অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হল খাজনার টাকার উপর সুদ ধরা হবে না। সম্প্রতি তিনবছরের খাজনা দেবে, আসছে বছর ফসল পর্যন্ত দুই বছরের খাজনা তলব মকুব থাকবে।

রাজ্যের সমস্ত প্রজা আপন আপন দেয় পাঁচ বছরের খাজনা ঘরে জমা করে রেখেছিল। প্রজাদের বিশ্বাস—রাজকর কখনও রদ হয় না, যে কোন সময় দিতেই হবে। কেবল মামলা বাবদ খরচের টাকা হিসাবে প্রধানেরা প্রায় দুই বছরের খাজনার পরিমাণ টাকা প্রজাদের কাছ হতে উসুল করে নিয়েছে। সুতরাং সমস্ত পাঁচ বছরের বকেয়া খাজনা একসঙ্গে দেওয়া প্রজাদের পক্ষে ইদানিং সাধ্যাতীত হয়ে পড়েছে।

হাকিমের কাছারি হতে ডোমপাড়া এলাকার প্রত্যেক গ্রামে প্রজাদের তরফ থেকে হরকরা বসেছে। হাকিমের কাছারি হতে কোনরকম হুকুম বেরোনো মাত্র সারা রাজ্যে সেই সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। রাজদরবারে খাজনা আদায় সম্বন্ধে কথা স্থির হয়ে যাওয়াতে সমস্ত প্রধান ও প্রজারা খাজনা আনতে আপন আপন গ্রামে ছুটল।

তালবন্ত গ্রামে রাজার বাসা ও আমার বাসা কাছারির অল্প দূরে ছিল। খাজনা আদায় এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রজাদের সঙ্গে যেরূপ বন্দোবস্ত হল, সে সমস্ত কথা জানানোর জন্য, আমি রাজাসাহেবের কাছে গেলাম। রাজাসাহেব উদাসীন ভাবে আমার সমস্ত কথা শুনে বললেন, 'আমি বকেয়া পাঁচ বছরের খাজনা নেবনা। সমস্ত টাকা উসুল করে তুমি নাও। আমাদের রাজ্যের বন্দোবস্ত এবং তিন বিঘার উপর দুই পয়সা বৃদ্ধি খাজনা নির্ধারণ হওয়ার দরকার

মনে করি।' রাজাসাহেবের হুকুম শোনা মাত্র আমার মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হল। বকেয়া খাজনা আদায় সম্বন্ধে রাজার অভিপ্রায়ের কথা শুনলে হয়ত বা প্রজারা গোলমাল করতে পারে। রাজাকে বললাম 'আচ্ছা তাই হবে। আপনি চুপ করে বসুন, আমার বন্দোবস্ত কাজে হাত দেবেন না।' রাজাসাহেব বললেন 'না না আমি কোন কথায় মুখ খুলব না।'

রাজাসাহেবের কথাবার্তা হতে বুঝলাম এ পর্যন্ত আমার উপর তাঁর সন্দেহ যায় নি। রাজাসাহেবের বিশ্বাস আমি একজন কলেক্টর সাহেবের গোয়েন্দা, কোন অজুহাতে তাঁকে ধরে জেল করিয়ে দেব। এই বিশ্বাস তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। দিবানিশি মঙ্গল সাধনের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছি। কিন্তু রাজা সাহেব আমার প্রত্যেক কাজ সন্দেহের চক্ষে দেখছেন।

সেইদিন বেলা বারটা হতে খাজনা উসুলের কাজ আরম্ভ হল। শেষ রাত্রি অবধি আঠারো হাজার টাকা উসুল হল। এর পর নিজগড় কাছারির খাজনা আদায় করার আদেশ দিয়ে উসুলের কাজ বন্ধ করলাম।

সচ্চরিত্রতার জামিন দেবার জন্য প্রধানদের নামে পরওয়ানা বের হয়েছিল, হাকিমকে জানিয়ে তা রদ করে দিলাম। হাকিমেরা তালবস্ত চটি তুলে খোরদা পানে গস্ত করতে বেরুলেন।

আমার তালবস্ত পরিত্যাগের পূর্বে উক্ত পাটজোষী পণ্ডিতকে ডাকালাম। পাশে বসিয়ে নানারকম মিষ্টালাপ করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পেতলের পাতের মতো, যত শিগগিরি রাগেন ঠাণ্ডা হয়ে যান সেই অনুপাতে। পণ্ডিত আমার উপর খুব খুসি হয়ে গেলেন। আমার মতো শক্ত হাকিম প্রজাদের সামনে হাত জোড় করে কথা বলছি, বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এই হচ্ছে তাঁর আনন্দের কারণ। এই কটা দিনের মধ্যে ডোমপাড়া অঞ্চলে আমি একজন শক্ত হাকিম বলে খ্যাত হয়েছি। লোকেদের কথা— তিন তিনটা সাহেবের সামনে লোকেদের পেটাচ্ছিলেন, জেল করিয়ে দিয়েছেন, এ লোকটা নিশ্চয় একজন জবরদস্ত হাকিম।

তালবস্ত কাছারি ভেঙে নিজগড় চলে আসলাম, রাজাসাহেব রাজবাড়ির পশ্চাৎভাগের উদ্যানস্থ তাঁর নিজ নির্মিত পাকা বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। রাজবাড়ির ভিতরে যাওয়া আসা নেই। রাজবাড়ির কারও প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল না। পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলি লোকেদের মনে একটা ছাপ মেরে

দেয়। সেটা মন থেকে যাওয়া সহজ নয়। রাজাসাহেব বাড়ির বারাণ্ডায় একটা খাটিয়ায় বসেছিলেন, আমি উসুলের টাকাগুলি নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। টাকার তোড়া দেখে রাজাসাহেব বললেন, 'না না আমি টাকা নেব না। তুমি উসুল করেছ, তুমি নাও। আমি কেবল রাজ্যের বন্দোবস্ত চাই।' এইটুকু মাত্র বলে ভিতরে চলে গেলেন। পাশের লোক দরজা ভেজিয়ে দিল। কোন কথা জানাবার অবকাশ পেলাম না। রাজার কাছ থেকে ফিরে এসে রানীমাকে খবর দিলাম। রাজবাড়ির ভিতর থেকে প্রতিহারী এসে জানাল, 'রাজাসাহেব যে স্থলে টাকা রাখলেন না রানীমাতা কি করে রাখবেন ?'

টাকা রাখবার জন্য একটা সিন্দুক কিম্বা ঝাঁপি চেয়েও পেলাম না। টাকা পয়সা মিলিয়ে রাশখানিক কাছারির বারাণ্ডায় জমা আছে। সেগুলোও থলির মধ্যে গুছিয়ে রাখা হয় নি। ছেঁড়া চট ও ছেঁড়া ন্যাকড়ায় পৌটলা পৌটলা করে বেঁধে রাখা হয়েছে। রাজাসাহেব স্পষ্ট জবাব দিলেন টাকা তিনি নেবেন না। যত টাকা উসুল হয়েছে ও হবে, সে সব টাকা আমায় নিতে হবে। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি এমন কি কাজ করেছি যে এতগুলো টাকা নিয়ে নেব ? তিন মাসের অগ্রিম মাইনা পেয়েছি। আবার খাইখরচ রাজাসাহেব সব দিয়েছেন। এরপর এতগুলো টাকা কি জন্য নিয়ে যাব। প্রকৃতই টাকার প্রতি সে সময় আমার কোনরকম লোভ ছিল না। অনেক হাকিম ও অনেক ভদ্রলোক মধ্যস্থতা করা সত্ত্বেও পাঁচ বছরের মধ্যে রাজাসাহেব গোলমাল বন্ধ করেও খাজনা নির্ধারণ করতে পারেন নি। কটক ও কলিকাতার কয়েকজন বড় বড় উকিল বৃদ্ধি খাজনার বন্দোবস্ত করিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে রাজার কাছ থেকে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা অবধি নিয়ে গিয়েছে। রাজাসাহেব কর্জ করে উকিলদের এই টাকা দিয়েছেন। যদিও রাজাসাহেবের আমার প্রতি এ পর্যন্ত বিশ্বাসজাত হয় নি এবং আজ নিয়ে চার পাঁচ মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে ভাল করে মন খুলে একটা কথাও বলেন নি, তথাপি তাঁর কার্য সাধনের জন্য আমি মন প্রাণ দিয়ে দিবারাত্রি লেগে পড়ে খেটেছি। এমন কি সে সময় আমি নিজের বাড়ির কথাও ভুলে গিয়েছিলাম।

সে সময় রাজাসাহেবের কটকের দুটি শুঁড়ি মহাজনের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা অবধি দেনা ছিল। রাজাসাহেবকে কিছু না জানিয়ে সেই উসুলের

টাকাগুলি ভারী দিয়ে কটক নিয়ে এলাম। বালুবাজার নিবাসী একজন শুঁড়ি মহাজনকে সমস্ত টাকা দিয়ে রেজিষ্ট্রি তমসুকের পিঠে শোধ হল লিখিয়ে নিলাম।

অনেকগুলি আমিন নিযুক্ত করে রাজ্যের সমস্ত মৌজার জরীপ একসঙ্গে আরম্ভ করে দিলাম। আমার একটি বড় কাথিওয়াড়ি ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়ায় চড়ে সময় সময় মফঃস্বলের আমিনদের কাজ দেখে আসতাম। যে সকল সর্দার প্রধান জেলে গিয়েছে তারা খালাস হয়ে জরীপকালে বাধা দেবে এই আশঙ্কা মনে জেগে ছিল। এই জন্য মফঃস্বলের জরীপের কাজ যত শীঘ্র হতে পারে তার নিকাশ করতে যত্নবান হলাম। মফঃস্বলের জরীপের কাজ শেষ হওয়া অবধি রাজাসাহেব কটক হতে কলিকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আমার প্রতি ঘোর সন্দেহ, কে জানে আমি হয়ত একজন কমিশনার সাহেবের গোয়েন্দা, কোন মামলায় রাজাকে জড়িয়ে জেলবাস করিয়ে দেব। রাজাসাহেব গদিনসীন হওয়া অবধি ক্রমাগত ছয় বছর কাল নানাপ্রকার মামলায় জড়িত হয়ে অত্যাচারিত হওয়ার ফলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। মাতা, ভ্রাতা, সমস্ত পরিচারক ও স্ত্রী পর্যন্ত কারও উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কেউ যদি ভাতে বিষ মিশিয়ে দেয় এইজন্য চার পাঁচ বছর কাল অন্নত্যাগ করেছিলেন। আমি একজন অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুক। আবার তাঁর পরম শত্রু কমিশনার সাহেবের নিযুক্ত লোক। আমার প্রতি অবিশ্বাস জাত হওয়া স্বাভাবিক। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে রাজাসাহেব কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতেন না। একটি নির্জন কামরায় বসে আপন মনে বিড় বিড় করে বকতেন। ডান হাতের তর্জনি দিয়ে কি সব লিখতেন। এ হচ্ছে তাঁর নিজের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করার নিদর্শন।

রাজাসাহেবের এ ধরনের হাব ভাব ও রাজবাড়ির রাজমাতা, রানী ও অন্যান্য পরিজনদের দুর্গতি দেখে শুনে আমার মনে দারুণ কষ্ট হত। আমার এখন এক মাত্র ভাবনা ও লক্ষ্য—কি উপায়ে বিপদগ্রস্ত রাজ পরিবারটি শান্তি ও সুখ পাবে। রাজাসাহেব অত্যাচারী হলে আমি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করতাম না। রাজবাড়ির প্রাচীরের কাছ অবধি আগাছা ও জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। রাজবাড়িতে ঢোকার জন্য বাইরের লোকের পথ নেই। লোকে জঙ্গল সরিয়ে সরিয়ে বাইরে যাওয়া আসা করত। আজ ছয় বছর ধরে পথের একটা ঘাস তোলাবার লোক ছিল না।

সর্দারদের পক্ষ হতে পাহারা বসানো ছিল, রাজবাড়িতে কোন প্রজা যাওয়া আসা করলে তার ঘর লুঠতরাজ হত ও লোকটি ভয়ঙ্কররূপে প্রহৃত হত। আমার বাসা বা কাছারি ঘর রাজবাড়ির লাগাও। আমি প্রথম প্রথম ভোরে ঘরের বাইরে দেখতাম ঝাঁকে ঝাঁকে জংলী মুরগী দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজবাড়ির সিংহদ্বারের সম্মুখে গিরিধারী ঠাকুরের মন্দিরের প্রাচীর অবস্থিত। আমি সকাল সন্ধ্যা মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে পাকা আঙিনায় অল্প সময়ের জন্য ঘুরে বেড়াতাম। একদিন সকালে মন্দিরের সম্মুখে ফটকের বাইরে একটা আট দশ হাত লম্বা অহিরাজ সাপকে তেঁতুল গাছের উপর একটা নেপালী ইঁদুরকে ধরে খেতে দেখে আমার মনে বড় ভয় হল। জংলী শবর দিয়ে প্রাচীরের মূল হতে একশ হাত পর্যন্ত জঙ্গল কাটিয়ে পরিষ্কার করালাম। রাজবাড়ির পশ্চাৎভাগের জঙ্গল কাটালে রাজবাড়ির আবরু রক্ষা হবে না, সেই কারণে জঙ্গলে হাত না দেবার জন্য অন্দর মহল হতে নির্দেশ এল। ফলে মর্যাদাকে আশ্রয় করে জঙ্গলটি রক্ষা পেয়ে গেল।

গড়জাত কর্মক্ষেত্রে আমার কাছে নিজের একটি দোনলা বন্দুক ছিল। একটি শিকারী পেয়াদাও ছিল। প্রতিদিন আমি সকালে ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র শিকারী দুই তিনটি বুনো মুরগী শিকার করে এনে দেখাত।

চার পাঁচ মাসের মধ্যে সমস্ত মৌজার জরীপের কাজ শেষ হয়ে গেল। আমিনেরা সদর কাছারিতে এসে উআরিজা[১] করে ফেলল, প্রজাদের সঙ্গে মোকাবিলাও হয়ে গেল। এবারে জমা নির্ধারণ করার কাজ আরম্ভ হবে। সুতরাং রাজাসাহেবের উপস্থিতি নিতান্ত আবশ্যক। রাজাসাহেব সে সময় কলকাতায় ছিলেন। আমার পত্র পেয়ে গড়ে এলেন। সম্প্রতি রাজাসাহেবের মনের ভাব অন্য রকম দেখে আনন্দিত হলাম। আমার প্রতি অবিশ্বাসের ভাব নেই হেসে হেসে কথা বলতেন। সকাল সন্ধ্যা নিরালায় দুজন দুটি খাটিয়ায় বসে নানা বিষয়ে কথাবার্তা করতাম। এক একদিন বিয়ার মদ্যপান করার জন্য বাগান বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ আসত।

বর্তমানে জমির খাজনা নির্ধারণের প্রশ্ন উপস্থিত। রাজাসাহেব মাণ[২] প্রতি চার আনা অধিক খাজনা বসাতে আমাকে হুকুম দিয়ে বসলেন। সর্বনাশ! হুকুম শুনে আমার বুদ্ধি লোপ পেতে বসল। কি করব কিছু স্থির করতে পারলাম

১ আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ

২ মাণ জমির মাপ, এক একর

না। রাজাসাহেবকে অনেক রকম যুক্তি দেখিয়ে বোঝালাম ভয় দেখালাম 'আপনি দুই পয়সা বর্ধিত খাজনা নির্ধারণ করার জন্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে বসেছেন। কত হাকিম কত মধ্যস্থ লোক হার মানল, পাঁচ বছর চলে গেল কিছু করা গেল না। এ অবস্থায় চার আনা খাজনা বৃদ্ধি কোন প্রকারে হতে পারে না। আমি এ পারব না, আমি কটকে চলে যাচ্ছি।' চাকরি ছেড়ে দিয়ে কটক চলে যাবার ভয় দেখালাম সত্য, কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দিলেও আমি যেতাম না। এত দূরে এসে শেষে কি ছেড়ে দেব? একবার নয় দুইবার নয় অনেক বার রাজাসাহেবের কাছ হতে বিরক্ত হয়ে উঠে আসি, আবার গিয়ে বোঝাই। প্রত্যেকবার রাজা ধীর কোমল ভাবে হেসে হেসে বললেন 'বাবু আপনাকে এটা করিয়ে দিতে হবে।' আমার দ্বারা এ হবে না। আমি এইটুকু বলে উঠে আসি। এধারে কয়েকজন প্রবীণ ও বড় বড় রায়তকে রাজি করাবার চেষ্টা করি।

প্রত্যেকবার রাজাসাহেবকে বলে আসি, আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। প্রত্যেকবার রাজাসাহেবের সেই একই কথা—'বাবু আপনাকে করে দিতে হবে।' রাজাসাহেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে পাঁচ ছয় দিন কেটে গেল। এধারেও প্রবীণ ও বড় বড় রায়তকে ডাকিয়ে যুক্তি দেখিয়ে সম্মত করে ফেললাম। মান প্রতি চার আনা বৃদ্ধি খাজনা বন্দোবস্ত হওয়া স্থির হয়ে গেল।

বন্দোবস্ত কাজ প্রায় চোদ্দ আনা অবধি হয়ে এসেছে, এই সময় ঢেঙ্কানল কেল্লার কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার পদে আমার নিযুক্তি পত্র কমিশনারের অফিস হতে পেলাম। কিন্তু রাজাসাহেব আমাকে কোন রকমে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। আমাকে বললেন মাসিক আড়াই শত টাকা দেবেন। আর বত্রিশ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প কাগজে এরূপ বাকি শর্ত লিখে দেবেন যে, যে কোন অপরাধে আমাকে পদচ্যুত করলে যাবজ্জীবন মাসিক সেই আড়াই শত টাকা পেন্‌সন আমাকে দিতে হবে।

রাজাসাহেব এবং আমি দুইজনে একসঙ্গে কটকে এসে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। রাজাসাহেব আমার সম্বন্ধে সাহেব মহোদয়কে তাঁর সংকল্পের কথা জানানোতে সাহেব মহোদয় হুকুম দিলেন—'না না, ফকীর মোহন বাবুকে ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর বিষয় গভর্নমেণ্টকে রিপোর্ট করা হয়েছে। এর অন্যথা হবে না।'

সাহেব মহোদয় অন্য সময় আমাকে ডাকিয়ে বললেন, 'এই রাজাটা পাগল। এর কথার কোন ঠিক নেই, এর কথা শোনা উচিত নয়। সরকারের তরফ হতে আপনাকে একটা উচ্চ পদ দেবার উদ্দেশ্যে ঢেঙ্কানালে আনিয়েছি।'

আমার ডোমপাড়া ত্যাগ করে ঢেঙ্কানালে আসার কথা স্থির হয়ে গেল। ডোমপাড়ার রাজ্যে বন্দোবস্তের যে কাজটুকু বাকি ছিল, ঢেঙ্কানালে থেকে সেই কার্য সমাপ্ত করব বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম।

আমি কটকে একটি বসতবাড়ি তৈরি করার ইচ্ছায় এক খাস জায়গার অন্বেষণ করছিলাম। রাজাসাহেব সে কথা শুনেছিলেন। আমার ডোমপাড়া ছাড়ার কয়েকদিন পূর্বে একদিন বাগান বাড়ির বারান্দায় বসে দুইজন কথোপকথন করছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে রাজাসাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কটকে বসতবাড়ি তৈরি করার কি হল?' আমি বললাম, 'এ পর্যন্ত ঠিক হয় নি, জমি পেলে বাড়ি তৈরি করব।' রাজাসাহেব—কি প্রকার বাড়ি তৈরি করবেন? তাতে কত টাকা লাগবে? আমি বললাম—এই সামান্য ছোট-খাটো মাটির বাড়ি তৈরি করব, আন্দাজ আড়াইশ কি তিনশ টাকা পর্যন্ত খরচ হবে।

রাজাসাহেব—আপনার মনের মতো একটা কোঠাবাড়ি তৈরি করতে হলে কত টাকা লাগতে পারে?

আমি বললাম—পাঁচ হাজার টাকায় একটা ভাল মতো বাড়ি তৈরি হতে পারে। বস্তুত: আমি এত টাকা কোথায় পাব যে পাকা বাড়ি তৈরি করব?

রাজাসাহেব হাসতে হাসতে বললেন—'আচ্ছা পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে যান, একটা পাকা বাড়ি তৈরি করবেন।' এই পাঁচ হাজার টাকা ছাড়া একটা নেপালী ভোজালি এবং তাঁর টেবিলের উপর রাখা দোয়াতটা আমাকে দিয়েছিলেন। আমি রাজাসাহেবের কাছে পুরস্কার পাব, একথা স্বপ্নেও আমার মনে উদিত হয় নি। মফ:স্বলের বকেয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করে নেবার জন্য আমাকে পুন: পুন: বলতেন, কিন্তু আমি অবজ্ঞা ভরে সে কথায় কান দিতাম না, মনে মনে ভাবতাম উপযুক্ত মাহিনা পাচ্ছি আবার বিনাশর্তে আমার খোরাকি খরচ দিচ্ছেন, তার উপর আবার মফ:স্বলের টাকাগুলি নেব কি জন্য।

রাজাসাহেব আমাকে যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত খরচ করে ফেললাম। কেবল তাঁর নিজের দপ্তর হতে যে

বড় কাঁচের দোয়াতটি দিয়েছিলেন, সে দোয়াতটি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, শেষ অবধি থাকবে। সম্প্রতি সেই দোয়াতেই লিখছি। আমার সমস্ত কবিতা, উপন্যাস এই দোয়াতের কালীতে লেখা। দোয়াতের কাছে বসলে সেই রাজা রঘুনাথ মানসিংহ ভ্রমরবরের গম্ভীর মূর্তি মনে পড়ে। রাজাসাহেবের উক্তি বলে যে কটা কথা লিখেছি, সেগুলি লেখবার সময় মনে হয়—যেন রাজাসাহেব আমাকে বলে যাচ্ছেন, আমি লিখে যাচ্ছি।

রাজাসাহেব একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন, নব নব উপায়ে লাভজনক কৃষি-প্রবর্তনের দ্বারা জেলার উন্নতি সাধন করার জন্য তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। বিবিধ প্রকার বিদেশী ফল ও পুষ্প বৃক্ষ কলিকাতা হতে আনিয়ে একটা সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু অভিলাষ অনুযায়ী কোন কার্যই সাধন করতে পারেন নি। তাঁর রাজত্বকালে অধিকাংশ সময় হাহাকার করে কাটিয়ে গেছেন। দয়াময় পরমেশ্বর তাঁর স্বর্গস্থ আত্মাকে শান্তি দান করুন।

ঢেঙ্কানালে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারি (১)

ঢেঙ্কানালের ম্যানেজার ছিলেন বাবু বনমালী সিংহ। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত ন্যায়পরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ পরিমিতব্যয়ী এবং সংযতস্বভাব। অন্যান্য রাজ কর্মচারীদের মধ্যে বাবু প্যারীমোহন সেন ছিলেন রাজশিক্ষক, বাবু বিজয় কুমার চক্রবর্তী অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন। স্বর্গীয় দীনবন্ধু বাহাদুর ছিলেন নাবালক রাজা। পূর্ববর্তী মহারাজা স্বর্গীয় ভগীরথ মহীন্দ্রবাহাদুর অপুত্রক হওয়ায় বৌদ নামক আর একটি করদ রাজ্যের তৃতীয় পুত্রকে তিনি পোষ্যপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। দীনবন্ধু মহীন্দ্রবাহাদুর কী রূপে কী গুণে সব বিষয়ে মহাত্মা ভগীরথ মহীন্দ্রবাহাদুরের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। যে রকম লাবণ্যময় মূর্তি সেই রকম প্রশস্ত চিত্ত। সকল লোকের উপর তাঁর সমদৃষ্টি ও দয়া ছিল। তিনি নাবালক থাকার সময় ইচ্ছানুসারে ব্যয় করার জন্য সরকারি তহবিল হতে মাসিক পরিমিত কিছু টাকা তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল। বস্তুত তিনি দানশীল ছিলেন বলে সেই অর্থে সঙ্কুলান হত না। গোপনে প্রায় প্রতিমাসে অন্য লোকের কাছে অর্থ কর্জ করতেন। বিশেষ পরিতাপের বিষয় সিংহাসন প্রাপ্তির অত্যল্প কাল পরে পার্থিব সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

একমাস কাজ করার পর পূজার অবকাশ উপস্থিত হল এই অবসরে বালেশ্বরে এসে বালিকা পত্নীকে ঢেঙ্কানালে নিয়ে গেলাম। আমার প্রথমা স্ত্রীর বালিকা কন্যাটিও সঙ্গে ছিল। অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের থাকার জন্য স্বতন্ত্র বাড়ি ছিল না। প্রথমে গিয়ে ডাকবাঙলোতে রইলাম পরে সুপারিনটেণ্ডেন্ট সাহেব গৃহনির্মাণের জন্য ছয় শত টাকা মঞ্জুর করলেন। গড় হতে অল্পদূরে উত্তর দিকে একটি নিবিড় বাঁশবন ছিল। বোধ হয় বহু পূর্বে কোন রাজার এ স্থানটা গড় ছিল। এর চতুর্দিকে পরিখা ও ভগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। মধ্যস্থানটা ছিল সমতল ভূমি। বাঁশবন কাটিয়ে নিজের কল্পনা অনুসারে আপন তত্ত্বাবধানে একটি গৃহ নির্মাণ করালাম। কর্মটি সম্পূর্ণ করতে ষোলশ টাকা ব্যয় হয়েছিল। প্রথমে মঞ্জুর করা ছয়শত টাকার উপরে অধিকন্তু হাজার টাকা নিজের হাত থেকে

দিয়েছিলাম। অ্যাসিস্টেণ্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রায় নন্দ কিশোর দাস বাহাদুর মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবকে জানিয়ে সরকারি তহবিল হতে সেই টাকা আমাকে দেওয়ালেন।

সে সময়ে শিক্ষিত নাম করা গ্রন্থকারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাবু বিচ্ছন্দ পট্টনায়ক। সম্বলপুর স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টর পদ হল তাঁর প্রথম কার্য। তারপরে অনুগুলে তহশীলদারি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমার ঢেঙ্কানালে অবস্থানের তিন চার মাস পরে বিচ্ছন্দবাবুর নিকট হতে পত্র এল, তিনি ছুটি নিয়ে গ্রামে যাবেন। অনুগুল হতে তালচের অবধি এসে সেখান থেকে নদীতে নৌকাযোগে তাঁর নিজ গ্রামে যাবার সুবিধা পথ। বিচ্ছন্দবাবুর অভ্যর্থনার জন্য গড় হতে তিন ক্রোশ উত্তরে নদীকূলস্থ বউলপুর নামক গ্রামের নিকটে আমবাগানের তলায় জমি পরিষ্কার করিয়ে কয়েকটা ছামুড়িআ[1] ঘর প্রস্তুত করানো হল এবং নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হয়েছিল। ভোরবেলা বনমালীবাবু, বিজয়বাবু, প্যারীবাবু এবং আমি এই চারজন দুটি হাতীতে চড়ে সকালবেলা অনুমান ৯ টার সময় বউলপুর আমবাগানে পৌঁছালাম। অল্প সময় পরে বিচ্ছন্দবাবুর নৌকাও নদীতীরে ভিড়ল। সকলে একসঙ্গে মিলে ব্রাহ্মণীর জলে স্নান সেরে আসলাম। তারপর আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হল। বিচ্ছন্দবাবু নম্বর ওয়ান অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর একবোতল ব্রাণ্ডি পেটি থেকে বার করে বোতলের মুখের ছিপি খুলে দিলেন। বিচ্ছন্দবাবু সকলের পুরানো বন্ধু। বহুদিন পরে আজ দেখা। এদিকে আনন্দের সীমা নেই, তার উপর আবার আনন্দময়ীর আবির্ভাব। মদের একটা গুণ বা ভয়ঙ্কর দোষ একবার পান করলে বার বার পান করতে ইচ্ছে করে। যতই পান করবে ততই অধিক পান করার ইচ্ছে হবে। অনেক নির্বোধ অসাবধান লোক মদ খেতে খেতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। বনমালীবাবু ছিলেন খুব সাবধান লোক, পরিমিত পরিমাণে পান করে সরে গেলেন। বাবু প্যারীমোহন যেমন সর্বদা মাতালদের সঙ্গে জড়িত থাকেন (সে সময়ে শিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রই মদ্যপ ছিলেন) কিন্তু নিজে কখনও মদ্য স্পর্শ করতেন না। ডাক্তার বিজয়বাবু এবং বিচ্ছন্দ বাবুর দিবানিশি মদ্যপান করার অভ্যাস বলে সর্বদা সঙ্গে মদ থাকত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই দুইজন শিক্ষিত যোগ্য লোক মদ্যপান হেতু অসময়ে

১। চারিদিক খোলা কেবল উপরে পাতার ছাউনি। অন্তর্নিহিত অর্থ কেবল মাথায় যা ছায়া দেয়।

প্রাণত্যাগ করে চলে গেছেন। আমার মদ্যপান করা রীতিমত অভ্যাস ছিল না সত্য কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হলে পান করতাম। তবে সর্বদা খুব সাবধানে থাকতাম নেশায় জ্ঞান হারাবার মতো কখনও পান করতাম না। ভয়ে বিশুদ্ধ মদ্য কিম্বা অত্যন্ত উগ্রবীর্য মদ্য কখনও স্পর্শ করতাম না। মদে বেশি পরিমাণ জল মিশিয়ে ব্যবহার করতাম। আজ কিন্তু আমার জ্ঞান বোধ লোপ পেল। আমরা তিনজন মিলে সেই তীক্ষ্ণবীর্য মদের বোতল শূন্য করে ফেললাম। মদ্যপানের সময় জিহ্বাগ্র হতে নাভি পর্যন্ত অগ্নিস্পর্শাৎ জ্বলে যাচ্ছিল, তথাপি তান্ত্রিক নীতি, 'পিত্বা পিত্বা পুনঃপিত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।'

বেলা প্রায় তিনটার সময় বউলপুর ছেড়ে নৌকায় তিনক্রোশ অবধি নিয়ে এসে আর একটি গ্রামের নিকট নদীতীরে আমাদের নৌকা লাগানো হল। সেখানেও সব রকম দ্রব্যের আয়োজন ছিল। সকলে পানাহার করল কিন্তু আমি উঠতে পারলাম না। পরের দিন প্রাতঃকালে বিচ্ছন্দবাবু নৌকোতে চড়ে আপন গ্রামের দিকে চলে গেলেন। আমরা গড়ে ফিরে এলাম। দুইদিন পরে আমি প্রকৃতিস্থ হলাম সত্য, কিন্তু শরীরটা এমনই দূষিত এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল যে অনেক বছর অবধি নিতান্ত অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলাম। শিরঃপীড়া অজীর্ণতা, অনিদ্রা, অর্শরোগ জনিত অত্যন্ত রক্তস্রাব—সমস্তপ্রকার রোগ শরীরকে একসঙ্গে আক্রমণ করে বসেছিল। মদ্য একেবারে পরিত্যাগ করলে হয়ত স্বাস্থ্য লাভ করতাম, কিন্তু সাময়িক শারীরিক বল লাভের জন্য দু ভরি ওজনের দেশী মদ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পান করতে লাগলাম। সে সময় নীচ জাতির লোক হতে করণ ব্রাহ্মণ পর্যন্ত প্রায় সকলেই মদ্যপ ছিল। তাঁদের মধ্যে মদ সাধারণ পানীয়ের মধ্যে গণ্য হত। বাবুদের চাকর সন্ধ্যার সময় বাজার থেকে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ঘরের সমস্ত পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক পেট মোটা কাঁচের বোতলে মদ কিনে আনত। আবার সন্ধ্যা হতে রাত দশটা অবধি শুঁড়ির দোকানে ভদ্রলোকদের বৈঠক বসে যেত। ঢেঙ্কানালের একজন শুঁড়ি কতবার আমাকে বলেছে, 'আজ্ঞে বাবুদের জন্য আমি রাত্রে তরকারি খেতে পাই না। মাছ ডাল যা কিছু রেঁধে রাখি, বাবুরা রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি থেকে যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য খেয়ে ফেলেন।'

প্রশ্ন—'কোন বাবু রে?'

'আজ্ঞে কার নাম করব ব্রাহ্মণ, করণ সকলে।' মদ্যপ যে কতদূর নীচ, কতদূর

জঘন্য কাজ করতে পারে, এই ঘটনাটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। কেবল মদ নয়, সে সময় ঢেঙ্কানালে আফিম ও গুলি বহু পরিমাণে চলত। লোক সাধারণ মাদকদ্রব্যসেবী হলেও, ভদ্রশ্রেণীর লোকদের মধ্যে দুষ্কর্মপরায়ণ লোক প্রায় ছিল না।

গড়জাতগুলির মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতা প্রচারের ব্যাপারে ঢেঙ্কানাল ছিল সর্বপ্রথম। জ্ঞান এবং ভাষার প্রচার, ইংরেজি স্কুল, টোল ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন, রাজপথ নির্মাণ– সমস্ত বিষয়ের জন্য ভূতপূর্ব মহারাজা প্রাতঃস্মরণীয়। মহারাজা ভগীরথ মহীন্দ্রবাহাদুর[1] প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজে একজন সংস্কৃত ও উৎকল ভাষাবিদ এবং নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা হতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত অন্য সমস্ত কার্য সমাপ্ত করে পণ্ডিতদের সভা বসাতেন। একদিন উৎকল ভাষা ও অন্যদিন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের চর্চা হত। ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা তিনি অধিক প্রীতিজনক মনে করতেন। কাশী নবদ্বীপ ও অন্যান্য দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সর্বদা তাঁর সভায় উপস্থিত থাকতেন। মৃগয়া তাঁর নিতান্ত চিত্তবিনোদনের বিষয় ছিল। নিহত মহাবল ব্যাঘ্রের একটা রেজিস্ট্রি খাতা ছিল। তাতে সংখ্যা তিনশত আশি পর্যন্ত আমরা শুনেছিলাম। পেগুরা[2] বাঘ এর মধ্যে ধর্তব্য ছিল না। প্রজাদের তিনি পুত্রবৎ পালন করতেন। নিজ গড়স্থিত বৃহত্তম ভাগীরথী সরোবর তাঁর অক্ষয় কীর্তির নিদর্শন। মহারাজের মতো দীর্ঘ স্থূল শরীরের লোক আমি জীবনে দেখি নি। তাঁর বসবার চৌকি ছিল স্বতন্ত্র আকারে নির্মিত, দুইজন লোক সহজে সেখানে বসতে পারেন। কটক প্রিন্টিং কোম্পানির ছাপাখানায় তিনি সময় সময় আসতেন। সেই কারণে তাঁর জন্য দুইটি চৌকি দোতলার ঘরে সর্বদা রাখা থাকত। আজ অবধি আছে। কমিশনর সেরেস্তাদার বাবু বিচিত্রানন্দ দাসের তুলসিপুরস্থ উদ্যানে সমস্ত গড়জাতের রাজা, দেওয়ান. কেন্দ্রাপাড়ার রাধাশ্যাম নরেন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় জমিদারদের একটি সভা বসেছিল সেই সভাস্থলে আমি মহারাজের সঙ্গে পেথম পরিচিত হয়েছিলাম। কোন সূত্রে আমার মনে নেই। প্রথম সাক্ষাৎ এবং আলাপ পরিচয়ের দিন হতে তিনি আমাকে অতীব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন। অন্য কোন জায়গায় কোন সময় সাক্ষাৎ হলে একঘণ্টা অবধি পরম স্নেহের সঙ্গে কথোপকথন করতেন।

১ ঢেঙ্কানাল রাজবংশের উপাধি মহেন্দ্র বাহাদুর নয়, মহীন্দ্রবাহাদুর।

২ পেগুরা বাঘ এক জাতের ছোট বাঘ।

একদিন কটক বক্‌সিবাজারে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল। নীলগিরি রাজ পরিবারের জন্য অনেকগুলি মনিহারী জিনিস কিনে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছিলাম। দূর হতে মহারাজের বিশাল জুড়ি গাড়ি দেখে দোকানের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। তাঁর কিন্তু আমার প্রতি দৃষ্টি পড়েছিল। দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। ফকীরমোহন বাবু! ফকীরমোহন বাবু! ডাকতে ডাকতে হেঁটে হেঁটে আমার দিকে এলেন। আমি নাচার হয়ে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে ছুটে এলাম। দুই হাত বদ্ধ। মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলাম। মহারাজবাহাদুর প্রায় আধ ঘণ্টা অবধি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথোপকথন করলেন। মহারাজের নিরহঙ্কার স্বভাব ও সদাশয়তার পরিচয়ের জন্য এই অতি তুচ্ছ বিষয়টি এ স্থানে উল্লেখ করলাম। মহারাজ অত্যন্ত গুণগ্রাহী লোক ছিলেন, মাতৃভাষার উন্নতির প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন বাবু বিজয় কুমার চক্রবর্তী ঢেঙ্কানালে সস্ত্রীক বাস করতেন। তাঁর পত্নী যেমন রূপবতী, তেমনি পতিপরায়ণা ছিলেন। বাংলা ও সামান্যরূপে ইংরেজি ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী এবং আমার স্ত্রী উভয়ে ভিন্ন প্রদেশের—অন্য বন্ধুবান্ধব নিকটে আর কেউনা থাকাতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতি জন্মেছিল। প্রায় সর্বদা উভয়ে উভয়ের বাসায় যাওয়া আসা করতেন। ইদানিং ক্রমশঃ ঢেঙ্কানাল অবস্থান কালটা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। সর্বদা পীড়িত, অধিকাংশ সময় শয্যাগত হয়ে পড়ে থাকি। না করলে নয়, কষ্টে স্বষ্টে কাছারিতে গিয়ে কাজটা চালিয়ে দিয়ে আসি। বিপদ কখনও একা আসে না, বিপদের পর বিপদে লেগে থাকে। ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় মাসিক আড়াইশত টাকা বেতন, বিশেষত চিরস্থায়ী বেতনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করে এসেছিলাম বর্তমানে সমস্ত আশা ভরসা নির্মূল প্রায়। এর কারণ দেখতে হলে তৎকালীন, তৎসম্পর্কীয় ঘটনাগুলির বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনার প্রয়োজন।

উৎকলের স্থায়ী কমিশনর উৎকলবন্ধু রেভেনশ সাহেব তিন মাসের জন্য রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার হয়ে যাওয়াতে কটক জেলার কলেক্টর জন বীম্‌স সাহেব কমিশনরের পদে নিযুক্ত হলেন। রেভেনশ এবং বীম্‌স সাহেবের মধ্যে পূর্ব হতে মনোমালিন্য চলে আসছিল। বোর্ডের কার্যকাল সমাপ্তির পরে রেভেনশ

সাহেব অন্যত্র কমিশনরের পদে নিযুক্ত হয়ে যদি যেতেন তবে জন বীম্‌স স্থায়ীরূপে উৎকলে থেকে যেতেন এবং সেই সময় রেভেনশ সাহেবের অন্যত্র যাবার সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু বীম্‌স্ সাহেবের উৎকলের কমিশনরের পদে অবস্থান রেভেশ সাহেবের নিকট বাঞ্ছনীয় ছিল না। আমরা উৎকল-বাসীরা বিষয়টাকে উৎকলের দুর্ভাগ্য বলে মনে করলাম। কারণ বীম্‌স্ সাহেব উৎকলের একজন পরম হিতৈষী ছিলেন। উৎকলবাসীদের প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল। উৎকলের বিশিষ্ট বংশের লোকে মামলা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এটা সাহেবমহোদয়ের কাছে ক্লেশজনক মনে হত। এরূপ ঘটনার স্থলে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে মামলা না করে নিজেদের মধ্যে আপোষে মিটমাট করিয়ে দিতেন। কোন ভদ্র সন্তান দৈবাৎ কোন প্রকার বিপদে পড়ে তাঁর শরণাপন্ন হলে সাধ্যানুসারে তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন। অত্যাচারী জমিদারেরা তাঁর শত্রু ছিল। উৎকলের পরম দুর্ভাগ্য, মহাত্মা রেভেনশ অথবা বীম্‌সের মত একজন কমিশনর এপর্যন্ত উৎকলে এলেন না। ব্রিটিশ গর্ভনমেণ্ট শাসনযন্ত্রে হাকিমেরা ছিলেন একটা চাকার মতো। রেভেনশ সাহেব অল্পদিনের জন্য উৎকলে ফিরে এলেন। জন বীম্‌স্ নিজের পূর্বপদে কলেক্টর হয়ে ফিরে গেলেন। পূর্বে এই দুই হাকিমের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল। সম্প্রতি আরও প্রবলভাবে বিবাদ চলতে লাগল। এই সময়ে লেফ্‌টনাণ্ট গভর্নর উড়িষ্যায় সফরে এসেছিলেন। হাকিমদের মধ্যে এ ধরনের বিবাদ বিসম্বাদ চলছে শুনে বললেন, 'Orissa wants new blood', রেভেন্‌শ বর্ধমানের কমিশনর পদে, জন বীম্‌স্ শ্রীহট্টের জজ ও কমিশনর পদে নিযুক্ত হয়ে চলে গেলেন। ওড়িষ্যার কমিশনরের পদে নিযুক্ত হয়ে এলেন মিস্টার স্মিথ্। স্মিথ্ ও রেভেন্‌শ উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং জন বীম্‌স্-এর কোন কাজে স্মিথ সাহেবের সহানুভূতি না থাকা স্বাভাবিক। লোকেরা জন্ বীম্‌সের অনুগৃহীত ও নিযুক্ত লোকেদের প্রতি বিপৎপাতের আশঙ্কা করছিলেন। কিছুদিন পরে বীম্‌স সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত কয়েকজন প্রবীণ কর্মচারী পদচ্যুত হওয়ায় লোকেদের অনুমান বিশ্বাসে পরিণত হল।

ঢেঙ্কানালে অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারি (২)

এই সময় আমার একটি পুত্র জাত হয়েছিল। জ্যোতিষীরা গণনা করে কুষ্ঠী প্রস্তুত করলেন। রাত্রি বারোটার সময় জন্ম, সুতরাং সিংহ লগ্ন, কিন্তু সে দিনের সিংহ লগ্নে জাত সন্তানের সূতিকাগারে মৃত্যু নিশ্চিত। জাত সন্তান যে স্থলে জীবিত আছে, সে স্থলে সিংহ লগ্ন হতে পারে না। সময় নির্ধারণে ভুল আছে। রাত্রি বারটা ছাড়িয়ে একটার সময় কন্যা লগ্ন। অবশ্য বারটার সময় শিশু জন্ম গ্রহণ করেছিল। বালেশ্বর হতে এই মর্মে চিঠি পেলাম। ঠিক বারটার সময় যে শিশু জন্ম গ্রহণ করেছিল এবিষয় সন্দেহ নেই। শিশু জাত হবার সময় ঢেঙ্কানাল রাজ কাছারিতে বারটা বাজতে আমি শুনেছি। এক দুই করে ঘণ্টা শুনছিলাম। স্বার্থহানির ভয়ে মানব জেনে শুনে নিজেকে ভোলাতে যায়। মনে করলাম এ কি কথা, বারটার সময় জাত হলে শিশুটি মরবে। সুতরাং আমার নিশ্চয় ভুল। সে সময় হয়তো বারটা বাজে নি, নিশ্চয় সময় রাত একটা, আমি ভুল শুনেছি। পুত্র জাত হয়েছে, আবার প্রথম পুত্র। মনের আনন্দে সে সময় হাতে যত টাকা ছিল, গরীব দুঃখীদের দান করে দিলাম।

শিশুটি ছয় মাস মাত্র জীবিত থেকে সামান্য একটা রোগে মারা গেল। পুত্রটি পরম সুন্দর হয়েছিল, তার নাম মনোমোহন দিয়েছিলাম। সুগঠিত মুখটি আজ অবধি হৃদয়ে যেন অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। অনন্তকৌশলী পরমেশ্বর প্রাণী সমাজের বৃদ্ধি এবং রক্ষার জন্য জনকজননীর হৃদয়ে কি প্রবল অপত্যস্নেহ স্থাপন করেছেন। পুত্রটি মরে যাওয়াতে আমার কাছে জগৎ সংসারটা অন্ধকারময় মনে হল। সূর্যকিরণ যেন আলোক শূন্য, পায়ের তলায় পৃথিবী যেন ঘুরে যাচ্ছে। আমার স্ত্রীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয়ে পড়েছিল, সর্বদা শয্যাগত হয়ে থাকতেন। আমি কাঁদব বলে তিনি কাঁদেন না। তিনি কাঁদবেন বলে আমি কাঁদি না। উভয়ে পরস্পরের অগোচরে কাঁদি। আমার স্ত্রীর মনে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলরাম দাসের রামায়ণপাঠ বসালাম। ঢেঙ্কানালে একজন যুবক

ব্রাহ্মণ ছিলেন। দাণ্ডি[১] পুঁথি ভাল গাইতে পারতেন বলে তাঁর নামডাক ছিল। অনেক লোকের বাড়ি পুঁথিপাঠ করতেন, পুঁথি পাঠ করা তাঁর ব্যবসা ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এসে রামায়ণ পারায়ণ[২] করতে লাগলেন। তিনি খুব চিৎকার করে লম্বিত রাগিণীতে গেয়ে যেতেন সত্যি, কিন্তু তাঁর পাঠ করার সময় আমার স্ত্রী ক্যাল ক্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন, বিষয়-বস্তু কিছুই বুঝতে পারতেন না। তাঁর পক্ষে বুঝতে পারা দূরে থাক, পাঠ্য বস্তুর সমস্ত বিষয় আমার পক্ষেও বোঝা নিতান্ত অসাধ্য ছিল। পুস্তক পাঠ বন্ধ করিয়ে দিলাম। ঢেঙ্কানাল মহারাজার পুস্তকালয় হতে সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণ এনে পদ্যানুবাদ করতে লাগলাম। দিনের বেলা অনুবাদের কাজ করি। সন্ধ্যার সময় স্ত্রীকে শোনাই। প্রায় বোঝাতে হত না। পদ্যগুলি পড়ে যাওয়া মাত্র তিনি বুঝতে পারতেন। প্রকৃতই তিনি ধীরে পুত্রশোক ভুলতে শুরু করলেন। বাল বা আদিকাণ্ড রচনা ও ছাপা সমাপ্ত হয়ে গেল।[৩]

বালকাণ্ডের মুদ্রিত পুস্তকগুলি বিনামূল্যে সর্বসাধারণকে বিতরণ করে দিলাম। ক্রমশঃ অযোধ্যাকাণ্ড অনুবাদ এবং পাঠ হতে লাগল আমার স্ত্রী হাতজোড় করে স্থিরভাবে আমার সম্মুখে নির্মলমনে বসে শুনতেন। সে সময় তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকত না। রামের বনবাসের আরম্ভ থেকে তাঁর নেত্র হতে অশ্রুধারা বইতে লাগল। পাঠসমাপ্তির পর দেখি, অশ্রুপাতে সামনের ভূমিখণ্ড সিক্ত হয়ে গেছে। সূর্পনখা রাক্ষসী শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে ভোলাতে গিয়ে

---

১ লাইনের প্রতি বাক্যের শব্দ সংখ্যা সমান নয়।

২ রোজ যা পাঠ করা হয়।

৩ রামায়ণ বাল কাণ্ডের প্রথম মুদ্রণ (১৮৮০)।

এই গ্রন্থ জন বীম্‌স সাহেবকে উৎসর্গীকৃত—

To John Beames Esquire B. C. S,

Honoured Sir,

I beg most respectfully to dedicate this work to you as a token of the affectionate gratitude which Orissa has always felt towards you for the intelligent and heart-felt interest you have evinced in the improvement of the Oriya language and in the welfare of her people.

I am,
Honoured Sir,
your most obedient servant
Phakir Mohan Senapati

Dhenkanal
1880

অকৃতকার্য হয়ে সীতাদেবীকে খেতে উদ্যত হল। সেই অংশটি শ্রবণ মাত্র আমার স্ত্রী ক্রোধে গর্জন করে উঠে বললেন, 'দুষ্টা রাক্ষসী-দুশ্চরিত্রা নির্লজ্জা, তুই মরে যা, তুই মরে যা।'

প্রতিদিন রামায়ণপাঠের সময় আমার স্ত্রী অপেক্ষা করে থাকতেন। সময় উপস্থিত হবার পূর্বে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে দুখানি আসন পেতে বসে থাকতেন। কোন কোন দিন অন্য সময়েও রামায়ণ পাঠ হত।

তাঁর ইচ্ছা আমি অন্য কোন কর্ম না করে কেবল রামায়ণ লিখি, তিনি সমস্ত দিন অন্য সর্বপ্রকার কর্ম পরিত্যাগ করে পাঠ শ্রবণ করেন। অযোধ্যাকাণ্ড অনুবাদ সমাপ্ত হল। আমার স্ত্রী বললেন—'আমরা পুত্রের জন্য কেন ক্রন্দন করব? পুত্র আমাদের নাম রক্ষা করবে এই জন্য তো? পুস্তকটি হাতে ধরে বললেন, 'এই পুস্তকটি আমাদের পুত্র, চিরকাল আমাদের নাম রক্ষা করবে।' এই সময় আমাদের দ্বিতীয় পুত্র[১] জাত হয়েছিল। পুস্তক পাঠ সমাপ্তের পর আমার পানে চেয়ে বললেন—'তুমি কি করে এ ধরনের ছন্দ মিলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পদ্য রচনা করে যাও?' দিবা রাত্রি সীতাদেবী এবং রামচন্দ্র বৃত্তান্ত কথোপকথন করা তাঁর ইচ্ছা, কিন্তু কাছে অন্য স্ত্রীলোক কেউ নেই। একটি দাসী ছিল। তাকে পাশে বসিয়ে সীতাদেবী ও রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত শোনাতেন, কিন্তু মেয়েটা ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে থাকত, কথা কিছু বুঝত না। একদিন আমি অন্য ঘরে বসে শুনলাম, আমার স্ত্রী সগর্বে পরম আনন্দের সঙ্গে সেই দাসীকে বলছেন, 'আমাদের বাবু কেমন সুন্দর পদ্য রচনা করতে পারেন, কত শীঘ্র লিখে যান।' দাসী বলল, 'হাঁ হাঁ আমাদের গাঁয়ে ঢের লোক পুঁথি পাঠ করেন, সুর করে পড়েন।' আমার স্ত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি আশা করেছিলেন, দাসীটা তাঁর স্বামীর প্রশংসা করবে, বলছে কিনা তার গাঁয়ে ঢের লোক পুঁথি পাঠ করেন।

আমার স্ত্রীর উপাসনার জায়গায় খুব যত্নের সঙ্গে একখানি রামায়ণ পুস্তক রাখা থাকত। তিনি প্রতিদিন স্নানান্তে উপাসনার পরে একটি বা দুইটি অধ্যায় পাঠ করে পুস্তকের উপর ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করতেন। যে কোন দিন যে কোন সময় হোক, "সীতা দেবী" এই শব্দ শ্রবণ মাত্র তাঁর উদ্দেশে হাত জোড় করে নমস্কার করতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর নেত্র হতে অশ্রুধারা বয়ে যেত। তিনি

[১] ইনি স্বনামধন্য দার্শনিক মোহিনীমোহন সেনাপতি—অনুবাদিকা

অত্যন্ত ঈশ্বর পরায়ণা ও সত্যবতী ছিলেন, ধ্যান ধারণায় তাঁর অনেক সময় অতিবাহিত হত।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম বা মৃত্যুর দশ বার বৎসর পূর্ব হতে মাতৃভাষার আলোচনা প্রায় পরিত্যাগ করেছিলাম। নানা কারণে স্কুল পাঠ্য পুস্তকের তালিকা হতে আমার লেখা সমস্ত পুস্তক উঠে গিয়েছিল। নূতন পুস্তক লিখলে চলবে বলে আশাও ছিল না। আবার কোন পুস্তক লিখলে ছাপানোর খরচ বাবদ অর্থাভাব, পড়বেই বা কে! স্কুল পড়ুয়া বাবুরা উৎকল ভাষায় লেখা পুস্তকগুলি অবজ্ঞার চক্ষে দেখত। কিন্তু কেমন একটা আমার স্বভাব। কিছু না লিখে থাকতে পারতাম না। সময় সময় বাংলা মাসিক পত্র এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় কিছু কিছু লিখতাম। উৎকলের অত্যাচারী হাকিম, উৎকোচগ্রাহী প্রধান আমলা, প্রজাপীড়ক প্রধান জমিদারদের লক্ষ্য করে বিদ্রূপাত্মক পদ্য বেনামীতে লিখতাম! সময় সময় সেই পদ্যের বিষয় নিয়ে অনেক দিন অবধি লোকেদের মধ্যে আন্দোলন চলত। রামায়ণ লেখার সময় মনের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হল। বাঙলা লিখে বঙ্গদেশীয় লেখক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতে পারব না, বঙ্গভাষায় অভাবই বা কি আছে। কেউ পড়ুক বা নাই পড়ুক ওড়িয়ায় পুস্তক লিখব। বর্তমানে কেউ না পড়ুক ভবিষ্যতে কেউ হয়ত পড়বে। আমার মাতৃভাষায় লেখা একটি পুস্তক বৃদ্ধি পাবে ত। বাঙলায় লেখা একেবারে পরিত্যাগ করে ওড়িয়ায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করলাম। বিশেষত আমার স্ত্রী বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি পূর্বক শুনতেন বলে সময় পেলেই রামায়ণ লিখতে বসে যেতাম। কিন্তু সে সময়ে ঢেঙ্কানালে আমার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমশঃ শয্যাগত হয়ে পড়লাম, অধিক সময় অবধি লেখার সময় হত না।

ঢেঙ্কানালে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ও একজন বাঙালী ওভারসিয়র ছিলেন। এই দুজনই মহাত্মা বীম্‌স্ সাহেব কর্তৃক অনুগৃহীত ও নিযুক্ত হয়েছিলেন। কর্মে ত্রুটি হওয়ায় দুজনেই বরখাস্ত হয়ে গেলেন। এখন আমার পদচ্যুতির বিষয় লোকে আশঙ্কা করতে লাগল। সে সময় সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে মহাত্মা বীম্‌স কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী মাত্রই বর্তমান কমিশনরের অপ্রিয়পাত্র।

সে সময় ঢেঙ্কানাল রাজপরিবারের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ যুবক কর্মচারী ছিল। তার পদবী খানসামা। সে আপনাকে রাজার ব্রাহ্মণ পুত্র বলে পরিচয় দিত এবং

রাজপুত্রের ন্যায় লোকের সাক্ষাতে আচরণ করত। লোকটি এরূপ স্বার্থপর যে একা সুখে থাকবে বলে নিজের পিতার নিকট হতে পৃথক থাকত। একবার কোন মকদ্দমার সম্পর্কে তার পিতার নামে ওয়ারেণ্ট বার করার জন্য আমার আদালতে প্রার্থনা জানিয়েছিল। কিন্তু আমি তা নামঞ্জুর করেছিলাম। মহারাজা ভগীরথ মহীন্দ্রবাহাদুরের পরলোক গমনের পর রাজসরকারের কর্মচারী নিযুক্ত করার জন্য কমিশনর সাহেব ঢেঙ্কানালে এসেছিলেন। অন্যান্য কতক বিভাগের কর্মচারী নিযুক্ত করার পর মহারাজার খাস পরিচারক নিযুক্ত করা আরম্ভ হল। সে বিভাগে পরিচারক ছিল বাহাত্তর জন। কমিশনর সাহেব হুকুম করলেন, একটি কেবল বালক থাকবে রাজার কাছে। এতগুলি পরিচারক রেখে গোলমালের সৃষ্টি করা উচিত নয়। কমাতে আরম্ভ করলেন। দাঁতনের জন্য চাকর চারজন। একজন জঙ্গল থেকে দাঁতনের জন্য একটি ডাল কেটে আনত। একজন সেই ডাল কেটে উপযুক্ত মাপের দাঁতন প্রস্তুত করত। একজন সদর হতে সে দাঁতন নিয়ে গিয়ে মণিমার[১] প্রয়োজনের জন্য অন্দরে যথাস্থানে রেখে আসত। চতুর্থ চাকরটি শ্রীছামুর[২] শ্রীহস্তে বাড়িয়ে দিত। সাহেব তিনজন চাকরকে সরিয়ে দিয়ে একজন মাত্র রেখেছিলেন।

এইরূপে অন্যান্য বিভাগ হতেও চাকর কমাতে লাগলেন। পাকশালে পাচক ব্রাহ্মণ ছিল ছয়জন। দুইজনকে রেখে বাকি চার জনকে বার করে দিলেন। পদচ্যুত পাচকদের মধ্যে একজন কটক জেলাবাসী লোক ছিল। অনেকদিন থাকার হেতু সে ঢেঙ্কানালে গড়ে দ্বিতীয় ঘরদোর প্রস্তুত করিয়ে একরকম ঢেঙ্কানালবাসী হয়ে গিয়েছিল। তারপক্ষে এখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হল। চাকরিটা বাঁচাবার জন্য আমাকে ধরে পড়ল। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সাহেবকে জানালাম, এই পাচকটি না থাকলে রাজার কার্য চলবেনা। এই পাচকটি রাজার জন্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে, পাঁউরুটি তৈরি করতে জানে। সাহেব আদেশ দিলেন, এরূপ পাচক একজন রাখা নিতান্ত আবশ্যক। কত মাহিনা পায়। সাত টাকা। না, না, এরূপ যোগ্য লোকের মাহিনা মাসিক তিরিশ টাকা হওয়া উচিত। তার সেই বেতন ধার্য হয়ে গেল। সেই লোকটির আমার প্রতি প্রগাঢ়

---

১ অধীনস্থরা রাজাসাহেব বা রানীসাহেব না বলে 'মণিমা' বলত। শব্দটি রানীর পক্ষে প্রযোজ্য। রাজকন্যা বা রাজমাতার পক্ষেও।

২ রাজাসাহেবের। শব্দটি কেবল রাজাসাহেবের পক্ষে প্রযোজ্য। রাজাসাহেব আসবেন না বলে অধীনস্থরা বলত, 'ছামুরে বিজে হবেন (বিজয় হবেন)।'

ভক্তি জন্মাল, সময় সময় আমার বাসায় আসত। প্রয়োজন হলে আমার বাসায় নাড়ু প্রস্তুত করে দিয়ে যেত। সে লোকটি বাক্‌পটু ছিল ও ওড়িয়া লিখতে পড়তে জানত। ঢেঙ্কানালে রাজকাছারিতে সে সময় ভাল উকিল মোক্তার ছিলেন না। সেই লোকটির আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আদালতে তাকে মোক্তারের পদে নিযুক্ত করেছিলাম।

মোক্তারিতে লোকটির মাসিক শতাধিক টাকা আয় হতে লাগল। আমার প্রথম পুত্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরের কথা। আমি সে সময় পীড়িত অবস্থায় শয্যাগত প্রায়, ঠিক সেই সময় উক্ত মোক্তারের একজন মক্কেলের একটা মকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করে দিলাম। সেইদিন হতে মোক্তারবাবু আমার বিরুদ্ধে ঘোর শত্রুতাচরণ শুরু করলেন। ঢেঙ্কানাল কাছারির জমাদার ছিল বেজায় গাঁজাখোর, কোন কাজ করত না, সর্বদা গাঁজা খেয়ে ঘুরে বেড়াত। সময় সময় নেশার ঝোঁকে আমার আদালতে উপস্থিত হয়ে ভয়ানক গোলমাল করত। বার বার নিষেধ করলেও শুনত না। একদিন কাছারিতে আমি সাক্ষীর জবানবন্দি নেবার সময়ে উপস্থিত হয়ে বিষম গোলমাল করাতে তাকে আদালতের অবমাননাহেতু পাঁচটাকা জরিমানা করলাম, সে হোল আমার তিন নম্বর শত্রু। কাছারির মহাফিস[১] একটা সামান্য কারণে আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে লাগল। ফলে শত্রু সংখ্যা হল চারজন। এই সময় আমি পীড়িত, প্রায় শয্যাগত, অতি কষ্টে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কাছারিতে বসি, প্রতিদিনের কাজগুলি শেষ করে বাড়ি চলে আসি। সেরেস্তার আভ্যন্তরীণ কাজগুলি দেখা আমার আর শক্তিতে কুলোতনা। এই দুর্যোগ বা সুযোগটা কাছারির পেস্কার বাবুর বিপুল ধনাগমের ব্যাপারে বিশেষ অনুকূল হয়ে পড়েছিল। সে রেজেস্ট্রি বই এবং নথিতে আমার লিখিত নাম কেটে কুটে ডিক্রী স্থলে ডিস্‌মিস্‌ বা ডিস্‌মিস্‌ স্থলে ডিক্রী আর দেওয়ানি মামলার নথিতে একশ টাকা ডিক্রি স্থলে দশ টাকা, পাঁচ টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকা লিখে দিয়ে লোকেদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করায় নিযুক্ত থাকত। এই সময় অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রায় নন্দকিশোর দাস বাহাদুর কোর্ট অফ ওয়ার্ডের কার্যপ্রণালী তদন্ত করতে ঢেঙ্কানালে এলেন। অন্যান্য বিভাগের কার্যাবলী পরিদর্শন করার পর আমার সেরেস্তা তদন্তের সময় উপস্থিত হল।

১ বাংলায় 'মহাফেজ'। ইংরেজিতে 'Record keeper'.

পেস্কার এবং অন্য আমলারা আপন আপন এলাকার রেজেষ্ট্রি বই নিয়ে হাকিমের নিকট উপস্থিত হল। হাকিম একটা রেজিষ্ট্রি বই নিয়ে যেই একটা পাতা উল্টিয়েছেন, কয়েকটা নম্বর কাটাকুটি দেখা গেল। হাকিম আমার পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কাটাকুটি কেন ?' একটা পাতায় এরকম অসঙ্গত কাটাকুটি দেখে আমি ত অস্থির হয়ে পড়লাম। বই দেখি বলে রেজেষ্ট্রি বইটা তাঁর হাত থেকে টেনে নিলাম। উল্টিয়ে দেখি প্রত্যেক পাতায় কাটাকুটি। আমার কাছে যেন কোন কিছুই আর দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না, মাথা ঘুরছে। হাকিমকে প্রার্থনা করলাম, 'আমার সেরেস্তা তদারকি কার্য আজ বন্ধ থাক, কাল্ তদারক করবেন।' দয়াময় প্রভু আবাল্য আমাকে রক্ষা করে আসছেন, বর্তমান অবস্থায়ও সহায় হলেন। হাকিম আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, নচেৎ সেই মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেত।

বাসায় এসে সব রেজিষ্ট্রি বই দেখলাম, দশ পাঁচ জায়গায় নয়, শত শত নম্বরে কাটাকুটি। আমার কপালে যে কি ঘটবে সে চিন্তা আমার মনে মুহূর্তের জন্যও উদিত হয় নি। এই আমলাটা যে দায়রায় সোপর্দ হবে এ একেবারে নিশ্চিত। কি উপায়ে এই লোকটা রক্ষা পাবে, এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লাম। পেস্কারের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তার মনে ভয় বা চিন্তার চিহ্নমাত্র স্পর্শ করে নি। আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল মনে কথাবার্তা করে চলেছে। সেই পেস্কারের একটি বৃহৎ পরিবার। অনেকগুলি ভাই, সবগুলোই মাতাল বদমাইস, দাম্ভিক এবং অন্যের অনিষ্টকারী। পরে শুনলাম পেস্কারের সব ভাই একত্র বসে স্থির করেছিল যে হাকিম অর্থাৎ আমার কথা অনুযায়ী রেজেষ্ট্রি বই কাটাকুটি হয়েছে, এই কথা তারা তদারকি হাকিম অ্যাসিসটেন্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে জানাবে।

অন্য কোন উপায় না দেখে পুরোনো সমস্ত রেজেষ্ট্রি বই ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সারা রাত বিনিদ্র বসে নতুন রেজিষ্ট্রি বই একপ্রস্থ প্রস্তুত করিয়ে ফেললাম। তিনজন আমলা সারারাত বসে নূতন রেজিস্টারি বই লিখে ফেলল। রেজিস্টার বই প্রস্তুত হয়ে গেল। বস্তুত চার পাঁচ শত নথি সংশোধন করা সহজ কথা নহে, একেবারে সাধ্যাতীত। পরের দিন কাছারিতে রেজিষ্ট্রি বই সব তদারক হয়ে গেল। কিন্তু কাটাকুটি নথিগুলি ধরা পড়ে গেল। আমার পরম হিতৈষী অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিজের ইনস্পেকসন্ রিপোর্টে কেবল মাত্র মন্তব্য

প্রকাশ করলেন, 'অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের সেরেস্তায় অনেকগুলি নথি নষ্ট অবস্থায় দেখা গেল।' হাকিম কেবল আমায় বাঁচাবার জন্য কাটাকাটি কিম্বা জাল শব্দ উল্লেখ করলেন না। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্মিথ সাহেব ইনসপেকশান রিপোর্ট পাঠ করে ঢেঙ্কানাল সেরেস্তা তদন্ত করার জন্য তারিখ নিরূপণ করে পরোয়ানা জারি করলেন। আমার প্রতি সাহেবের অভিপ্রায়ের বিষয় আমার ভাল করেই জানা ছিল। এ যাত্রা যে আমার রক্ষা নেই তা ভালরূপে বুঝতে পারলাম। তথাপি আমার আত্মরক্ষার জন্য কিছুমাত্র ভাবনা মনে উদয় হল না। যা হবার হয়ে গেছে, কিরূপে এ আমলাটা জেল হতে রক্ষা পাবে কেবল সেই চিন্তা। নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়বেন বলে আমার স্ত্রীকে কিছু জানালাম না। আমি নিশ্চল হয়ে বসে চিন্তা করছি দেখলে, আমি আমার মৃত পুত্রের কথা ভাবছি মনে করে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কোন কথা না বলে নির্বাক হয়ে আমার কাছে বসতেন। পেস্কারকে জেল হতে বাঁচাবার জন্য আমি ব্যস্ত। ইত্যবসরে সভ্রাতা পেস্কারবাবু আমার স্কন্ধে সমস্ত অপরাধ ন্যস্ত করে নিজে খালাস হয়ে যাবার উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত। কি উপায় অবলম্বন করব, এ বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য প্রকৃত বন্ধু ঢেঙ্কানালে কেউ ছিলেন না। বরং পরম শত্রুর অভাব ছিল না। হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্র "Similia Similibus," 'সমে সম' উপায়টি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়ে পড়লাম। অর্থাৎ একটা অন্যায়কে ঢাকতে আর একটা অন্যায় পথ নেওয়া স্থির করলাম।

আমার অফিস মহাফিসখানা অর্থাৎ নথি প্রভৃতি কাগজপত্র রাখার ঘরটি অতি ক্ষুদ্র চালাঘর, আবার পুরোনো। সেই ঘরের উপর হতে চালার খড়কুটো নামিয়ে ফেল্‌লাম। স্থানে স্থানে ফাঁক করিয়ে দিলাম। নথিগুলি একটা কোণে জমা করে তার উপর জল ঢেলে ছিঁড়েখুড়ে দেওয়া হল। অবশ্য আমার পরামর্শ অনুসারে পেস্কার বাবু এই সব কাজ করে ফেললেন। এখন এসব কথা লিখতে হাত কাঁপছে, কিন্তু সে সময় নিতান্ত সহজে সে সব কাজ করে ফেললাম।

গড়জাত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্মিথ সেরেস্তা পরিদর্শন করতে ঢেঙ্কানালে এলেন। দীর্ঘ, স্থূল ভীষণ মূর্তিটি, অতি ক্ষুদ্র মহাফিসখানার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ নিম্ন চতুর্দিক মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষণ করে দেখলেন। উপর থেকে জল পড়ে ভেজা পচা একটা কোণে রাশীকৃত গাদা করা নথিগুলির দিকে চেয়ে

আমাকে তীক্ষ্ণভাবে বললেন, 'বাবু, তুমি বড়ই রক্ষা পেয়ে গেলে। অবশ্য মোগলবন্দী'[1] যদি হত কিছুতেই রক্ষা পেতে না।' আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'যা হোক পেস্কারটা বেঁচে গেল।' হাকিম তাকে কেবল তিনমাসের জন্য পদচ্যুত করলেন, মহাফিসখানার জন্য আলমারি কিনে দেওয়ার টাকা মঞ্জুর করিয়ে কটক চলে গেলেন। পেসকার তিন মাসের জন্য সাস্‌পেণ্ড হওয়ায় তার ভাইয়েরা ভীষণ রেগে গেল। আমাকে গালি দিতে লাগল, সর্বত্র বলে বেড়াল সেরেস্তার অপরাধের জন্য হাকিম দায়ী। পেসকারের সাস্‌পেণ্ড হওয়া নিতান্ত অন্যায়। আশ্চর্যের বিষয়, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার হতে তারা মুক্তি লাভ করতে পারল না।

তাদের বৃহৎ পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেছে। উপস্থিত ঘোর বিপদ হতে রক্ষা পেয়ে গেলাম। কিন্তু শরীর দিন দিন অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল। অল্প সময়ের জন্য কাছারির কাজ করি। সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকা কষ্টকর মনে হয়।

১ ব্রিটিশ শাসিত জেলা কটক, পুরী, বালেশ্বর—এই তিনটিকে বলে মোগলবন্দী। বোধহয় মোগল আমল থেকে এই নাম।

ঢেঙ্কানালে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারি (৩)

আমাদের গৃহ বালেশ্বর শহরের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ছিল। এর চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। পূর্বে এই সকল গ্রামে কতকগুলি জাহাজী মহাজন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের আবাস ছিল বলে এ সমস্ত গ্রামের বেশ গৌরব ছিল, সর্বদা আনন্দোৎসবে পূর্ণ থাকত। মহাজন ও জমিদাররা ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করত। পূর্বে শহরতলীতে চাষের কাজও কেউ পছন্দ করত না। জাহাজ তৈরির কাজ চলার সময়ে নানা শ্রেণীর কারিগরদের বাড়ির বাইরে বেরোলেই পয়সা আসত। তারা কেন ক্ষেত খামারে গিয়ে কাদা চটকাবে? নিমকমহাল উঠে যাওয়াতে কেবল মহাজন নয়। সর্বশ্রেণীর লোকে নিতান্ত দুর্দশায় পড়ে গেছে।

আমাদের গ্রাম সংলগ্ন এক বৃহৎ তাঁতীপাড়া ছিল। বালেশ্বরে কলের কাপড় আমদানি হবার পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বে এই তাঁতীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হত। দুইশত নম্বর সুতোয় অতি পাতলা দশ-বারো টাকা মূল্যের ধূতি বোনা হত। সতেরশ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ দিনেমার ফরাসী সওদাগরেরা বালেশ্বরী কাপড় বিলাতে চালান করত।

এখন সেই সব তাঁতী বংশ লোপ পেয়েছে। এই অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলি এ স্থানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য, বর্তমানে আমাদের গ্রামগুলি দরিদ্রের বাসস্থান হয়েছে।

বালেশ্বরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হবার পূর্বে পীড়িতাবস্থায় অর্থ ব্যয় করে কবিরাজ ডাক্তার ডাকা কিম্বা মূল্যবান ঔষধ ক্রয় করা দরিদ্র শ্রেণীর লোকের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ত। তাদের উপকারের জন্য কস্তুরি, মকরধ্বজ প্রভৃতি মূল্যবান ঔষধ সংগ্রহ করে রাখতাম। সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদীয় নিদান, চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট্ট এবং রসেন্দ্রসার সংগ্রহ প্রভৃতি কতক চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলাম।

সম্প্রতি ঢেঙ্কানালে সময় কাটানো এবং অক্ষম পীড়িত লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য নানাপ্রকার তৈলপাক, ধাতু জারণ মারণ, বটিকা প্রস্তুত করা প্রভৃতি

কাজে লেগে গেলাম। সময় সময় তৈল ও ভস্ম প্রার্থীরা কটক ভুবনেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চল হতে আমার কাছে আসত।

কিছুটা সময় আনন্দে যাপনের জন্য পাশা খেলা আরম্ভ করলাম। প্রায় প্রতিদিন বিকেল বেলা বাড়িতে পাশা খেলার আড্ডা বসত। কতক নিষ্কর্মা করণ ব্রাহ্মণ জুটে গেলেন। এই ব্যর্থ আমোদে বৃথা সময় অতিবাহিত হচ্ছিল।

দুর্ভাগ্যের সময় দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। আয়ুর্বেদে একপ্রকার সুরার নামোল্লেখ আছে, তার নাম মৃতসঞ্জীবনী সুরা। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে দেবাসুর সমরের সময় সুরেরা এই সুরা পান করে জোর লড়াই করায় অসুরগুলি হেরে গিয়ে পলায়ন করে। আর পরাজিত অসুরের ন্যায় অনেকগুলি ব্যাধিও দেহ ছেড়ে পালিয়ে যায়। মনে ভাবলাম মদ্যপানজনিত আনন্দ, আবার রোগ হতে মুক্তি লাভের জন্য এরূপ উপায় অপরিহার্য, অবিলম্বে এটা করা দরকার। শুঁড়িকে ডাকিয়ে শীঘ্র দ্রব্য সংগ্রহের জন্য শাস্ত্র হতে ব্যবস্থাপত্র উদ্ধার করে তাকে দিলাম। হাকিমের হুকুম, আবার এধারে একটা নূতন ব্যবসা শিক্ষা। শুঁড়ি দিন রাত লেগে কয় দিনের মধ্যে মৃত সঞ্জীবনী তৈরি করে ফেলল।

আমি পূর্বেই লিখেছি, সে সময় ঢেঙ্কানালে বেড়ালের বাচ্চা থেকে মহাদেব অবধি সকলে সুরাদেবীর উপাসক ছিলেন। নূতন আবিষ্কৃত শাস্ত্রীয় সুরা পেয়ে কতক লোক উন্মত্ত হয়ে পড়ল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে আমিও আধ ছটাক মাত্রায় পান করতে লাগলাম। কিন্তু, ও হরি, এ হল কি। রোগমুক্তির কথা দূরে থাক, অর্শ, অতিসার, দৌর্বল্য প্রভৃতি রোগগুলি অধিক মাত্রায় বাড়তে লাগল। তবুও মদ্যপান পরিত্যাগ করতে পারলাম না। ক্ষণিক যন্ত্রণার উপশমের জন্য পান করতাম। আবার সুরার এমনই একটি আকর্ষণী শক্তি আছে, একবার অভ্যাস করলে নিরূপিত সময়ে সুরা যেন মদ্যপকে অলক্ষ্য সূত্রে আপনার কাছে টেনে আনে।

এই সময় অমঙ্গল এবং বিপদগুলি যেন আমাকে ঘিরে আসছিল। একদিন সন্ধ্যার পরে বাংলোর ভেতর দিয়ে সদর বাংলোয় আসছিলাম। মাঝখানে একটা ছোট কুঠুরি ঘরের ভেতর দিয়ে পথ। আমি সেই কুঠুরি ঘরে পৌঁছোলাম, প্রায় ডান পায়ের কাছ দিয়ে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনলাম। কিসের শব্দ জানবার জন্য দু'তিন মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম, আর শব্দ শোনা গেল না, চলে গেলাম। দুই দিন

পরে প্রায় তিন হাত লম্বা খুব মোটা একটা গোখরো সাপ ঠিক সেই জায়গায় বাড়ির একজন লোককে মেরে ফেলল।

সেই সময় আমি নিতান্ত অর্থহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমার ষাট বছর বয়স অবধি নিজের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখতাম না। বাক্সের চাবিটা চাকরদের হাতে থাকত। জমা খরচের হিসাব রাখতেও বিরক্ত লাগত। চাকররা আমার মাইনের টাকা তহবিল হতে খরচ করত। যত্র আয় তত্র ব্যয় হয়ে যেত। আমি নিতান্ত অপরিণামদর্শী। মনে করতাম, এরূপ আয় চিরকাল থাকবে। বার বার অর্থকৃচ্ছ্রতায় পড়েও আমার চেতনা হত না।

ঢেঙ্কানালে আমার স্ত্রী মাইনের টাকাটা হাতে রাখছিলেন। যথাযথ খরচ করেও তাঁর বাক্সে প্রায় হাজার টাকা অবধি জমা হয়েছিল। প্রথম পুত্রটির জন্মের সময় সেই টাকাগুলি মনের আনন্দে ভোজ এবং দান ধ্যানে ব্যয় করে ফেলে অর্থহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমার স্ত্রী মিতব্যয়ী ছিলেন। বৃথা অর্থ ব্যয় করার সময় আমাকে বারম্বার উপদেশ দিতেন. 'তোমাকে সাহায্য করার মতো ডাইনে বাঁয়ে কেউ নেই। দুটো পয়সাও কারুর কাছ থেকে পাবার আশা রেখো না। অবশ্য প্রভু আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দিচ্ছেন। নিজের জন্য যথা যোগ্য খরচ করে অসহায় প্রতিবেশী অথবা যথার্থ দরিদ্রকে দান করার পর উদ্‌বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করা উচিত। নচেৎ ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হবেন। নিজের খাওয়া পরার কৃপণতা করে কিম্বা দরিদ্রদের সাহায্য না করে টাকা সঞ্চয় কদাপি মানুষের পক্ষে উচিত নয়।' একবার নয়, দুবার নয়, অর্থ ব্যবহার বিষয়ে আমার অবহেলা দেখলে পুনঃপুনঃ এই কথা তিনি বলতেন।

আমি সম্প্রতি আমার স্ত্রীর সমাধির সম্মুখে বসে এই কথাগুলি লিখছি। তাঁর দেওয়া উপদেশগুলি যেন সমাধির ভিতর হতে বেরিয়ে আসছে। আর আমি সেই কথাগুলি লিখে যাচ্ছি। শেষ বয়সে বিশ্বাসঘাতক চাকরগুলি আমাকে ঋণগ্রস্ত করে ফেলায় ষাট বছর বয়সের পরে স্ত্রীর উপদেশ অনুযায়ী আয় ব্যয়ের সমস্ত হিসাব নিজের হাতে রাখায় রক্ষা পেয়েছি। আমার স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় লব্ধ অর্থ এবং তাঁর নামে কিম্বা তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য যে সম্পত্তিগুলি করে ফেলেছিলাম তা থেকে সামান্য আয় আমার শেষ দুর্বল অসহায় জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল।

আমার প্রচ্ছন্ন শত্রু খানসামা তথাকথিত রাজার ব্রাহ্মণপুত্র এবং কাছারির

মহাফিসের নাম পূর্বে উল্লেখ করেছি। খানসামাকে বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করতাম। অনেকবার আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করেছি। সেও পাশা খেলতে আমার কাছে সময় সময় আসত।

পূর্ব কমিশনরের নিযুক্ত ঢেঙ্কানাল রাজার ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার মেজ্ এবং ওভারসিয়ার পদচ্যুত হয়ে যাওয়ায় আমাকে বিপদে ফেলে তামাসা দেখার জন্য খানসামা ও মহাফিস্ দুইজন মিলে আমার নামে কমিশনর সাহেবের কাছে বেনামীতে অভিযোগ পাঠাতে লাগল। দরখাস্তের মর্ম আমি বিচারপ্রার্থীদের কাছ হতে উৎকোচ গ্রহণ করি।

বেনামী অভিযোগ হাকিমেরা গ্রহণ করেন না। পরন্তু আমার নামের সঙ্গে জড়িত থাকায় অভিযোগের বিবৃতি বিষয় তদন্তের জন্য আ স্থ. রায় নন্দকিশোর দাস বাহাদুর এলেন। নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করায়, স্পষ্ট সাব্যস্ত হল দরখাস্তে লিখিত বিষয় সর্বৈব মিথ্যা। নন্দকিশোরবাবু এবং ম্যানেজার বনমালীবাবু দুইজন একত্রে কমিশনর সাহেবের সঙ্গে আমার বিষয় আলোচনার সময় বললেন, 'Phakir Mohon Baboo is a very honest man'. (ফকীরমোহনবাবু সাধু প্রকৃতির লোক)

কিন্তু সাহেব বললেন 'I have no faith in the man'—('লোকটির প্রতি আমার বিশ্বাস নেই।') কারণ আমি মহাত্মা জন বীম্‌সের নিযুক্ত লোক। বেনামী অভিযোগগুলি হয়ে যাওয়ায় একটি স্বনামী জীবন্ত মানুষ স্বয়ং কমিশনর সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়ে আমি তার কাছ হতে শত টাকা উৎকোচ নিয়েছি বলে অভিযোগ করল। সাহেব স্বয়ং তদন্ত করতে লাগলেন। আমি ন্যায়সঙ্গতভাবে তার মকর্দমাগুলি ডিস্‌মিস্ করে দেওয়ায় লোকটি আক্রোশ বশে আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে, তদন্তে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেল। ইংরেজ হাকিম সহজ ন্যায়বিচার করাতে অন্যথা করেন না। সেই অভিযোগকারী দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারায় অর্থাৎ মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য অভিযুক্ত হল। ম্যানেজার বনমালীবাবু পীড়িত হওয়ায় ছয় মাসের জন্য ছুটি নিলেন। অন্য আর একজন বাবু তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হয়ে এলেন।

হালের সরকারি দপ্তরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তাঁর ভাল করেই জানা ছিল। তিনি আবার অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি ভালো করেই বুঝতে পেরে-ছিলেন যে জন বীমসের দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারীদের দোষ দেখাতে পারলে তাঁর কর্ম-

দক্ষতা প্রকাশ পাবে। সুতরাং পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে। এরূপ সুযোগ সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজে পরিত্যাগ করার কথা নয়। তিনি আমার দোষ অন্বেষণ করতে লাগলেন। ম্যানেজারবাবু সর্বদা আমার বাসায় আসা যাওয়া করতেন। অনেক সময় একত্রে আহারাদি হত। তিনি যে অকারণে আমার বিরুদ্ধতা করবেন কোনভাবে আমার মনে উদয় হয় নি, কিন্তু আমার বোঝা উচিত ছিল, স্বার্থ কামনার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। বন্ধুত্ব বা ন্যায় পরায়ণতা তার পথ অবরোধ করায় সমর্থ হতে পারে না। বাবু রাধানাথ রায় সে সময় উৎকলের স্কুল বিভাগের জয়েন্ট ইনস্পেক্টর ছিলেন। গড়জাত সফরে বেরুলে যাওয়া আসার পথে তিনি আমার বাসায় কয়েকদিন থেকে যেতেন। তিনি ম্যানেজারবাবুর মনের ভাব কোন সূত্রে জানতে পেরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় আমি তার কিছু আভাস পেয়েছিলাম।

ঠিক সেই সময় শিকার কিভাবে করতে হয় দেখাবার জন্য রাধানাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গেলাম।

একটা জঙ্গল ঘেরাও করা হল। কয়েকজন সঙ্গী শিকারী স্থানে স্থানে ঘাটি পাহারা দিতে বসে গেল। বাঘ কিম্বা ভালুক শিকার করতে হলে গাছের উপরে থেকে মাঁচা বেঁধে উঁচু জায়গায় কিম্বা পাহাড়ে জায়গায় শিকারীকে প্রচ্ছন্ন ভাবে বসতে হয়। দৈবাৎ সেদিন বসবার মতো উপযুক্ত স্থান পেলাম না। রাধানাথ বাবু ও আমি দুইজনে একটা ক্ষুদ্র বনের মধ্যে ভূমিতে বসে রইলাম। কালুয়ারা (বন্য জন্তু দেখানো লোকেরা) সম্মুখস্থ জঙ্গলের এক মাইল দূর হতে জঙ্গল পিটতে পিটতে এলো। একটি ভয়ঙ্কর অতি বৃহৎ ভালুক আমাদের সম্মুখে প্রায় পাঁচ ছয় হাত দূরে বেরিয়ে পড়ল। আমরা যে জায়গায় বসেছিলাম, ঠিক সেই পথ দিয়ে পালানো সেই ভীষণ পশুর লক্ষ্য ছিল। আমাদের উপর এসে পড়ার আধ মিনিট বা তার চেয়েও কম সময় ছিল। ভালুকের শব্দ পেয়েছিলাম, কিন্তু লক্ষ্য ছিল দূরে। এত কাছে ভাল্লুক আছে বলে জানতে পারি নি। ভালুককে দেখে বন্দুক তুলেছি ভালুকও আমাদের দেখে জঙ্গলের ভিতর লোকচক্ষুর বাইরে চলে গেল। সে সময়ের অবস্থা এমন হয়েছিল যে ভালুকের আক্রমণ এবং আমার বন্দুক চালনা এক সঙ্গে কিম্বা দুচার সেকেণ্ড আগে পরে হতে পারত। উৎকলে রাধানাথ গ্রন্থাবলী বেরুবার কথা, তুচ্ছ ভালুকটা কি তা রুখতে পারে? রাধানাথ বাবুর পুণ্য বলে এই ক্ষুদ্র লেখকটিও রক্ষা পেয়ে গেল। সময়ের অনুপযোগী

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ স্থানে আরেকটি দিনের ঘটনা লিখব। পাঠক আপনি এই পুস্তকে অনেক জায়গায় সময়ের অনুপযোগী ও অপ্রাসঙ্গিক বিবরণ পাবেন।

রেলগাড়ি চলার পূর্বে লোকে ক্যানেল ষ্টিমার যোগে কটক, বালেশ্বর যাওয়া আসা করত। সে সময় আমি দশপল্লার দেওয়ান ছিলাম, ছুটির সময় বাড়ি আসছিলাম। রাধানাথবাবু মফঃস্বল সফর হতে তাঁর প্রধান কর্মস্থান কটকে ফিরে আসার কথা, আমারও অবকাশ সময় সমাপ্ত, কর্মস্থানে যাব। দৈবক্রমে বালেশ্বরের নদী ষ্টিমার ঘাটে উভয়ের সাক্ষাৎ হল। পূর্বাহ্ণ প্রায় দশটার সময় ষ্টিমারে বসে কটক যাত্রা করলাম।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর, ষ্টিমার মতাই নদী পার হয়ে যেই ধামরা নদীতে'প্রবেশ করেছে, ঘোর বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় তুফান শুরু হল। ঘড়িআমাল নদীর উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ক্ষুদ্র ক্যানেলের ষ্টিমার অস্থির বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। এই ডুবল, এই ডুবল, আরোহীরা ভয়ে কাতর। ঘড়িআমাল স্বতন্ত্র নদী নয়, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, সালন্দী, মতাইয়ের সমুদ্র মোহানার সঙ্গে সঙ্গমস্থলের নাম হল ঘড়িআমাল। মাঝিরা এই স্থানটিকে বড় ভয় করে। তাদের মধ্যে একটি কথা চলিত আছে: 'পার যদি হোস্ ঘড়িআমাল আর সব নদী—'। আবার পৃথিবীর সমস্ত কুমীরদের এইটা যেন ঘাট স্থান। লোকে বলে 'মতাই নদীকে পেত্যয় না যায় পাড়ের ফাটলে কুমীরে খায়।' এইটা হোল মতাইয়ের মোহানা। রাধানাথবাবু ও আমি দুইজন মাত্র সেকেণ্ড ক্লাশ প্যাসেঞ্জার ছিলাম। কেবিনের ভিতর আর কেউ নেই। রাধানাথবাবু ত একেবারে জীবনের আশা পরিত্যাগ করে বসে আছেন। সে সময় তাঁর স্বরূপটি সুস্পষ্টভাবে এখন পর্যন্ত আমার অন্তরে চিত্রিত হয়ে আছে। শীত করছে বলে পরনের কাপড়ের কোঁচা খুলে গায়ে জড়িয়ে দিলেন। কিছু আফিম তাড়াতাড়ি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ফেললেন। সতেরো আঠারো বছর বয়সের সময় তাঁর যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ হয়েছিল। যাবজ্জীবন নিয়মিত ভাবে আফিম সেবন করার জন্য ডাক্তার কবিরাজেরা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাধানাথবাবু যেন সম্পূর্ণভাবে জীবনের আশা পরিত্যাগ করে কেবল ষ্টিমার ডোবার মুহূর্তটির অপেক্ষা করে নির্জীব ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ষ্টিমারের কোনো দিক্ হতে কোনো শব্দ পেলে শুনে চমকে উঠে সেই দিকে তাকাচ্ছিলেন। সেই দিক থেকেই যেন ষ্টিমাব ডুবল। সময় সময় অর্থহীন ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখছেন। তাঁর গায়ে কাপড় জড়াতে আর

কাপড়ের খুঁটে সেরকম সময়ও আফিম বাঁধতে দেখে আমার একটু হাসি পেয়েছিল। আমরা ত এখন জলে তলিয়ে যাব, গায়ে কাপড় জড়িয়ে আর কি হবে। রাধানাথ বাবুর 'মহাযাত্রা' লেখা বাকি ছিল, সুতরাং তাঁর মহাযাত্রা হল না। আমিও তাঁর পুণ্যের জোরে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম, একথা লিখে পাঠক মহোদয়কে জানানো নিষ্প্রোয়জন।

কেবল এইবার নয় প্রভুর প্রসাদে আমি অনেকবার মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা পেয়েছি। তার হিসেব দিচ্ছি। তিনবার গোখরো সাপের ছোবল হতে, একবার অরণ্যের মত্ত হস্তীর আক্রমণ হতে, দুইবার ভালুকের আক্রমণ হতে, একবার বন-গয়ালের পাল হতে, একবার মানুষের তীর হতে, একবার মানুষের হাতের খাঁড়া হতে, একবার বিষ পান, দুইবার জাহাজ ডুবি হতে রক্ষা পেয়েছি।

ঢেঙ্কানালে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারি (৪)

এই সুযোগে অন্য আরেকবার জাহাজ ডুবি আর বিষপানের কথাটা লিখে ফেলি। কালের অনুপযোগী ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন রূপ উৎকট দোষগুলি পাঠক মহোদয় এই পুস্তকে অনেক স্থানে দেখতে পাবেন। পূর্বে এই কথা আপনাদের জানিয়ে দিয়েছি।

১৮৬৭ অথবা ৬৮ সালে প্রথমবার আমার কলকাতা যাত্রার কথা। সেই সময় বালেশ্বরনিবাসীরা স্টিমারের নাম মাত্র শুনেছিল। বালেশ্বরের নদীকে তখনও স্টিমার স্পর্শ করে নি। বালেশ্বরবাসীরা প্রশস্ত জনপথ দিয়ে যাওয়া আসা করত। বালেশ্বর হতে কলকাতা ছিল ছয় দিনের পথ। আমি আর গ্রাম-বাসী অন্য তিনজন এরূপ চারজন একত্র কলকাতা যাচ্ছিলাম; যাবার সময় গোরুর গাড়ির ঝাঁকুনি আর চটি বাড়িতে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করা বিশেষ কষ্টকর ছিল। ফেরার পথে জনপথ দিয়ে না এসে বালেশ্বর শহরবাসী একজন মহাজনের একটি বালেশ্বরী জাহাজ বালেশ্বরে যাচ্ছে দেখে, সেই জাহাজে চড়ে বালেশ্বর রওনা হলাম। গঙ্গানদী অতিক্রম করে সমুদ্রে পড়তে তিন দিন লাগল। চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গাসাগরের বাতিঘরের সামনা সামনি জাহাজ নোঙর করে রইল। মাঝ রাতের সময় বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় শুরু হল। দশ-বার হাত উঁচু সমুদ্রের ঢেউগুলি এসে জাহাজটাকে একটা সামান্য সোলার খোলার মতো দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। দুটি নোঙর জাহাজটাকে ধরে রাখতে পারছিল না। এক এক সময় ঢেউয়ের মাথায় জাহাজখানি উঠে আবার দশহাত গভীর জলে পড়ে যাচ্ছিল। বার বার জাহাজের খোলে জল ঢুকে যাচ্ছিল। নীচে পড়ে যাবার সময় মনে হচ্ছিল, এইবার জাহাজ রসাতলে গেল, আর উঠবে না। পরের মুহূর্তে তাল গাছের মতো উঁচু জলের উপর ভেসে উঠছিল। সেই সময় মাঝি খালাসি টেণ্ডল প্রভৃতি জাহাজের কর্মচারীরা জাহাজ রক্ষা বিষয় নিরাশ হয়ে কেবল হাত জোড় করে চিৎকার করছিল। মা ঝাড়েশ্বরী, বাবা কদমরসুল, হে দরিয়া পীর, রক্ষা কর রক্ষা কর, প্রাণ বাঁচাও। আরো ঢের দেবদেবীর নাম ধরে চিৎকার

করছিল। বোধহয় তাদের অভিপ্রায় সব দেবতাদের ডাকলে তাদের মধ্যে হয়ত কেউ একজন রক্ষা করবে। আমি জাহাজের পাটাতনের উপরে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে জাহাজের গতি এবং মাঝি খালাসিদের ব্যাকুল অবস্থা নিরীক্ষণ করছিলাম। মনে ভাবছিলাম মরে গেলে কোথায় কি ভাবে যাব এখন তাই দেখা যাবে।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলে আমার সঙ্গে গিয়েছিল, সেই সময় সে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। সেই ছেলেটাকে দেখে আমি কাতর হয়ে পড়লাম। ছেলেটা ছিল তার মাতার একমাত্র সন্তান, কলকাতা যাত্রার সময় তার মা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পুত্রের হাত ধরে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। বিদেশে আমি ছেলেটির সহায় হব বলে বার বার অঙ্গীকার করেছিলাম।

সে কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম হায় হায়। ছেলেটাতো এখন মরে যাবে, তার মা শুনলে কত কাঁদবে। প্রভুর কৃপায় হঠাৎ তুফান বন্ধ হয়ে গেল। ঝড় জল যদি আর ঘন্টাখানেক স্থায়ী হত, জাহাজ রক্ষা পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

১৯০৯ সাল জুন কিম্বা জুলাই মাস। একদিন সকালে আমার উদর পীড়ার উদ্রেক হয়ে তিনচার বার মল নিঃসরণ হল। আমার গোমস্তা পূর্বে শুনেছিলেন, এরূপ অবস্থায় গন্ধক সেবন করলে পেটের অসুখ ভাল হয়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশী সরকারি উকিল এবং জমিদার ভূয়াঁ আব্দুল সোভান খাঁর বাড়িতে গন্ধক দ্রাবক থাকত। সেখান থেকে পীড়িত লোকেরা নিয়ে সেবন করত। অজীর্ণ জনিত উদরাময় গন্ধক দ্রাবক সেবন করলে আরোগ্য লাভ হয়। কিন্তু কত মাত্রায় এবং কিরূপ ভাবে সেবন করতে হবে, একথা তার জানা ছিল না। আমার একটি প্রিয়তম নাতি এবং গোমস্তা দুইজন ভূয়াঁর বাড়ি থেকে আন্দাজ একছটাক গন্ধক দ্রাবক নিয়ে এল।

আমি বাড়ির ভিতর একটা পালঙ্কের উপর শুয়ে একটি বই পড়ছিলাম। গোমস্তা উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি চোখ বুজে এই ঔষধের সবটা টপ্ করে খেয়ে ফেলুন, সাবধান থাকবেন, যেন দাঁতে না লাগে।

সে সময় হতে প্রায় চল্লিশ বছর উর্ধ্ব হবে আমি এলোপ্যাথিক ঔষধ পরিত্যাগ করেছিলাম। সম্প্রতি গোমস্তাদত্ত ঔষধ দেশি কি বিলিতি কোত্থেকে এল কে দিল কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। বই পড়ায় মন লেগে গিয়েছিল, কোনরকমে

ঔষধটি খেয়ে নিয়ে পড়ায় মন দেব এই ইচ্ছা। গোমস্তার মুখের দিকে না চেয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঔষধের পেয়ালাটা হাতে নিলাম। উঠে বসে এক ভরি আন্দাজ পান করেছি। বোধ হল যেন কি এক অগ্নিময় তরল ধাতুস্রোত একটা প্রবল বেগে কলিজা পর্যন্ত ছুটে গেল। সর্বাঙ্গ জ্বলন্ত অগ্নিতে ভাজা হচ্ছে মনে হল। চিৎকার করে পালঙ্কের উপর হতে নীচে লাফিয়ে পড়লাম। মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছি, কয়েকবার মাত্র চীৎকার করেছি, স্বর বন্ধ হয়ে গেল, চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলাম। একটা আশ্চর্য ঘটনা—আমি যে ঘরে শুয়েছিলাম, মাঝখানে একটা ঘর ব্যবধান ছিল। আরেকটি কুঠুরির মধ্যে পালঙ্কে আমার পুত্রবধূ অর্ধনিদ্রিত ভাবে শুয়েছিলেন। তিনি ঠিক সেই সময়ে স্বপ্ন দেখলেন আমি বিষ খেয়েছি তিনি (পুত্রবধূ) আমার ছেলেকে এ কথা টেলিগ্রামে জানাচ্ছেন। আমার পুত্র [মোহিনীমোহন] সে সময় বিহার অঞ্চলে অ্যাসিস্‌টেন্ট সেট্‌ল্‌মেন্ট অফিসার ছিলেন। চিৎকার শুনে বৌমা আমার কাছে ছুটে এলেন। আমার অবস্থা দেখে ডাক্তারদের ডেকে আনতে পাঁচ-সাত জন লোককে ছোটালেন। যে ডাক্তার যে স্থানে যে ভাবে বসে থাকবেন, সে স্থান হতে অতি শীঘ্র ডেকে আনার জন্য প্রেরিত লোকের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হল। আধ ঘণ্টার মধ্যে বালেশ্বরের সমস্ত ডাক্তার উপস্থিত হলেন। কেবল একজন বিচক্ষণ অ্যাসিস্‌টেন্ট সার্জেন চিকিৎসায় নিযুক্ত রইলেন আর সকল ডাক্তার তাঁদের প্রাপ্য দর্শনী নিয়ে চলে গেলেন।

আমি বিছানায় অজ্ঞান অবস্থায় মুখ বুজে পড়েছিলাম। হাঁ করতে কষ্ট বোধ হচ্ছিল। জিহ্বার অগ্রভাগ হতে কলিজার অর্ধভাগ পর্যন্ত গভীর ক্ষত হয়ে গেছে বলে ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন। সময় সময় পেটের ভিতর হতে টুকরো, টুকরো মাংস মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল।

কণ্ঠনালীতে ঘা হয়েছিল। অল্প পরিসর একটি ছিদ্র মাত্র ছিল। ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুসারে দুবেলা দুটো মুরগীর ডিমের হরিদ্রাবর্ণের কুসুম আমার আহার রূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল। পনেরো দিন অবধি সেই কুসুম মাত্র ছিল পথ্য এবং ঔষধ। সেই কুসুমটুকু খাওয়াও কষ্টসাধ্য ছিল। পান করার সময় কষ্টবোধ হত, আবার পান করার পর অনেক সময় অবধি কণ্ঠ ও কলিজা জ্বালা করত। বউমা অনেক সাধ্য সাধনা করে ডিমের কুসুমটুকু খাইয়ে দিতেন। তাছাড়া আর কেউ খাওয়াতে পারত না।

কোন কোন দিন নিতান্ত সাধ্য সাধনা করে আমি না খেলে বধূমাতা আমাকে ধমক দিয়ে বলতেন, 'আপনি ওষুধ খাচ্ছেন না। আমি এক্ষনি ডাক্তার বাবুকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব।' ডাক্তার বাবু এসে আমার কান কাটবেন না আমি জানি, কিন্তু না খেলে মেয়েটা বসে আমাকে নিতান্ত বিরক্ত করবে। কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে কতগুলো কথা বলবে। এর থেকে উদ্ধার পাবার জন্য, দুই তিনজন লোকের সাহায্যে অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে উঠে বসতাম, অত্যন্ত কষ্টে একটু কুসুম খেয়ে নিতাম। এই অবস্থায় আরেকটা উপসর্গ দেখা দিল। গন্ধক দ্রাবক পান করার সময় বোধ করি এক ফোঁটা দ্রাবক কোন প্রকারে ডান হাতের চেটোয় পড়ে গিয়েছিল। চেটোয় আধ ইঞ্চি পরিমাণ একটি ছিদ্র হয়ে গেল। তার থেকে পুঁজ বেরুচ্ছিল। দুবেলা অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জেন এসে ঘা পরিষ্কার করে পটি বেঁধে দিয়ে যেতেন।

জননীর ক্ষুদ্র শিশুকে পালন করার ন্যায় বধূমাতা সে সময়ে আমাকে রক্ষা করেছিলেন। আমার মুখ বন্ধ নেত্র মুদ্রিত। প্রস্রাব করতে হলে দুই তিনজন লোক অতি সাবধানে উঠিয়ে বসাত। দুই তিনজন চাকর কাছে উপস্থিত থেকে হাওয়া করত। মুহূর্তের জন্য পাখা বন্ধ হলে সর্বাঙ্গ জলে উঠত। দূরের অন্য গ্রাম থেকে কতক বন্ধু বান্ধব আমাকে দেখতে আসতেন। তাঁদের আতিথ্য করার জন্য ঘরে অন্য কোন আত্মীয়পরিজন ছিল না। প্রাতঃকাল হতে রাত দশটা অবধি বধূমাতাকে অতিথিচর্যা করতে হত। তারই ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে এসে আমার খবর নিয়ে যেতেন। রাত দশটার পরে সকলে শয়ন করার পর পাখা করার চাকররাও শয়ন করত। বধূমাতা অনেক রাত্রে নিজে পাখাটি হাতে নিয়ে ভোর অবধি আমাকে হাওয়া করতেন।

শেষ রাত্রে পাখা করতে করতে তাঁর মাথা মেঝেতে ঢুলে পড়ত। তাঁর সে সময়ের অবস্থা দেখে আমার মনে কষ্ট হত। হাওয়া করা বন্ধ করতে বলার আমার শক্তি ছিল না। হাত দিয়ে সঙ্কেত করে বলার পক্ষেও হাত অবশ। বধূমাতা কেবল শারীরিক শক্তি দিয়ে নয়, ডাক্তারের দর্শনী হিসাবে তাঁর ক্ষুদ্র বাক্স থেকে শতাধিক টাকা বার করে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ সে সময় আমি স্বাস্থ্য সামর্থ্য অর্থ সর্ব বিষয়ে নিঃসম্বল হয়ে পড়েছিলাম। ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় অচেতন ভাবে শয্যায় পড়ে থাকতাম। দক্ষিণ হাত পুড়ে যাওয়াতে ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে বৌমা সামান্য দুধ খাইয়ে দিতেন। অনেকদিন অবধি কণ্ঠনালী দুর্বল

থাকায় পান করার শক্তিও ছিল না। কেবল আমার জন্য বৌমা এরকম করেছিলেন তা নয়, গ্রামের প্রতিবেশীদের মধ্যে শিশুসন্তানদের এবং দরিদ্র অসহায় লোকদের পীড়ার সময় তিনি বিনা আহ্বানে উপস্থিত হয়ে পীড়িতের সেবাশুশ্রূষার ভার গ্রহণ করতেন। রোগীদের প্রতি তাঁর কিরূপ সহানুভূতি ছিল, সেই বিষয়ে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতে চাই।

আমাদের বাড়িতে একটি বৃদ্ধা দাসী ছিল। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে সে একটি সামান্য কুঁড়ে বেঁধে বাস করত। সে ছিল দরিদ্র এবং অসহায়। তার সময় সময় বাত জ্বর হত। সে সময় সে অচেতন হয়ে থাকত। বিছানায় প্রস্রাব এবং বমি করত। পীড়ার সময় তাকে দেখতে বধূমাতা আমার অনুমতি নিয়ে তার দোরে যেতেন। দিনের বেলা গাঁয়ের পথে লোক চলাচল থাকায়, তার দোরে যাবার উপায় থাকত না। রাত্রি নয়টার পর গ্রামের পথ নির্জন হলে একটি দাসীকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে উপস্থিত হতেন। তা আবার অন্ধকারের মধ্যে যেতে হত। লণ্ঠনের আলো নিয়ে পথে বেরুতে তিনি লজ্জাবোধ করতেন। রোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে বমি প্রস্রাবের ভিজে কাপড়গুলি বার করে দিয়ে শুকনো কাপড় পরিয়ে দিতেন। ঘর পরিষ্কার করে জায়গায় জায়গায় ঝাড়-পোছ ও নিকিয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বিছানা পেতে দেওয়া ইত্যাদি সব কাজ করতেন। ঘৃণা করবে বলে দাসীকে সে সব কাজ করতে দিতেন না। আফিম, চা, সাগু প্রভৃতি তৈরি করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। রোগিনী আরামে শুলে ঔষধ পথ্য তাকে খাইয়ে দিয়ে তার গায় হাত পায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বহু সান্ত্বনার কথা বলে ঘরে ফিরতে প্রায় ঘণ্টাদুই গত হয়ে যেত। কেবল সেই দরিদ্র বিধবা নয়, আরো অনেক অসহায় বিধবা তাঁর কাছে সাহায্য পেত।

সাধারণত আপন পুত্রবধূর গুণ গাওয়া অবশ্য শোভনীয় নয়। তথাপি সেই সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশজাত কন্যাটি[১] এরূপ গুণবতী যে, তাঁর বিষয়ে দুই চার কথা না বলে স্থির থাকতে পারছি না। তিনি তেমন বিদুষী নন। কলিকাতা বেথুন স্কুলের এণ্ট্রান্স পাশ, সেই অনুযায়ী সংস্কৃত বাংলাভাষায় শিক্ষিতা। আমার ঘরে এসে ওড়িয়া ভাষাটাও শিখে ফেলেছেন। কণ্ঠসংগীতে হারমোনিয়াম

১ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য সাধু রজনীকান্ত ঘোষের চতুর্থা কন্যা হিরণপ্রভা।
—অনুবাদিকা

বাদ্যে সূচীকর্মে বিশেষ নিপুণা। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য বিশেষত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করায় সিদ্ধহস্ত। শিল্পকার্যে নিপুণতা হেতু অনেক প্রদর্শনীতে সার্টিফিকেট এবং রৌপ্যপদক পেয়েছেন। যে সকল গুণের জন্য বধূরা আদরণীয়া বংশের শোভা হন, সে সমস্ত গুণের তাঁর কিছুমাত্র অভাব নেই। ঘরের প্রত্যেক লোক, দাসদাসী অবধি শয্যা ত্যাগ করার পূর্বে উঠে ঘোর দোর পরিষ্কার করে বাসি কাজ সেরে ফেলেন। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করা আমার অভ্যাস ছিল। কিন্তু আমার ওঠার পূর্বে বধূমাতা শয্যাত্যাগ করে বাসি কাজকর্ম সেরে না ফেলতে কখনও দেখি নি।

শয্যাত্যাগ হতে রাত্রি দশটা অবধি নিরলস ভাবে নানা কাজে নিযুক্ত থাকা তাঁর অভ্যাস। সর্বদা পাচক ও দাসদাসী উপস্থিত থাকলেও প্রত্যেক খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন। দুপুর বেলাটা সেলাইকল চালানো এবং সেলাইয়ের কাজে তাঁর অতিবাহিত হয়। সন্ধ্যার পর তাঁর উপাসনা, নানারকম পুস্তকপাঠ, সংগীতচর্চার সময়।

গ্রামের অতি সামান্য ঘরের স্ত্রীলোকদের প্রতিও যথাযোগ্য সম্মান দেখান এবং কোমলভাবে কথাবার্তা বলেন। তাঁর নামের তুল্য চরিত্রটিও হিরণপ্রভাময়। তাঁহার পিতা একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম এবং পূর্ববঙ্গে ঋষিতুল্য সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

প্রতিদিন সকালসন্ধ্যা দুই বেলা অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন এসে রোগের অবস্থা পরীক্ষা করে যেতেন, প্রতিবার দর্শনীর টাকা বধূমাতার ক্ষুদ্র হাতবাক্স হতে বেরোত। প্রত্যেকবার ডাক্তার রোগপরীক্ষা করার সময় উপস্থিত আত্মীয় বন্ধুরা তাঁর মুখ পানে চেয়ে থাকতেন, কিন্তু ডাক্তারের নৈরাশ্যভাব ও শুষ্ক মুখ দেখে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে কারোর সাহস হত না। আমিও ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে নিজের অবস্থা বুঝতে পারতাম। সাত আট দিন পরে যে আমার মৃত্যু অবধারিত এ কথা বুঝতে পারলাম। সেই সময় একদিন বিকেল বেলা বালেশ্বরের অন্যতম প্রধান জমিদারবাবু ভগবানচন্দ্র দাস এবং আরো কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন আমাকে ঘিরে বসলেন, আমার ধারণা হল, আমার মৃত্যুর পর পুলিস এসে যাঁরা বিষ এনে দিয়েছিলেন তাদের হয়রান করবে। সেই লোকেদের ভবিষ্যৎ অবস্থা কল্পনা করে আমার মনে দুঃখ হল। আমার বিছানার কাছে কাগজ পেন্সিল রাখা ছিল। আমার কোন কথা লোকদের

জানানোর আবশ্যক হলে তাতে লিখে দিতাম। এক একটি করে লিখতে বড় কষ্ট হত।

সম্প্রতি আমার সম্মুখে উপস্থিত ভগবানবাবু ও অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের নাম লিখে তার নীচে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলাম, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে, ইহা আকস্মিক ঘটনা।'

এই কয়েকটি কথা লিখে দিয়ে কিছু শান্তি পেলাম, মনে ভাবলাম, মুমূর্ষু লোকের লেখা আদালতে গ্রহণীয় হবে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কেবল যন্ত্রণাটা সময় সময় অসহ্য হয়ে পড়ছিল। সে সময়ে

"মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয়
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ।
আগমা পায়িনো নিত্যং
তান তিতিক্ষস্ব ভারত।"

গীতার এই শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ মনের মধ্যে পাঠ করে ধৈর্যাবলম্বন করতাম। মনে এই ভাবের উদয় হত, এই রোগ এসেছে চলে যাবে। বর্তমানে ধৈর্যাবলম্বন আবশ্যক।

পনেরোদিন গত হলে একদিন ডাক্তার খুব আনন্দিত হয়ে বললেন, 'এখন আর কোনো চিন্তা নাই, আমার আসার আর প্রয়োজন নেই।' ডাক্তার ছেড়ে দিলেও আমার শয্যা ত্যাগ করতে দুই মাস লেগেছিল। ডাক্তার ছেড়ে গেলেন; কিন্তু বৌমা ছাড়লেন না। একটা চামচেতে অতি সন্তর্পণে অল্প অল্প দুধ খাইয়ে দিতেন। কতদিন পরে রুটিমেশানো দুধ, মাস খানেক পরে অন্ন স্পর্শ করলাম।

আমার জীবনে বিশেষ বিপদ প্রধান প্রধান দুর্ঘটনাগুলি একত্র করে লেখার জন্য পরবর্তী কতক ঘটনা পূর্বেই লিখে ফেললাম। এখন আমার জীবনের যে সময়ের কথা লিখলাম সেগুলি বহু পরের ঘটনা। এইবারে যে কথা চলছিল লিখি।

ঢেঙ্কানলে আমার দ্বিতীয় পুত্রটি[১] জাত হল। রামায়ণ লেখা পূর্বের ন্যায় চলছিল। রোগ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। দিন রাত বিছানায় পড়ে থাকি। দেহের ছায়ার ন্যায় আমার স্ত্রী সর্বদা বিছানায় বসে দেহে হাত বুলোতেন।

১ দার্শনিক নিরীশ্বরবাদী মৌলিক চিন্তাসম্পন্ন মোহিনীমোহন সেনাপতি। কটক রেভেনশ কলেজের অধ্যাপক।

কেবল কষ্টে-সৃষ্টে অল্প সময়ের জন্য উঠে কাছারিতে যেতাম। কোন প্রকারে কাছারির কাজ শেষ করে বাড়ি চলে আসতাম। এই সময়ে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে নানাপ্রকার মামলামকদ্দমা নিয়ে অকারণ বিরক্তিকর চিঠি পত্রের আদান-প্রদান চলছিল। ম্যানেজারবাবু পূর্বের বন্ধুত্বের কথা ভুলে গিয়ে সম্প্রতি বিশেষ উদ্দেশ্য পোষণ করছিলেন। আমাকে কোনরূপে কলঙ্কিত করিয়ে আপনার পদোন্নতি করিয়ে নেবেন এটাই সম্প্রতি তাঁর লক্ষ্য।

আমি জীবনব্যাপী কার্যকারণ সম্বন্ধজনিত ঘটনা পরম্পরার সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করে দেখেছি। মানবকূলে প্রকৃত কেউ কারও শত্রু বা মিত্র নয়। স্বার্থ ও অবস্থা বিপাকে মানবচরিত্র রূপান্তর ধারণ করে। বস্তুত এ এক প্রত্যক্ষীভূত বিষয়। যথা এক অলক্ষ্য অমোঘ হস্তদ্বারা মানুষের ভাগ্যচক্র চালিত হচ্ছে, মানবের পুরুষকার সেখানে পরাভূত। আরো একটি কথা, পৃথিবী রঙ্গভূমি বিশেষ, মানব সেখানে অভিনেতা। সূত্রধর নেপথ্যে থেকে বিভিন্ন মানব দ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে অভিনয় করিয়ে নিচ্ছেন। সর্ববিষয় চিন্তা করে আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। শত্রু বলে কাউকে ঘৃণা করা বা তার প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হওয়া আমাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কার্য নয়। সর্বত্র সর্ব সময়ে নাষ্য উপায়ে আত্মরক্ষা করা মানবের পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমি কাজে অক্ষম হয়ে পড়লাম। ছয় মাসের ছুটি নিয়ে বালেশ্বরে চলে এলাম। আমার এই দুর্ভাগ্যের সময়ও ম্যানেজারবাবু আমার অনিষ্টসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। তার উপর আমার অনুপস্থিতির সুযোগ তিনি পেয়ে গেলেন। আমার একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ তাঁর নজরে পড়ল।

পূর্বকথিত বউলপুর মৌজাস্থিত একটি জলের খালের উপর বাঁধের স্বত্বের দাবির মামলা নিষ্পত্তি করেছিলাম। সেই মামলার আপিল হল। উপর আদালতে নথি পাঠাবার সময় রায়ের কাগজটি ত্বরিত লেখার হেতু আমি নিজে অনেক জায়গায় কাটাকুটি করার ফলে অক্ষর বোধগম্য না হওয়াতে আমি সেই কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে রায়টি পরিষ্কার করে আর একটি কাগজে লিখে দিলাম। অবশ্য লেখার বিষয়বস্তু কোন জায়গায় বদলাই নি। যা লেখা ছিল কেবল ঠিক সেই কথাগুলি নকল করে দিয়েছিলাম।

আমি মকদ্দমা নিষ্পত্তির অনেকদিন পরে রায় লিখি এবং অকুস্থলে না গিয়ে সরজমিনে তদন্ত করেছি বলে রায়েতে উল্লেখ করি—এই দুটি মহা অপরাধের কথা উল্লেখ করে ম্যানেজার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবকে অফিসে রিপোর্ট করলেন, এবং তার প্রমাণ স্বরূপ উক্ত মামলার নথিটি পাঠিয়ে দিলেন।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের অফিস হতে কৈফিয়ত তলবের চিঠি বালেশ্বরে উপস্থিত হল। সে সময় আমি শয্যাগত। আমার পরম হিতৈষী বন্ধু রায় নন্দ কিশোর দাস বাহাদুরের গোপনীয় চিঠির পরামর্শ অনুসারে চাকরিতে ইস্তফা দিলাম।

ব্যাধি এবং বিপদ যেন বাল্যকাল হতে আমার পিছু পিছু ধাওয়া করে আসছে। সুখ সৌভাগ্যেরও অভাব নেই। দারিদ্র্য ও অর্থস্বাচ্ছল্য, সুখ্যাতি ও অখ্যাতি, স্বাস্থ্য ও ব্যাধি যেন পালা করে অনুসরণ করছে। চাকরি হওয়া ও আবার চলে যাওয়া আমার জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। চাকরির বেতন, রাজাদের কাছ হতে প্রাপ্ত পুরস্কার ও নানা প্রকার ব্যবসা হতে সময় সময় অনেক অর্থ হস্তগত হত। আবার সময় সময় একেবারে কর্পদকহীন হয়ে পড়তাম। আমেরিকাবাসী একজন মহাপণ্ডিত বলেছেন, 'অর্থ উপার্জন করা হচ্ছে হাটে যাওয়ার মতো সহজ কথা। কিন্তু উপার্জিত অর্থ সামলে রাখা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই।' সত্যকথা, অতি সত্যকথা। অবশ্য কুকার্যে আমার অর্থ নষ্ট হয় নি। অন্যের উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করা, অর্থাৎ পরের কাছে অর্থ গচ্ছিত রাখা, আমার সাময়িক অভাবের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলতঃ জীবনকালে এত উত্থান এত পতন পর্যায়ক্রমে এত অধিক পরিমাণে ঘটা সচরাচর মানবজীবনে বিরল।

ঢেঙ্কানল হতে চলে এসে বালেশ্বরে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি। পীড়াগুলি সমানভাবে দেহে ক্রিয়া করছিল। সেইসময় জ্যাঠতুত ভাই নিত্যানন্দ সেনাপতির একমাত্র পুত্রের বিবাহের সময় উপস্থিত হল। নিত্যানন্দ সেনাপতি সে সময় উম্ব নামক মাহালের সেরেস্তাদার ছিলেন, সুতরাং তাঁর অর্থের কোন অভাব ছিল না। আমরা একান্নবর্তী পরিবার ছিলাম। ভাইপোর বিবাহে আমারও অর্থ সাহায্য করা উচিত, কিন্তু তখন আমার অর্থাভাব। আমার স্ত্রীকে বললাম। তিনি ছয়শত টাকার কতকগুলি নোট রেখেছিলেন, আমি বলা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিলেন। হা স্বর্গগতা দেবী! যতই কষ্টকর হোক তিনি আমার কথার কখনও প্রতিবাদ করেন নি। আমার আদেশ পালন তাঁর জীবনের ব্রত ছিল।

এই সময়টা আমার জীবনে বড় কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। রোগের প্রাবল্য হেতু শারীরিক যন্ত্রণা, পারিবারিক বিশেষ কোন ঘটনার জন্য অধিক মানসিক কষ্ট, অধিকন্তু অর্থাভাব, সর্বপ্রকার দুর্যোগ সব একত্রে উপস্থিত হয়েছিল। কেবল আমার নিঃস্বার্থপর পত্নীর অক্লান্ত সেবা ও তাঁর সান্ত্বনাদান হেতু জীবনমাত্র ধারণ করে ছিলাম। সৌভাগ্যের সময় আমার সামান্য পীড়ার উদ্রেক হলে কত বন্ধু বান্ধব এসে ঘিরে বসত। মধুময় প্রস্ফুটিত পুষ্পকেই না মধুপ বেষ্টন করে থাকে এখন মধুহীন পর্যুসিত পুষ্প ভূমিতে পড়ে আছে। আমার সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ সকল অবস্থার সহায় ছিলেন একমাত্র নিঃস্বার্থপর বন্ধু বালেশ্বরের নর্মাল স্কুলের হেডমাস্টারবাবু গোবিন্দচন্দ্র পট্টনায়ক। তাঁর অবসর সময়ে আমার পাশে বসে সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা আমার মনোরঞ্জন করতেন।

মানবের বিশেষত আমার কোনো অবস্থাই চিরস্থায়ী হত না। ক্রমশ রোগের প্রাবল্য হ্রাস হতে লাগল। উঠে ঘোরাফেরা করতে পারতাম। রামায়ণ সাতকাণ্ড লিখে ফেলে মহারাজ (সে সময় কুমার) বৈকুণ্ঠনাথ দের পরামর্শে মহাভারত লেখা আরম্ভ করে দিয়েছি। সারাদিন তিন চার ঘণ্টা বসে মহাভারত অনুবাদ করি। সেই সময়টা পরম সুখে অতিবাহিত হত। পুস্তক লেখার সময়

পার্থিব কোন প্রকার দুঃখ দুর্দশার কথা মনে থাকত না। রামায়ণের কতক কাণ্ড অবধি ছাপা হয়ে গিয়েছিল, অবশিষ্ট কাণ্ডগুলি মুদ্রণের জন্য অর্থাভাব হওয়ায় কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে স্বতন্ত্র ভাবে সাত কাণ্ড রামায়ণ ছাপিয়ে দেবেন বলে স্বীকৃত হলেন। প্রকাশক রূপে রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুরের নাম পুস্তকে মুদ্রিত হবে এইরূপ ঠিক হল। রাজাবাহাদুর পুরস্কার স্বরূপ আমাকে সাড়ে সাত শো টাকা দান করলেন। পূর্বের কিছু দেনা ছিল সেই টাকায় সমস্ত দেনা পরিশোধ করে ফেললাম। সম্প্রতি নিতান্ত অর্থাভাব, দিবা নিশি উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত আছি। এই সময় একদিন সকালবেলা ডাকে তিনটা চিঠি পেলাম, দুটো চিঠি খুলে পড়লাম, তৃতীয় চিঠিটা পড়তে কি জানি কি জন্য সে সময় ইচ্ছা হল না। আমার শোবার পালঙ্কের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়ছিলাম। অপঠিত চিঠিখানা অন্যসময় পড়ব মনে করে মুড়ে খামের ভিতরে গুঁজে দিয়ে স্নান করতে চলে গেলাম। সেই চিঠিখানা পড়ার কথা আর মনে রইল না। সেই সময় কলকাতায় বৃহৎ প্রদর্শনী বসেছিল।[১] তার পরের দিন প্রদর্শনী দেখতে কলকাতা চলে গেলাম। পনেরো কুড়ি দিন পরে বালেশ্বরে ফিরে এসে ধোপার বাড়ি দেব বলে বিছানার চাদর ইত্যাদি বার করলাম, মোড়া খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বেরিয়ে পড়ল, খুলে পড়লাম—কেওঞ্ঝরের মহারাজা লিখেছেন, মাসিক দেড়শত টাকা বেতন দিয়ে আমাকে তাঁর জেলায় ম্যানেজার নিযুক্ত করার ইচ্ছা। আমি সম্মত কিনা শীঘ্র উত্তর দিতে লিখেছিলেন। অনুসন্ধান করে জানলাম, আমার কাছ হতে উত্তর না পাওয়ায় দশপল্লার ম্যানেজার বালেশ্বর নিবাসী বাবু কুঞ্জবিহারী দে সেই পদে নিযুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

যদিও রোগগুলি শরীরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, কেবল শরীর কিছু পরিমাণে কর্মক্ষম হয়েছিল, বিশেষত এখন অর্থ উপার্জনের চেষ্টা না করলে নয়। গড়জাতের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্টার স্মিথ্ সাহেব বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন, সুতরাং গড়জাতের কোন রাজ্যে কর্ম পাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে ভেবে কটক চলে গেলাম। আমার পরম বন্ধু এবং সহায় রায় নন্দকিশোর দাস আমার জন্য একটি উপযুক্ত পদের অন্বেষণ করতে লাগলেন। দৈবাৎ দশপল্লা এবং নরসিংহপুর

১ প্রদর্শনী কাল ১৮৮৩-৮৪

In the year 1883-84 an international exhibition was held in Calcutta. It was the first undertaking of its kind in India. (Buckland's *Bengal Under the Lieutenant Governors*, P. 799)

দুই রাজ্যের দেওয়ানের পদ শূন্য অবস্থায় ছিল। দশপল্লায় আমি এবং নরসিংহপুরে কেওঞ্ঝরের ভূতপূর্ব দেওয়ান বাবু জগমোহন দাস দুইজন নিযুক্ত হলাম। এই দুই রাজ্যের রাজারা গদিতে বসার দিন হতে সরকারের নিযুক্ত দেওয়ানদের দ্বারা রাজ্যের শাসনের কাজ চলে আসছিল। ওই দুই রাজ্যের রাজারা প্রজাদের গৃহ থেকে সমস্ত টাকাপয়সা বহন করে এনে রাজকীয় ধনভাণ্ডারে নিরাপদে রক্ষা করা রাজ্যপালনের বিধি বলে জ্ঞান করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দশপল্লা রাজার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারি মামলার কার্যবিধানে দুটি মাত্র দফার বিষয় উল্লেখ করলে পাঠক মহাশয় অন্যান্য বিচার পদ্ধতির ধারা কিছুটা অনুমান করে নেবেন।

রামা মাঝি শ্রীমণিমার[১] শ্রীপদতলে পড়ে আবেদন করল—"আজ্ঞে, ভীমা মাঝির একটা বলদ আমার ধানের ক্ষেতে ঢুকে ধান খাচ্ছিল, আমি সেই বলদকে খেদিয়ে দেবার জন্য এক ঘা মারাতে, ভীমা আমাকে সেই লাঠি দিয়ে ধোলাই দিল। আমার আবেদন মণিমার বিচারে সফলকাম হোক।'

নালিশ শোনামাত্র শ্রীছামু[২] আদেশ করলেন, 'এঁ্যা কি কি বললি, ভীমা তোকে মারল? যা চারজন লোক গিয়ে ভীমাকে ভাল করে বাঁধবি ও তাকে ঘর থেকে মারতে মারতে শ্রীছামুর কাছে টেনে আনবি। আর তার বলদটাকে বেঁধে আনবি।'

ভীমা এবং বলদ বাঁধা হয়ে এল। ভীমা নিজ হতে মামলার কথা জানত, কিম্বা লোকে তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। সে ছামুর সামনে কয়েকটি টাকা রেখে দিয়ে পায়ে পড়ে বলল, 'আজ্ঞে আমি রামাকে মারি নি, সে আমার নামে মিথ্যে নালিশ করেছে।'

ভীমার দেওয়া কর্পূরচন্দন মাখানো টাকার প্রতি দৃষ্টি পড়ামাত্র শ্রীছামু বুঝে ফেললেন ভীমার কথা সম্পূর্ণ সত্য, রামা মিথ্যা নালিশ করেছে। আদেশ হল— 'কে আছে রে, রামা শ্রীছামুর কাছে মিথ্যা নালিশ করেছে, তাকে বেঁধে প্রহার কর।'

রামা বাঁধা হয়ে মার খেল, পরে ঘর থেকে কিছু টাকা এনে শ্রীছামুর কাছে দাখিল করাতে মামলা শেষ হয়ে গেল।

---

১ রাজা (His Highness)। রানীকেও বলা হয়।

২ রাজাকে বলা হয়। রানীকে বলা হয় না।

আমার দশপল্লার দেওয়ানির কার্যভার গ্রহণ করার দুই তিন মাস পরে দশপল্লার জোরমো এলাকার একজন মোড়ল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। প্রধানটি জাতে করণ, স্থূলবপু, মামলাবাজ লোক, লেখাপড়া জানা। কথাপ্রসঙ্গে এর আগের বছর রাজ সরকারের তরফ হতে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা জারি হওয়ার বিষয় উল্লেখ করলেন। তাঁর কথার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলাম।

কোন একজন নিন্দুক মণিমার কাছে সংবাদ দিল, জোরমোর প্রধান আপন ঘরের সদর দরজার দেওয়ালে দুটো পদ্মফুলের চিত্র করেছে। শ্রীমণিমার রাজবাড়ির দেওয়ালে না পদ্মফুলের চিত্র হবে। সামান্য প্রধান দেওয়ালে পদ্মফুলের চিত্র করবে! ভারি সাহস।

শ্রীমণিমার শ্রীআজ্ঞায় দুজন 'পাখ লোক'[১] গিয়ে প্রধানকে ধরে এনে শ্রীছামুর সামনে উপস্থিত করল। শ্রীছামু ইত্যবসরে পদ্মফুলের চিত্রের কথা ভুলে গেছেন। প্রধানের উপরে শ্রীদৃষ্টিপাত মাত্র জিজ্ঞেস করলেন—'ওহে প্রধান, তুই এত মোটা হয়েছিস, রোজ কত করে ঘি খাস্, বল্।'

প্রধান ভয়ে হাত জোড় করে জানাল—'মহাপ্রভু। আমি পয়সা কোত্থেকে পাব যে ঘি খাব?

শ্রীমণিমা আদেশ দিলেন—আমাদের শ্রীছামু জিজ্ঞাসা করার পর আজ্ঞা করলেন—'এই লোকটা আমাদের শ্রীআজ্ঞা অমান্য করে মিছে বলল। ঘি অবশ্য খায়, নয়ত এত মোটা হল কি করে? ওহে পাখলোক, এই প্রধান ঘি খায় কি না?'

পাখ লোক বলল, 'আজ্ঞে মণিমা ছামুর শ্রীঅনুমান কি মিথ্যা হতে পারে?'

শ্রীমণিমার সূক্ষ্ম বিচারে স্থির হয়ে গেল, এই প্রধান মুলুকের টাকা লুঠ করে ঘি খেয়ে মোটা হয়েছে। পাখ লোক তার ঘরে ঢুকে টাকা বার করে আনবে।

পূর্ব রাজার সময় হতে রাজবাড়িতে একজন পুরানো খাজাঞ্চি ছিল।

সেই খাজাঞ্চি নতুন রাজার নাড়ীনক্ষত্র জেনে ফেলেছিল। সে আবার প্রধানের আত্মীয় লোক। গোমস্তা শ্রীছামুকে জোড় হাতে জানাল—'আজ্ঞে মহাপ্রভু! এই প্রধানের ঘর হতে টাকা আনব ঠিক কথা, কিন্তু আসলে কত

---

১ পাখের লোক। গূঢ় অর্থ, যারা দুর্বুদ্ধি দেয়, দুষ্কর্মের আজ্ঞাবহ হয়। অন্তরঙ্গ বাহন। উচ্চারণ-পাখ-অ লোক-অ।

টাকা, কাগজপত্র দেখলে ঠিক হিসাব ধরা পড়বে, তার পরে যত ইচ্ছা টাকা নিয়ে এলেও কমিশনর সাহেব ধরতে পারবেন না।

শ্রীমণিমা হুকুম দিলেন—"ঠিক্ ঠিক্। আমাদের পক্ষ হতে সেইরূপ আদেশ করা হোক।'

প্রধান অনেকগুলি তালপাতা আনিয়ে হিসেব পত্র শুরু করল। শ্রীছামুর দৃষ্টিপড়ার মতো স্থানে বসে চর্ চর্ করে সারাদিন ধরে লিখল। হিসাবপত্র ঠিক করতে একমাসকাল লাগল।

একদিন সকালে রাজবাড়ির খাজাঞ্চি শ্রীছামুর অবসর বুঝে প্রধানকে হিসাব তলব করায় সে বড় বড় পাঁচ সাত আঁটি পঞ্জিকা শ্রীছামুর সামনে রেখে দিল। শ্রীছামুর আজ্ঞায় খাজাঞ্চি হিসাব করতে আরম্ভ করল। খাজাঞ্চি সেই হিসাবের পুঁথির তাড়া খুলে মনে মনে অনেকগুলি তালপাতা উল্টে পাল্টে দেখল। সবগুলি তালপাতায় কেবল লেখা আছে, 'হরি আমাকে রক্ষা কর—হরি আমাকে রক্ষা কর।' মনে মনে খুব হেসে গোমস্তা হিসেবের তাড়া রেখে দিল।

শ্রীমণিমা জিজ্ঞেস করলেন—'কি হে খাজাঞ্চি কি বুঝলে?

খাজাঞ্চি—আজ্ঞে, যতটুকু ততটুকু।

শ্রীমণিমা - কি বললে, কি বললে?

খাজাঞ্চি—আজ্ঞে মণিমা কথা হচ্ছে প্রধান রায়তদের কাছ হতে যত টাকা উসুল করেছে সব টাকা খাজাঞ্চিখানায় জমা করেছে, নিজে খাবার আর পথ পায় নি।

শ্রীমণিমা—আঁ্যা, আমরা[১] পাঁজির গোছা তদবির করে আদেশ দিলাম। যতটুকু ততটুকু, প্রধান টাকা খায় নি। ওহে খাজাঞ্চি নয়া গড়, আঠগড়[২] ইত্যাদি এত যে রাজা আছেন, আমাদের ছামুর মতো তারা কি বুদ্ধিমান্? নয়রে বাপু নয়।

রাজা সাহেবের একটা বিশ্বাস ছিল, তাঁর মতো বিদ্বান্, বিত্তবান্, বুদ্ধিমান্ পৃথিবীর আর কেউ নেই।

দশপল্লা ও নরসিংহপুর দুই রাজ্য হতে অত্যাচারিত শতশত প্রজা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে আবেদন করায় রাজাদের সৎ পরামর্শ দেবার

*১ গৌরবে বহুবচন

২ অন্য দুটি রাজ্যের নাম। গড়জাতে অনেকগুলি রাজ্য ছিল।

জন্য এবং কেল্লায় শান্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বৃটিশসরকারের তরফ হতে দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিল।

জগমোহনবাবু এবং আমি দুইজন ঠিক এক তারিখে একদিন দেওয়ানিতে নিযুক্ত হলাম। এখন কর্মস্থানে যাবার কথা।

ভাদ্র মাসের দিন—ঘোর বর্ষাকাল, মহানদীর বাড়ন্ত জল দুইকূল উছলে পড়ছে। কটক থেকে দশপল্লা যেতে মহানদীর দক্ষিণ কূলে কূলে সড়ক বানের জলে স্থানে স্থানে ডুবে গেছে। কোথাও কোথাও এক হাঁটু পেট অবধি, বুক পর্যন্ত জল, আবার স্থানে স্থানে পাহাড়ঝরা নালা, বর্ষার সময় প্রখর স্রোত, সাঁতার কাটার মতো জল। নৌকা নাহলে পার হবার উপায় নেই। বৃষ্টি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে নালা শুকিয়ে যেত। গোরুর গাড়ি কিম্বা পাল্কিতে যাবার উপায় ছিল না। দেওয়ান দুজনে মিলে একখানা উজানমুখো মহাজনী নৌকা ভাড়া করলাম। গড়জাতের অভ্যন্তরের বাণিজ্যদ্রব্যবোঝাই নৌকা কটকে মাল নামিয়ে দিয়ে খালি ফিরে যেত। নদীর স্রোত কাটিয়ে উজিয়ে চলত বলে এই নৌকার নাম ছিল উজানমুখো নৌকা। গড়জাতের কারবারী মহাজনদের এই নৌকাগুলি ছিল প্রধান অবলম্বন। পাঠক মহাশয়, আপনি কটক বারবাটী কেল্লার নিকটে মহানদীর কূলে গড়গড়িয়া মহাদেবের ঘাটের উপর হতে নজর করলে অনেক দূর অবধি বর্ষাকালে এইরকম শতশত নৌকা বাঁধা আছে দেখতে পাবেন। সম্বলপুরে রেললাইন খোলার দিন থেকে এই নৌকার সংখ্যা অনেকাংশে কমে গেছে। নৌকাগুলো লম্বায় ষোল গোড়িয়া হতে পঁচিশ গোড়িয়া (অর্থাৎ ষোল হাত হতে পঁচিশ হাত)। ওসারে লম্বা অনুপাতে পাঁচ ছয় হাত। উচ্চতায় তিন চার হাতের মধ্যে। জল মার্গের অবস্থা অনুযায়ী নৌকা তৈরি হত। নৌকা ওসারে বড় হলে স্রোতের উজানে যাওয়া কিম্বা জলমগ্ন প্রস্তর খণ্ড পরিপূর্ণ পথে সাপের মতো কুটিল গতিতে স্রোতের ভাঁটিতে চলার পক্ষে নিতান্ত অসুবিধা হত। অনেক স্থানে দুই পাশে পর্বত ভীম অর্থাৎ মহানদী গর্ভে পতিত বৃহদাকার পাষাণ খণ্ড অতিক্রম করার সময় প্রবল বাতাসের বেগে নৌকা পাথরে ঘা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। সেইজন্য নৌকার উচ্চতা যথাসম্ভব কম করা হত।

নৌকার ঠিক মধ্যভাগে দুই প্রান্তের গলুইয়ের সমসূত্রে চারটা কিম্বা পাঁচটা খুঁটি পোতা থাকত। খুঁটির মাথায় লম্বালম্বি আড়া বাঁশ (মথান), তার ওপর

দুই পাশে ঢালু খড়ের ছাউনি। সেই চালা প্রথমে বাঁশের কঞ্চির উপরে চার আঙুল ঘন করে ছাউনি করা। সেই ছাউনির উপরে বাঁশের ফালির পেটের দিকের অংশ চেঁছে ফেলে কেবল পিঠের শক্ত পাতলা অংশের জালির শক্ত বুনট ছাউনি। সেই ঢালু চালের উপর দিয়ে মাঝিরা দৌড়ঝাঁপ করে নৌকা বায়। ভেতরটা খুঁটির অনুপাতে বাঁশের ছেঁচা বেড়াকে দেয়াল করে খোপে খোপে কুঠুরি হিসাবে বিভক্ত করা থাকে। এক একটা খোপে বিভিন্ন রকম বাণিজ্যদ্রব্য বোঝাই করা হয়। মাল বোঝাই করার পর ওপরের চালটা নৌকার ফাঁদে শক্তভাবে বেঁধে দেওয়া হয়। নৌকায় বোঝাই বাণিজ্যদ্রব্য চার আঙুল পরিমাণ নৌকোর উপর দেখা যায়। নদীর ভিতর দিয়ে নৌকো চলার সময় বাতাসের বেগ সামান্য বেশি হলে—ঢেউগুলি কপিকল হালে সংলগ্ন ঢাকাটিতে ধাক্কা দিয়ে নৌকাটিকে জলের উপরে ঠেলে তোলে কিম্বা নীচে ফেলে দেয়। এর ফলে নৌকোর খোপের ভিতর জল ঢুকে মাল ভিজিয়ে দিতে পারে না। পুরো-পুরি বোঝাই নৌকোর দুদিকের গলুই আর চাল মাত্র চলার সময় দৃষ্টিগোচর হয়। মহানদীর গড়গড়িয়া মহাদেবের ঘাটে আমাদের ভাড়াটে নৌকো বাঁধা হয়েছিল। সকালবেলা দিন এক প্রহরের সময় মাঝি আমাদের মালপত্রের সঙ্গে এই দুজন দেওয়ানকে মাঝের খোপে ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরের হালটা নৌকোর কাঁধে শক্ত করে বেঁধে দিল। আমাদের চাকরেরা আরেকটি খোপে ঢুকে পড়ল। খোপের ভিতরটা বাতাসশূন্য এবং প্রায় আলোকশূন্য।

ভিতরে আমরা, দেওয়ান দুজন বিছানা পেতে বসলাম বা শুলাম, কারণ বসলে মাথায় চাল ঠেকছিল[১]। পা ছড়িয়ে শোবার জায়গা ছিল না। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পড়ে আছি। তাকিয়ায় শোবার সময় কেন্নোর মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে রইলাম।

'জে-জে গঙ্গা মাতা' বলে মাঝিরা নৌকো খুলে দিল। নৌকো স্রোতের উজানে চলবে, সুতরাং লগি দিয়ে ঠেলে নেওয়া দরকার, আমাদের নৌকোতে পাঁচজন দাঁড় বাইবার লোক এবং একজন আগা-গলুইয়ের দাঁড়ি। লগিগুলি সরু বাঁশের, প্রায় পাঁচ ছয় হাত লম্বা। আগা-গলুয়ের লোকের হাতেও সেইরকম একটি লগি। পার্থক্যের মধ্যে আগা-গলুইওলার লগির মাথায় শনের দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে আঁকশি বাঁধা। নৌকো চলার সময় আগা-গলুইওলা

১ ফকীরমোহন সাধারণ লোক অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নতকায় ছিলেন।

প্রয়োজন মতো এপাশ-ওপাশ দাঁড় ফেলে নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। নৌকো বনের মধ্যে যাবার সময় আঁকশি দিয়ে গাছের ডাল ধরে নৌকোকে ঠিক পথে নেয়। দাঁড় টানা মাঝিরা আগা-গলুইয়ের নিকট ছতরির উপরে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে জলে দাঁড় ফেলে। তার পরে দাঁড়ের মাথাটা কাঁধের উপরে রেখে দুইহাতের মুঠোয় খুব শক্ত করে দাঁড় ধরে দেহের সমস্ত বল দাঁড়ের উপর দিয়ে পিছনের গলুই অবধি ঠেলে নিয়ে যায়। সে সময় দাঁড়টানা মাঝিদের মেরুদণ্ড এবং পাঁজরার হাড়গুলি বেঁকে যায়। সামান্য মাত্র সময় পেলে নৌকোটা স্রোতের জোরে পিছিয়ে আসবে বলে পিছনের হালের কাছের জল থেকে দাঁড় তোলামাত্র পাঁচজনের সকলে আগা-গলুই অবধি ছুটে গিয়ে শীঘ্র দাঁড় জলে ফেলে দিয়ে নৌকোটাকে আটকে ধরে। নৌকোর উপর চালটা যেরূপ ঢালু, অনভ্যস্ত লোক তাড়াতাড়ি ছুটলে নিশ্চয় নীচে জলের মধ্যে পড়ে যাবার কথা, সময় সময় এক একজন মাঝি নদীস্রোতে পড়েও যায়। আশ্চর্যের বিষয় জলে পতিত লোকটিকে ওপরে তোলার সাহায্য করা দূরে থাকুক, 'কেন পড়লি' বলে সকলে ক্ষেপে গিয়ে তাকে মার দেয়। আরো আশ্চর্যের কথা আর একটা মাঝি জলে পড়ে গেলে অন্যান্য মাঝিদের সঙ্গে মিলে মারখাওয়া মাঝিটাও জলেপড়া মাঝিটাকে মারতে ধাওয়া করে।

বেলা দশ কি এগারোটার সময় অনুমান দেড় ক্রোশ মাত্র উজানে উঠে কুশলেশ্বর মহাদেবের ঘাটে নৌকো লাগল। মাঝি তীরের কাছে বালিতে একটা লগি পুঁতে নৌকো বেঁধে দিল। তারপরে নৌকোর ফাঁদ থেকে চালের বন্ধন খুলে দিয়ে আমাদের বার করে দিল। ভৃত্যেরা রান্না বান্নায় লেগে গেল। স্নান ভোজনাদি অন্তে মাঝি আমাদের অন্ধ কূপের মধ্যে ফেলে নৌকো ঠেলে দিল।

দশপল্লার দেওয়ানি (২)

মাঝিরা দিনের বেলা রান্না করত না। নৌকোয় একটা তোলা উনুন ও বড় বড় দুটো হাঁড়ি থাকত। রাত্রে নৌকোর উপর রান্না হত। রাতের বেলা গরম ভাত খাবার পর অনুমান আরো পাঁচ সাত সের চালের ভাত রান্না করে দুই তিন কলসি জল ঢেলে রেখে দিত। হাঁড়ির কাছে একটা কাঁসি থাকত। বেলা এক ঘড়ির সময়[১] হতে মাঝিদের পান্তা খাওয়া শুরু হত। এক একজন দাঁড় টানা ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি আধ কাঁসি ভাত, আধ কাঁসি আমানি বেড়ে নিয়ে দুই তিন মিনিটের মধ্যে খেয়ে শেষ করে দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে পড়ত। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাঁসিখানির আর বিশ্রাম নেই। এক একজন মাঝি কে জানে কেন পনেরো বারের মতো আমানি পান করত। সে সময় তরকারির সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকত না। তরকারি খাবার সময় বা কই? ক্বচিৎ কারো কপালে দুই এক কোয়া পেঁয়াজ অথবা সামান্য তেঁতুল জুটে যেত, নচেৎ ঐ নুনই সব।

নদীর ভেতর অগাধ জল আবার স্রোতের টানে নৌকো সামলানো দায়। এজন্য তীর হতে চার পাঁচ হাত দূর অবধি বা তীরের কাছাকাছি তিন চার হাত দূরে নৌকো ঠেলে উজানে উঠত। কোন জায়গায় বহু দূর অবধি বালিয়াড়ি তীর দেখা গেলে নৌকোয় যে তিরিশ কিম্বা চল্লিশ হাত লম্বা একখানা দড়ি থাকত সেই দড়িটা নৌকোর সামনের গলুইয়ে বেঁধে দিয়ে দাঁড়টানা মাঝিরা দাঁড় রেখে দিয়ে সেই দড়ির প্রান্ত ধরে তীরের বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নৌকো টেনে টেনে নেয়। অনেক জায়গায় বানের জল কূল ছাপিয়ে চড়ার এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ অবধি ছেয়ে গেছে। নদী অথবা নদীতীরের চিহ্ন নেই সব একাকার। কিন্তু নৌকোকে তীর ঘেঁষে চলতে হবে। কখনও কখনও ক্ষেতের

১ চব্বিশ ঘণ্টায় ত্রিশ ঘড়ি। সূর্যোদয় হতে ঘড়ির হিসাব আরম্ভ। এক ঘড়ি অর্থাৎ সূর্যোদয় হতে আটচল্লিশ মিনিট। এক দণ্ডে চব্বিশ মিনিট। এক ঘড়ি অর্থাৎ দুই দণ্ড— পূর্বঘড়ির সময় নির্ণয়।

ভেতর দিয়ে গাঁয়ের পথের ভিতর দিয়ে নৌকা চলত। স্থানে স্থানে বনের ভেতরের পথে নৌকো চালাতে হত। সে সময়ে নৌকার আগা-গলুইয়ের লোক গাছের ডালে আকশি লাগিয়ে লাগিয়ে নৌকা চালায়। কদাচিৎ কয়েকজন মাঝিও গাছের ডাল টেনে টেনে সরিয়ে সরিয়ে নৌকা ঠেলে তুলত। কদাচ অপরাহ্ণ সময় অতি সুন্দর মনোহর স্থানে নৌকা ভেড়ে। নদীতীর বহুদুর বিস্তৃত উচ্চ নীচ সিকতা স্তুপময়। উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ তিন দিকে বিশাল প্রাচীরের ন্যায় গিরিশ্রেণী দণ্ডায়মান, পশ্চিমে পর্বতশৃঙ্গে জ্বলন্ত সুবর্ণপিণ্ডের ন্যায় সূর্যদেব অস্তগমোনোন্মুখ। মস্তকের উপর গগনমার্গে দলবদ্ধ নানা জাতের পক্ষী কলরব করে পশ্চিমে পর্বত পানে উড়ে যাচ্ছে। বোধ হত পশ্চিম দিকের পর্বত প্রাচীরের মূলে যেন মহানদীর স্রোত শেষ হয়েছে, এই স্থান নির্জন, নিস্তব্ধ গ্রাম্য সমস্ত প্রকার প্রাণীদের সম্পর্কশূন্য। সেইরূপ জায়গায় ঠিক সন্ধ্যার সময় সৈকতের বালুকা স্তুপের উপরে বসে পশ্চিম পানে চাইলে মনের মধ্যে কেমন যেন এক প্রকার অনাবিল গম্ভীর বর্ণনাতীত পবিত্র ভাবের উদয় হত। সেই মহৎভাব দর্শকের প্রাণে অনুভূত হয়।

এইভাবে নটবর গতিতে অষ্টম দিনে প্রায় মধ্যাহ্নসময়ে আমাদের নৌকো নরসিংহপুর রাজ্য অন্তর্গত একটি গ্রামের নদী তটে ভিড়ল। এই স্থানে মহানদীর উত্তর ও দক্ষিণ দুই কূল নরসিংহপুর ও দশপল্লা রাজ্যএলাকার সীমান্ত রেখা। মহানদীর তীর হতে নরসিংহপুর গড়ের দূরত্ব মাত্র এক ক্রোশ। দক্ষিণ দিকে নদীতীর হতে প্রায় সাত ক্রোশ দূরে দশপল্লার রাজধানী মধুবনগড় অবস্থিত। নদীতীরে দশপল্লা এলাকার বেলপড়া গ্রাম। এই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটা সরকারি ডাকবাঙলো আছে। সম্বলপুর হতে একটি সড়ক মহানদীর কূলে কূলে বেলপড়া গ্রামের বস্তির ছাঁচতলা ছুঁয়ে পুরী অবধি চলে গেছে। মধ্য ভারতবর্ষ এবং উৎকলের পশ্চিমের গড়জাতস্থ তীর্থযাত্রীরা এই পথে পুরীধামে যাতায়াত করেন। বেলপড়া গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে সুবিখ্যাত বরমূল ঘাট। মহানদীর উত্তর ও দক্ষিণ দুই কূলে নদীর গর্ভ হতে উঠে বিশাল পর্বতের প্রাচীর দণ্ডায়মান, মধ্যে অতি গভীর অপ্রশস্ত মহানদীর স্রোত প্রবাহিত। এ একটি অপূর্ব বিচিত্র দৃশ্য।

নৌকা নরসিংহপুর এলাকার গ্রামের ঘাটে উপস্থিত হল। দেওয়ানবাবুর জিনিষ পত্র নেবার জন্য গড় হতে বেগারখাটা পরিচারক এবং কর্মচারী সেখানে

উপস্থিত ছিল। বাবু জগমোহন দাস আমার কাছে বিদায় নিয়ে নৌকো হতে নেমে গেলেন। এখন মনে ভারি আনন্দ হল আলো বাতাস ও বাহ্য জগতের সবরকম সম্পর্কশূন্য নৌকোর খুপরি অথবা অন্ধকূপের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি অগ্রপশ্চাৎ ধাবমান পাঁচটি নৌচালকের দশটি দৃঢ় পদক্ষেপের এক প্রকার কর্কশ বিরক্তিকর শব্দ আর শুনতে হবে না। রাতের ঘুমও তথৈবচ। প্রাণ ধারণ বা ক্ষুধানিবারণের জন্য আহার পতিতপাবন ডাল মাত্র সহায়, আর কটক হতে সংগৃহীত পথের সম্বল বাসি মিষ্টান্ন।

মনে মনে নৌকোর খোপের মধ্য হতে আনন্দপূর্বক চিরবিদায় গ্রহণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কটক হতে কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানোর জন্য সে সময় একমাত্র সহায় নৌকোর খুপরির কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা তো দূরের কথা একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখতেও ইচ্ছা হল না। এই অকৃতজ্ঞদের দণ্ডভোগ অবশ্যম্ভাবী তার প্রমাণ পাঠক মহাশয় শীঘ্রই পাবেন।

ভাদ্রশেষের মাথাফাটা রোদ, ছাতাটি মাথায় নিয়ে নৌকোর চালার উপরে বসলাম। রাঁধুনে ছোঁড়াটা এসে পাশে বসল। মনের আনন্দে তাকে বোঝাতে লাগলাম, ঐ দেখ দশপল্লা এলাকা, বেলপড়া গ্রাম দেখা যাচ্ছে। নদীটা পার হতে চার পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা গ্রামে পৌঁছে যাব। প্রধান সিধে দেবে, নানারকম আনাজপাতি মাছ সিধের মধ্যে থাকবে বেশ করে পাঁচরকম রাঁধবি, তাড়াতাড়ি হাত চালাতে হবে কিন্তু। আজ ভাল মন্দ খেয়ে দেয়ে পা লম্বা করে দিয়ে ভাল করে শুতে হবে, এক ঠোঙা কটকি মিষ্টান্ন সঙ্গে ছিল, আর প্রয়োজন কি, দে দাঁড়িদের বিতরণ করে দে।'

মাঝিরা নৌকো ঠেলে দিয়ে দাঁড় হাতে নিল। নদীগর্ভে অগাধ জল। একটা বড় দাঁড় দিয়ে দুজন দাঁড়ি একদিকে বায়। হালী হাল ধরে নৌকোর দিক আয়ত্ত করে।

নৌকো ছেড়ে দেবার প্রায় দুইঘণ্টা পরে নৌকোটা নদীর প্রায় মাঝামাঝি পথে চলতে শুরু করেছে। দাঁড়িরা খুব উৎসাহের সঙ্গে দাঁড় টানছে। হালধরা মাঝি চীৎকার করে উঠল—'শীঘ্র বাও, শীঘ্র বাও মণিভদ্রা পর্বত শিখরে মেঘের সঞ্চার হয়েছে। এখনি ঝড় বর্ষা শুরু হবে।' আমি চম্‌কে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম চতুর্দিকে রোদ খটখটে। মেঘ কোথায়? কিছু দূরে মহানদীর গর্ভে বালির একটি ক্ষুদ্র চড়া ছিল। মাঝিরা ত্বরিতে নৌকো বেয়ে

সেই বালির চড়ার ধারে নৌকো বেঁধে ফেলল। চেয়ে দেখলাম দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পর্বত শিখরে ক্ষুদ্র কয়েক খণ্ড মেঘ মাত্র ঢেকে রেখেছে। পর্বত বিশেষের শিখরে সঞ্চরণশীল মেঘের অবস্থা দেখে মাঝিরা শীঘ্র বৃষ্টি ও পবন আগম বিষয়ে বুঝতে পারে। সত্যি সত্যি সেদিন আধঘণ্টার মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি উপস্থিত হল। মাঝি আমাকে আমার চাকরের সঙ্গে অন্ধকূপের মধ্যে পুনর্বার চালান করে বাঁধন শক্ত করে বেঁধে দিল। জিনিষ পত্র বেঁধে ফেলেছিলাম, আবার খুলে বিছানা পাততে হল। দুঃখ কোথা হতে আরো কতকগুলো দুঃখকে টেনে আনে। জগমোহনবাবু সঙ্গে থাকতে দুইজন মুখোমুখি বসে নানারকম কথোপকথন করে দুঃখগুলিকে সামনা হতে সরিয়ে দিচ্ছিলাম—আজ একাকী। সে সময়ে হারিকেন লণ্ঠন বেরোয় নি। খুপরির মধ্যে প্রদীপের আলো জ্বালা নিরাপদ নয় অন্ধকূপ অন্ধতমসাবৃত, তার উপর দুঃখ উপবাসজনিত কষ্ট। দিনের বেলা প্রায় অর্ধ ভোজন হয়েছিল। রাত্রে সুচারু ভোজন হবে এই আশায় বালিতে বসে অর্ধসিদ্ধ মুগের ডাল সহযোগে ভোজনে প্রবৃত্তি হল না। সমস্ত কষ্টের অবসান হবে এ কথা স্মরণ করে মন ও উদর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কটকের বাসি মিষ্টান্ন কতকগুলি ছিল, দিনের বেলা দাঁড়িদের মধ্যে কিছু ভাগ করে দিয়েছিলাম, এখন প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে, সারারাত অবিচ্ছেদ্য প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি। বাইরে সাঁই সাঁই গুম গুম ভীষণ শব্দ শোনা যাচ্ছে। নৌকো 'ভাকুত'য় (হাতী বাঁধার খুঁটি) বাঁধা। মত্ত উন্মত্ত হাতীর মতো এধার ওধার আছাড়ি পাছাড়ি হয়ে উঠছিল পড়ছিল। খোপের মধ্যে স্থির হয়ে শোবারও উপায় ছিল না। গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুরছিলাম নৌকোর 'পাগড়' (নৌকো বাঁধা দড়ি) একবার ছিঁড়লে শরীর হতে প্রাণ ছিঁড়ে যাবে, এ একেবারে অবধারিত। প্রবল স্রোত জলের ঘূর্ণিতে পড়ে নৌকোটা ডুবে যাওয়া কিম্বা পর্বত গাত্রে লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দুর্দশা নিবারণের কোন উপায় দেখলাম না। এই কারণে ক্ষণে ক্ষণে জীবননাশের আশঙ্কায় প্রাণ অস্থির করে তুলল। ক্ষুধার জ্বালা শরীরের অস্থিরতা জীবননাশের আশঙ্কা এসব দুর্যোগ পূর্ণমাত্রায় জীবনকে ঘিরে রেখেছিল। এরূপ অবস্থায় সন্তাপনাশিনী সন্তোষদায়িনী নিদ্রাদেবীর কাছে ঘেঁষার উপায় কই ? সে সময়ে মনে পড়েছিল কি, স্মরণে নেই, সম্প্রতি এই প্রাচীন শ্লোকটি লিখছি।

'যচ্চিন্তিতম্ তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতষা নগণিতং তদিহোপপৈতি।'

এই কারণে হিন্দুজাতি একটু বেশি রকম অদৃষ্টবাদী, বিশেষত আমি জীবদ্দশায় শত সহস্র ঘটনা দেখে শুনে ভোগ করে ঘোর অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়েছি।

সুখে হোক দুঃখে হোক, রাত পোহায়, রাত পোহালো। বৃষ্টি এবং বাতাসের প্রাবল্য শেষ হয়েছে। কেবল টিপির টিপির বৃষ্টি হচ্ছিল। ভোর হওয়া মাত্র মাঝিরা নৌকোটাকে খুলে দিল। দিন এক প্রহরের সময় নৌকো বেলপড়া ঘাটে লাগল। নতুন দেওয়ানকে অভ্যর্থনা করার জন্য গ্রামের প্রধান অনেকগুলি প্রজাকে নিয়ে ঘাটের নিকট উপস্থিত ছিল।

সে সময় আমি অর্ধমৃতপ্রায়—লোকের সাহায্য ছাড়া নৌকো হতে নীচে নামতে অক্ষম। আমি যে রাজ্যের দেওয়ান হাকিম-ম্যাজিস্ট্রেট, আমি দুর্বল নই, মনে এবং দেহে খুব শক্তি আছে, প্রজাদের তা দেখাতে হবে। আমি এখন লোকের সাহায্যে নৌকো হতে নামলে লোকে বলবে এই হাকিমটা বীরপুরুষ নয়। শক্তি না থাকা সত্ত্বেও নৌকো হতে লাফিয়ে পড়লাম। কাদা মাটিতে পা পিছলে গেল, ফলে 'পপাত ধরণী তলে'—বীরত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ল। পাঠক মহাশয় আপনি আমার এই কপটাচারণের কথা ভেবে হাসবেন. আমাকে ধিক্কার দেবেন, আমার গত জীবনের অনেক কপট ব্যবহারের কথা মনে করে আমি মনে মনে হাসি, অনুতাপ করি। আপনার আর অপরাধ কি? কথাটা কি জানেন, দুনিয়াটা হল নাট্যশালা, মানবকুল অভিনেতা, যে খুব নাচতে কুঁদতে পারে অঙ্গভঙ্গি করে লোককে ভোলাতে পারে তারই জিৎ।

আমাকে গড়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন রাজকর্মচারী পাল্কি নিয়ে এসে উপস্থিত হল। বেলপড়ায় আহারাদি সেরে বিকেল বেলা যাত্রা করলাম। বেলপড়া হতে গড় প্রায় সাতক্রোশ দূর গড়ে সে বেলায় পৌঁছতে পারলাম না। গড় হতে দুই ক্রোশ দূরে মধ্যখণ্ড নামক গ্রামে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা সরবরাকার[১] করে রেখেছিল। দশপল্লা রাজ্যে মধ্যখণ্ড প্রসিদ্ধ গ্রাম। এ স্থানে রাজসরকারের খামার এবং কাছারি ঘর আছে। কুমারিকা উপনদীটি এই গ্রামের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মহানদীতে পড়েছে। এইজন্য এই গ্রামের জল এবং পারের জমি খুব উর্বর।

পরের দিন সকালবেলা এক প্রহরের সময় নিজগড়স্থ নিরূপিত বাসায় উপস্থিত হলাম। রাজা সাহেবের ভাঁড়ার থেকে সিধে এসে একটা কুঠুরি পূর্ণ

১ সরবরাহকার। প্রত্যেক গ্রামে একজন থাকত।

করে দিল। পূর্বে প্রত্যেক গড়জাত রাজাদের বাড়ি হতে এইরূপ সিধে সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল। কোন ভদ্র অতিথি গড়ে উপস্থিত হলে তাঁর সারাদিনের খোরাক বাবদ যা সিধে আসত তাতে মাস খানেকের খোরাক সহজে চলে যেত। অভ্যস্ত ভাণ্ডারি এরূপ গুছিয়ে সিধে সাজিয়ে দিত যে অভ্যাগতের কোন বিষয়ে অভাব হত না। দাঁত খোঁটা ও দাঁতন পর্যন্ত তাতে থাকত।

বেলা দশ কি এগারোটার সময়ে রাজাসাহেব ছামুর[১] সাক্ষাতের জন্য গেলাম। রাজাসাহেব একটা বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গালিচার উপর বিজে[২] হয়েছিলেন। ছামুকরণ সরাঘরিআ, ধানঘরিয়া, পাঙ্গিয়া[৩] প্রভৃতি রাজ কর্মচারিরা শ্রীছামুর সম্মুখে কিঞ্চিৎ বামে পাঁচ-সাত হাত দূরে বসেছিলেন। এদের ভূম্যাসন। পশ্চাৎ দেশে আট-দশ জন বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত কর্মচারি দাঁড়িয়েছিলেন। নতুন দেওয়ানকে দেখবার জন্য মফঃস্বল হতে কয়েকজন প্রধান খাজাঞ্চি অবধি এসে উপস্থিত। শ্রীছামুর সম্মুখে দক্ষিণ দিকে তিন-চার হাত দূরে একটি গালিচা পড়েছিল। এটি হল দেওয়ানের আসন।

রাজাসাহেব ছিলেন দীর্ঘকায়। দেহের গঠন ছিল পরিপুষ্ট এবং সক্ষম, আবক্ষ-বিস্তৃত শ্মশ্রুবিশিষ্ট। শরীরটি ছিল তাঁর রাজকীয়। দর্শন মাত্র সম্মানের সঙ্গে অভিবাদন করতে ইচ্ছে করে। দুঃখের বিষয়, শরীরের স্থূলতা অপেক্ষা বুদ্ধির স্থূলতা পরিমাণে একটু অধিক ছিল।

আমি আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীছামু আমার পদাঙ্গুলি নখ হতে মস্তকের কেশাগ্রভাগ পর্যন্ত খুব মনোযোগের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ দেখতে লাগলেন। ও ধরনের সভ্যতাবিরুদ্ধ চাহনি দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হল। আমার দেহের প্রতি শ্রীছামুর দৃষ্টি আবদ্ধ—অন্যদিকে মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তটি পশ্চাৎ দেশে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলিটি সবেগে আন্দোলিত করার সঙ্গে সঙ্গে খাজাঞ্চি, কাছের লোক ও প্রধানদের মুখের দিকে পুনঃপুনঃ চেয়ে দেখছিলেন। আমি যেন অন্যমনস্ক অন্যদিকে আমার দৃষ্টি আছে এরূপ ছল করে রাজাসাহেবের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ মনোযোগের

১ রাজাদের সম্মানিত সম্বোধন।

২ বিজয় হয়েছিলেন। রাজা এবং বিগ্রহের আবির্ভাব বা যাত্রাকে বিজে হওয়া বলা হয়।

৩ প্রাইভেট সেক্রেটারি, ট্রেজারার, ধানভাণ্ডারী, পাঙ্গিয়া (করণ বা কায়স্থ)।

সঙ্গে দেখছিলাম। আমার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে বহুক্ষণব্যাপী পরীক্ষা সমাপ্ত হবার পরে শ্রীছামু আমাকে প্রথম প্রশ্ন করলেন—

'ওহে দেওয়ান বাবু! আপনি রোজ কত ঘি ভাতে খান?'

আমি বললাম—'আজ্ঞে ভাতে আর কত ঘি খাব—এই এক ভরি আন্দাজ।'

শ্রীছামু লোকদের মুখের দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যভরে মুখ বাঁকা করে বললেন—'না না, তা চলবে না। প্রতিদিন ভাতে আধসের ঘি খেয়ে দেখ কেমন থাক, আমাদের ছামুর 'উরিআ'তে[১] দুবেলা দুই সের ঘি 'মনোহি'[২] করি। আরে সরঘরিয়া[৩], দেওয়ানবাবুর বাসায় প্রতিদিন দুই সের ঘি পাঠাবে।'

সত্যি, সত্যি অনেকদিন অবধি বাসায় প্রতিদিন দুই সের করে ঘি আসতে লাগল। এত ঘি আমার কি হবে, রোজ মানা করি, শোনে কে? পরে কাছারির পেস্কার আমাকে বুঝিয়ে দিল, ঘিয়ের প্রয়োজন না থাকলেও রাজাকে জানাবার কোন দরকার নেই, পাঠানো বন্ধ হয়ে যাবে। প্রকৃতই তা ঘটল। দশপল্লার কাছারির পেস্কারের বাড়ি ছিল যাজপুর। অনেকদিন পূর্ব হতে কাজে বহাল আছেন, রাজাসাহেবের মতিগতির বিষয় ভালরূপেই তাঁর জানা ছিল। প্রথমে রাজাসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর আপন বাড়ি ফেরার পথে আমার বাসায় ত্বরিতে এলেন। প্রথম সাক্ষাতে রাজাসাহেবের আমার প্রতি ব্যবহারের বিষয় অর্থাৎ আমাকে অনেক সময় অবধি পা হতে মাথা পর্যন্ত পুনঃপুনঃ চেয়ে দেখা—মুষ্টিবদ্ধ হাত পশ্চাৎ দেশে রেখে বৃদ্ধাঙ্গুল আন্দোলন করা—অন্য কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন না করে হঠাৎ ঘি সেবন করার কথা জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি বিষয়ের অর্থ বুঝতে না পেরে সেই সম্বন্ধে পেস্কারবাবুকে জিজ্ঞেস করায় তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

রাজাসাহেব পুনঃ পুনঃ আমার শরীরের প্রতি চেয়ে দেখলেন। আমি শীর্ণ, স্থূলকায় ব্যক্তি নই, সুতরাং অসুন্দর সুতরাং জ্ঞানহীন। এ থেকে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে—'এই নূতন দেওয়ানটা অসুন্দর এবং মূর্খ। তবে লোকটাকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পাঠিয়েছেন, একে সুন্দর ও জ্ঞানী করে তোলা আবশ্যক।' সেইজন্য দুই সের পরিমাণ ঘি খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

১ রাজার ভোজ্য অন্ন। ২ রাজকীয় ভোজন। ৩ রাজভাণ্ডারী।

রাজাসাহেবের মনে ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, লোকে ঘি সেবন করলে সুন্দর এবং জ্ঞানবান হয়।

আমি বাসায় ফিরে আসার পর রাজাসাহেব 'পাখলোক'দের কাছে আমার শারীরিক সৌন্দর্য এবং জ্ঞান সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা পরে শুনতে পেলাম। পেস্কারের উক্তির সঙ্গে সেই মন্তব্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল।

বর্তমানে স্বর্গগত একজন রাজরক্তের অধিকারীর অশোভন আচরণ বিষয়ে মত প্রকাশ করা আমার পক্ষে উচিত হচ্ছে না। কিন্তু পূর্বেকার আচরণের কথা প্রথম হতে প্রকাশ না করলে পরবর্তী ঘটনাগুলির সঙ্গে তথ্যের সামঞ্জস্য থাকবে না। সুতরাং সংক্ষেপে সব কথা বাধ্য হয়ে লিখতে হচ্ছে।

রাজাসাহেবের মনে ধ্রুব ধারণা ছিল, তাঁর মতো রূপবান, জ্ঞানবান, বিদ্বান, বিত্তবান লোক পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রায় প্রতিদিন শ্রীছামুর 'বেহরণ' (খাস) কাছারিতে 'অন্তরঙ্গ' লোকদের সঙ্গে আলোচনা হত। 'পাখলোক' এবং রাজার একান্ত খাজাঞ্চি করণ সম্প্রদায় 'আজ্ঞে মহাপ্রভু, আজ্ঞে মহাপ্রভু'—বলে শ্রীছামুর উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। প্রকৃতই তাঁর শরীরটি কাবুলদেশীয় বীরপুরুষের ন্যায় দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠতাব্যঞ্জক, দর্শকের মনে ভয় ও ভক্তি উদ্রেক করার যোগ্য। রাজাসাহেবের স্বর্গীয় পিতৃদেব তাঁকে শিক্ষিত করাবার উদ্দেশ্যে দশ-পনেরো বৎসর অবধি একজন শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। শিক্ষকের আপন যুগান্তব্যাপী প্রগাঢ় শিক্ষাদানের ফলস্বরূপ শ্রীমণিমা ছামু এইটুকু লিখতে শিখেছিলেন—

'শ্রীচৈতন্য দেও ভঞ্জরাজা রাজ্য দশপল্লা এবং যোরমো।' অবশ্য এই লেখার মধ্যে 'চ' কোন্‌টা 'দ' কোন্‌টা এবং 'ণ' অক্ষর স্বতন্ত্র ভাবে চিনতে পারতেন না, কেবল দীর্ঘকাল যাবৎ অভ্যাসজনিত অতি শীঘ্র লিখতে পারতেন।

দশপল্লায় দুইটি কাছারি। ভিতরের 'বেহরণ' (খাস) কাছারি—সেটি হচ্ছে রাজার নিজস্ব (খাস কামরা), বাইরে দেওয়ানি কাছারি। বিচারপ্রার্থী প্রজাকুল উপস্থিত হওয়ার কথা মণিমার শ্রীকর্ণগোচর হওয়া মাত্র ত্বরিতে রত্নাদি আভরণে সজ্জিত হয়ে কাছারিতে এসে পড়তেন। চৌকিতে অবস্থান করে

দুই বাহু খুব উচ্চে উত্তোলন করে বলতেন, 'শান্ত হও, শান্ত হও—আমাদের শ্রীছামু লিখিত আজ্ঞা দেবেন।'

অভ্যস্ত দপ্তরি দোয়াতের মুখ অবধি কালিপূর্ণ করে দুইখানি সাদা কাগজ ও কলম শ্রীছামুর শ্রীকরসন্নিকটে রেখে দিত। শ্রীছামু লিখে আজ্ঞা করতেন—

'শ্রীচৈতন্য দেও ভঞ্জরাজা কেল্লা দশপল্লা এবং যোরমো।' শ্রীকর অবিশ্রান্ত চলতে থাকে। কাগজখানা ওল্টাবার সময় লিখিত কাগজের কালি দুটি পৃষ্ঠায় লিপ্ত হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে লেখা সমাপ্ত হয়ে গেলে কাগজ দুই খণ্ড শ্রীকরযুগলে ধারণ করে উপরে তুলে ধরে অগ্রপশ্চাৎ চতুর্দিকে উপস্থিত লোকদের দেখিয়ে প্রশ্ন করে কথা উত্থাপন করতেন—

'দেখ সকলে দেখ, আমাদের ছামু কেমন লিখিত আদেশ দিলেন। আমাদের 'দদেই'[১] কি এরকম লিখতে পারতেন? সত্যি কথা বলবে, হাঁ?' লোকদের মার খাবার জরিমানা দেবার কিম্বা জেল যাবার সম্পূর্ণ ভয়। উপস্থিত লোকেরা একবাক্যে খুব উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করত, 'আজ্ঞে না মহাপ্রভু। শ্রীছামুর ন্যায় লিখতে পারতেন না।' 'নয়াগড়ের রাজা খণ্ডপড়ার রাজা—আরো সব রাজারা এভাবে লিখতে পারেন?' লোকদের মুখ হতে উত্তর শুনবার পূর্বেই শ্রীছামু মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আন্দোলন করে আজ্ঞা করতেন, 'নারে বাবা না'। আমি নিকটেই আরেকটি চৌকিতে চুপচাপ বসে রাজার কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করি। সময় সময় ঘাম মোছার অজুহাতে রুমাল দিয়ে মুখের হাসি মুছে ফেলার প্রয়োজন হত।

ছামুর কাছারির কাজ সমাপ্ত হলে মাথা পর্যন্ত আমাকে ভাল করে একবার অবলোকন করে আদেশ করেন, তারপরে উপস্থিত সকলকে চোখের ইসারায় আমাকে দেখিয়ে দেন। এর অভিপ্রায়—'এ লোকটাকে দেখ, কিরূপ শীর্ণ দেহ অর্থাৎ নিবুদ্ধিসম্পন্ন।' একবার, দুইবার নয়, প্রতি মাসে পাঁচ-সাতবার কাছারিতে এইরূপ অভিনয় হয়।

বহু পূর্বের ঘটনা হলেও শ্রীছামুর বিদ্যার পরিচয় সম্বন্ধে আর দুটি কথা এ স্থানে উল্লেখ করার ইচ্ছা করি।

১ জেঠা। পূর্ববর্তী রাজা—আপন পিতার উল্লেখ এইরূপে করা হত।

গড়জাতের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত রেভেনশ সাহেব গড়জাত সফরের সময় দশপল্লা গিয়েছিলেন। রাজাসাহেবের অন্যায় বিচার সম্বন্ধে অনেকগুলি নালিশ উপস্থিত হওয়ায় সাহেবমহোদয় বললেন, "রাজাসাহেব, আপনি তো মূর্খ, রাজ্যের কাজ চালাতে পারবেন না। সরকারের তরফ হতে আমরা একজন দেওয়ান পাঠাব।' শ্রীছামু ত্বরিতে উত্তর করলেন, 'কি কি বললেন, কি বললেন সাহেব। আমাদের ছামু মূর্খ। আন কাগজ আন কাগজ, এই মুহূর্তে আমাদের শ্রীছামুর নাম আর কেল্লা দশপল্লা, যোরমো সব কথা লিখব। আমাদের 'দদেই' রাজা যিনি ছিলেন, তিনি ছিলেন মূর্খ।' দুঃখের বিষয় রাজাসাহেবের বিদ্যাবত্তার পরিচয় নিতে সাহেব ইচ্ছা করলেন না।

একবার শ্রীছামু কটক যাত্রা করেছিলেন। কটকে একটা কলেজবাড়ি আছে। সেখানে ছেলেরা লেখাপড়া করে, সেটা কিরূপ ব্যাপার দেখতে যাওয়া নিতান্ত দরকার। শ্রীছামু স্বয়ং কলেজে উপস্থিত হলেন। প্রফেসাররা খুব আদর যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে সকল শ্রেণীগুলি দেখালেন। তার পরে লাইব্রেরি ঘরে বসিয়ে ভিজিটার বই ও দোয়াতকলম শ্রীছামুর সম্মুখে রেখে দেওয়াতে শ্রীমণিমা খুসি হয়ে প্রশ্ন করলেন—'এটা কি, এটা কি?'

উত্তর—'আজ্ঞে এটি ভিজিটার বই—আপনি কলেজে কি দেখলেন সে বিষয়ে আপনার মন্তব্য এখানে লিখে দেবেন।'

রাজাসাহেব বললেন—'হাঁ, হাঁ, আমরা ছামু লিখে আজ্ঞা করব—বল, বল কোথায় লিখব।' একজন প্রফেসার ভিজিটার বইটি খুলে সম্মুখে রেখে দেওয়াতে শ্রীছামু লিখে আজ্ঞা করলেন—'শ্রীচৈতন্য ভঞ্জদেও রাজা কেল্লা দশপল্লা এবং যোরমো।' লেখা চলেছে তো চলেছে বিশ্রাম নেই। তিন-চার পাতা লেখা হয়ে গেছে—বই এবং টেবিলের অর্ধেক কালিতে ভরে গেছে। অবশেষে কলম রেখে দিয়ে শ্রীছামু ক্ষান্ত হলেন ও প্রস্থান করলেন। সে সময়ে বাঙালী প্রফেসর সবাই টেবিলের চারিদিকে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। শ্রীছামুর শ্রীহস্তের ক্ষিপ্রতা দেখে মনে করেছিলেন কতই না মতামত তিনি প্রকাশ করলেন। ডাক পণ্ডিতকে। পণ্ডিত পাতা দুটি দেখে হেসে কুটিপাটি—বলবেন আর কি? প্রফেসারেরা খুব এক চোট হেসে উঠলেন। ভিজিটার বইয়ের চারপৃষ্ঠা কালিময় হয়ে গিয়েছিল।

দেখলাম দশপল্লায় মামলা মকদ্দমা খুব কম হয়, চালানো খুব সহজ। মফঃস্বলের অধিকাংশ লোক ছিল কন্ধ ও খইরা। তারা সে সময় ছিল অত্যন্ত সরল ও নিরীহ প্রকৃতির। তাদের মধ্যে মামলা মকদ্দমায় বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী সকলে যথাযথ কথা বলে যেত। কারো কথার সঙ্গে কারো কথার গরমিল হত না।

রাজ্যের মধ্যে কন্ধ জাতীয় লোকের আধিক্য ছিল। তারা নিজেদের জমিদার বলত। রাজাকে কিছু মাত্র কর দিত না। কোন এক বছর কমিশনর রেভেনশ সাহেব কন্ধ জাতীয় পরগণার মোড়লদের ডাকিয়ে বললেন, 'তোমরা রাজার রাজ্যে আছ। কিছু অন্তত কর না দেওয়াটা ভাল নয়—কিছু কিছু কর দাও। প্রতি লাঙল পিছু কটকি এক সের হিসাবে ধান দাও। যে প্রজা যত লাঙলের চাষ করবে সে তত সের ধান দেবে।'

সমস্ত পরগণার লোক একত্র বসে ঠিক করল সাহেবটা যখন বলছে আমরা কর দেব। কিন্তু কটকি এক সের করে ধান দিতে পারব না। তারা ভাবল কে জানে কটকি একসের মানে হয়ত গোরুর গাড়িতে এক গাড়ি কি দুগাড়ি হবে। সাহেবকে তারা জানাল, 'আমরা লাঙল পিছু এক তাম্বি ধান দেব। কটকি একসের ধান দিতে পারব না।' এক তাম্বি ধান কটকি তিন কি চার সের হবে। এখন আমার মনে পড়ছে না। সাহেব এক তাম্বি ধানের পরিমাণ বুঝে তাতে সম্মত হলেন।

ঘুমুসর এবং দশপল্লার সীমানা সংক্রান্ত একটা তদন্ত করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় কন্ধদের গ্রামগুলি এবং গ্রামস্থ দেবতার পীঠস্থান ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কন্ধদের প্রধান চাষ হচ্ছে হলুদ। সেই হলুদের রং বাড়াবার জন্য কন্ধরা দেবতা স্থানে মেরিয়া অর্থাৎ নরবলি দিত। ১৮৩৬ সালে গভর্নমেণ্ট সেই নরবলি রহিত করে দিয়েছিলেন। উক্ত সালে সরকারের পল্টন গিয়ে বলিদানের জন্য রক্ষিত অনেকগুলি মানবশিশু কন্ধ মহালের ভিতর থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল। মিশনারিদের তত্ত্বাবধানে অবস্থিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত সেইরূপ অনেকগুলি শিশুকে আমি দেখেছি। আমি জানি, সেই শিশুদের পরিবার বর্ত্তমানে নানা জেলায় বিদ্যমান। ধন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট! ধন্য মিশনারিদের নরসেবা! আমরা আবার শ্রেষ্ঠ হিন্দুজাতি বলে অহংকার করি। পবিত্র ভারতভূমিতে বহু শতাব্দী যাবৎ

এই ভীষণ নৃশংস প্রথা চলে আসছিল। আমরা নির্বিকার চিত্তে দেখে যেতাম।

অতি সহজে, অতি সুবিধায় রাজকার্য চলছিল। কেবল আমার পক্ষে একটা অশান্তিকর বিষয় ছিল—রাজাসাহেব ভেবেছিলেন আমার পরামর্শ গ্রহণ না করা, আমার কার্যে বাধা দেওয়া তাঁর আধিপত্য ও মহিমা বিস্তারের উপায় স্বরূপ। সর্বদা স্পর্ধার সঙ্গে লোকেদের কাছে প্রকাশ করতেন, 'আমরা ছামু রাজা, আমরা কি আর দেওয়ানের কথা শুনব?' এইরূপ নির্বুদ্ধিতার জন্য সময়ে সময়ে বিপদেও পড়তেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা বিষয় উল্লেখ করছি।

একদিন সকালে রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় রাজা বললেন, 'দেওয়ানবাবু! আজ আমাদের ছামুর খুব সর্দি হয়েছে।' আমি বললাম, 'সর্দি যখন হয়েছে স্নান বন্ধ রাখুন।' রাজাসাহেব, 'কি বললে কি বললে দেওয়ান বাবু আজ আমাদের ছামুর দেহ মার্জনা হবে না?' আমি বললাম, 'সেইরূপ করলে ভাল হবে।' রাজাসাহেব, 'পাখলোক কে আছে রে, শীঘ্র জলের ভারীকে নিয়ে এস, আজ শীঘ্র আমাদের ছামু অঙ্গে জল দেবেন।' প্রকৃতই সেদিন অন্যান্য দিন অপেক্ষা শীঘ্রই স্নান করলেন, ফলে জ্বর হল।

রাজবৈদ্য কতবার এসে আমার কাছে বলতেন তিনি ছাড়া অন্য বৈদ্যর পক্ষে রাজাকে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। আমি কারণ জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, 'বৈদ্য যা নির্দেশ দেবে রাজা তার বিপরীত কার্য নিশ্চয় করবেন। সেইজন্য যা নিষেধ করার কথা আমি তার উল্টোটা নির্দেশ দি। যেমন টক্ দই দিয়ে উত্তম রূপে ভোজনের ব্যবস্থা করি।' রাজা আজ্ঞা করেন, 'আমরা ছামু রাজার বৈদ্যের কথা শোনা কি শোভা পায়? আজ কিছু আহার হবে না।' প্রকৃতই সেদিন কিছু না খেয়ে উপবাস করেন।'

কি খাদ্য কি পরিধেয় কি আমোদপ্রমোদ সমস্ত বিষয়ে তাঁর কিছু কিছু বিশেষত্ব ছিল। সমস্ত বিষয় ছিল নিতান্ত হাস্যজনক। রাজাসাহেবের ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল অতি চমৎকার। সমস্ত পৃথিবীতে পাঁচজন সাহেব আছেন এবং বিবি দুইজন। এই সাহেব বিবিদের কোথায় কি অবস্থায় দেখেছিলেন বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করতেন। পৃথিবীতে আরো সাহেব বিবি থাকলে শ্রীছামু অবশ্যই দেখতে পেতেন। সুতরাং আর সাহেব বিবি থাকা অসম্ভব। ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঞ্জর, নয়াগড় প্রভৃতি এই কটি জায়গার রাজাকে শ্রীছামু

তিন চার বার কটক সফরে গিয়ে দেখে এসেছেন। আর রাজা নেই এ জগতে— থাকলে নিশ্চয় কটকে আসতেন। শ্রীছামু তাদের দেখতে পেতেন। সকল রাজাদের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন এবং ন্যায় অন্যায় জ্ঞান সব বিষয়ে দশপল্লার শ্রীমণিমা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কটক, পুরী, বালেশ্বর এই তিনটী শহর আছে। বিদেশী লোক এর প্রতিবাদকারী হলে শ্রীছামুর দরবারে তার উপস্থিত হওয়া নিষেধ। দশপল্লাবাসীর পক্ষে জরিমানা এবং অনেক প্রকার দণ্ড অবধারিত। প্রায় প্রতিবৎসর শীতকালে গড়জাত মহালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা তাঁর অ্যাসিস্টেণ্ট সমস্ত গড়জাতের কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে সফরে বেরোতেন। আমার দশপল্লা দেওয়ানগিরির প্রথম বছরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেট্‌কাফ্ সাহেবের দশপল্লা সফরে আসার পরওয়ানা পেয়ে আমি ও রাজাসাহেব দুজন হাকিমকে প্রত্যুদ্‌গমন করার জন্য বেলপাড়া মুকামে গিয়েছিলাম। গড়ের দিকে আসার সময় সাহেবের হাতী আগে ছিল, মধ্যে রাজার হাতী পশ্চাতে আমার হাতী। একটি নীচু জমির খেতের মধ্যে সাহেব পশ্চাতে মুখ ফিরিয়ে বললেন—'রাজাসাহেব, খড়্গপুর হতে বিলাসপুর অবধি রেল লাইন খোলার গভর্নমেণ্ট হতে আদেশ হয়েছে।'

রাজাসাহেব—'কি কি—রেলগাড়ি চলবে? আচ্ছা সাহেব, সেই শকট ত এ ধরনের খেতের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে না?'

সাহেব—'না না রাজাসাহেব। সেজন্য পথ তৈরি হবে।'

রাজা সাহেব—'আচ্ছা সাহেব—আচ্ছা সাহেব—আচ্ছা সাহেব—পথ করতে তো অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে? পাঁচ-হাজার টাকা অবধি খরচ হতে পারে।'

সাহেব—'হাঁ, হাঁ, রাজাসাহেব। ঢের টাকা খরচ হবে।'

রাজা সাহেব—'দশ হাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে?'

সাহেব—"হাঁ, হাঁ, রাজাসাহেব। বহুত রূপেয়া খুব বহুত রূপেয়া।'

রাজাসাহেব—'পনেরো হাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে?'

ইত্যবসরে আমি ত্রস্তভাবে রাজাসাহেবকে পিছন হতে হাতের ইসারায় সাহেবকে টাকার বিষয় কিছু না জিজ্ঞেস করতে সংকেত করলাম। রাজাসাহেব আমার নিষেধ শুনবেন কেন, পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করে রাজাসাহেব রেল নির্মাণের খরচা কুড়ি হাজার টাকা অবধি উঠলেন। আর অধিক উঠতে তাঁর ইচ্ছে হল না।

কি মনে ভেবে বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেলেন। পৃথিবীতে এত টাকা কোথায় যে খরচ হবে? সব টাকা তো শ্রীছামুর কোষাগারে। আর টাকা আবার কোথায় আছে?

সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট সাহেব সমস্ত সেরেস্তা তদারক করে চলে গেলেন।

এর অল্পদিন পরে অকস্মাৎ একটি ভয়ানক বিপদ এসে উপস্থিত হল। প্রতিদিন রাত দশটার পূর্বে আমি আহারাদি সম্পন্ন করে শয়ন করতে যেতাম। সেদিন রাতে দশপল্লার ডাকমুনশীকে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ করেছিলাম। আহারাদি শেষ হতে রাত এগারোটা বেজে গেল। মুনশী বাসায় চলে গেলেন, আমি শয়ন করতে গেলাম। আমি শয়ন করার পর আমার নাপিত চাকর ঘরের ভিতর এসে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে আমার বিছানা হতে কিছু দূরে শয়ন করত। সেদিন অকারণে অনেক রাত অবধি শুতে না এসে বাইরে বসে রইল। সে শোবার উদ্দেশ্যে ভিতরে এসে যেই দরজা বন্ধ করেছে একটা গোখুরো সাপ চাল হতে আমার শোবার খাটের মাথার দিকে কিছু দূরে যেখানে নাপিত শোয় ঠিক সেই স্থানে ধুপ করে পড়ল। সাপটা ছিল বেজায় বড় ও লম্বা। এত বড় গোখুরো সাপ আমি কখনও দেখি নি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নাপিত ত্রস্তভাবে আমার গায়ে হাত দিয়ে 'উঠতে আজ্ঞা হোক' বলে যেই ডাকল আমি কিছু বুঝতে না পেরে কেবল প্রচণ্ড ভয়ে উঠে পড়ে আমার বিছানার কাছে রাখা পুস্তক, ল্যাম্প, কাগজ প্রভৃতিতে সজ্জিত গোলাকার টেবিলের উপর উঠতে গেলাম। আমি যেই টেবিলের পাদানিতে পা দিয়ে উঠতে যাব, একপায়া টেবিলটা আমার উপর উল্টে পড়ল। আমি মেঝেতে পড়ে গেলাম। টেবিলের উপরের জিনিষগুলি আমার উপর উজাড় হয়ে পড়ল। আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে বাইরে পালিয়ে এলাম। দেখলাম পরনের কাপড়টি রক্তময়। মূত্র-পিণ্ডে আঘাত লাগার দরুণ প্রস্রাবদ্বার দিয়ে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়ে আমার সমস্ত কাপড় ভিজে গেছে। প্রায় জ্ঞানহীন হয়ে মেঝেতে পড়ে রইলাম। অন্যান্য চাকরেরা মিলে সাপটাকে মেরে ফেলল। সে রাত্রে নাপিত চাকর ঘটনাচক্রে শুতে বিলম্ব যদি না করত, দুইজনের সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত ছিল। :প্রথম বেহুঁস হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলাম। অনেকক্ষণ অবধি যন্ত্রণাভোগের পর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হত। প্রস্রাব করার সময় দুইজন পরিচারক দুটি পাখা নিয়ে হাওয়া করত। এই প্রকার যন্ত্রণাভোগের চার পাঁচ দিন পরে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা

অবধি প্রস্রাব ও মল নিঃসরণ বন্ধ হয়ে গেল। জীবনের আশা পরিত্যাগ করে বিছানায় পড়ে আছি। এই সময় স্থানীয় আত্মীয়স্বজন এবং চাকরেরা আমাকে ভূতে পাওয়াতে প্রস্রাব ও মল বন্ধ হয়ে গেছে—স্থির করল। দেশের মধ্যে যত জবরদস্ত ওঝা ছিল সকলে উপস্থিত হয়ে ঝাড়ফুঁক এবং ঘরের চতুর্দিকে ভূতের পথ বন্ধ করার জন্য মন্ত্রপূত মাষকলাই ছড়াল এবং লোহার পেরেক পুঁততে লাগল। আমি কেবল দেখছি। মুখ খুলে কিছু বলবার শক্তি নেই। শেষে দক্ষিণ জঙ্ঘার মূলে ফেটে গিয়ে এক সের আন্দাজ পুঁজ ও রক্তের সঙ্গে প্রস্রাব বেরোতে লাগল। আট দিন পরে সহজ ভাবে প্রস্রাব হল, ক্রমশঃ ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেল। বিনা চিকিৎসায় কেবল প্রভুর মহাকরুণা প্রভাবে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম।

দশপল্লার দেওয়ানি (৩)

যোরমো দশপল্লা জেলার একটি স্বতন্ত্র অংশ, মহানদীর উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। এই অংশের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। কিন্তু নগদ টাকা গভর্নমেন্টকে দিতে হয় না। তার বদলে পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের রথ নির্মাণের জন্য প্রতিবছর কাঠ দিতে হয়। উৎকলের স্বাধীন রাজাদের আমল হতে এইরূপ বন্দোবস্ত চলে আসছে। যোরমোর উত্তরাংশে অনুগুল। অনুগুলের সরকারি জঙ্গলবিভাগের কর্মচারিরা অনুগুলের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত বনবিভাগ ক্রমশঃ বাড়াতে বাড়াতে যোরমোর গ্রামগুলি অবধি এসে পৌঁছেছে। মহানদী কূলস্থিত যোরমোর দক্ষিণাংশের :ভূমিখণ্ড ছিল শস্যক্ষেত্র। খেতের উত্তর ও পশ্চিম অংশে ছিল গ্রামশ্রেণী। গ্রামের ছাঁচতলার লাগাও অনুগুলের সরকার-সংরক্ষিত জঙ্গল। সুতরাং গ্রাম্য কৃষকদের একমাত্র সহায়স্বরূপ পশুদলের চারণের স্থানাভাব। গ্রাম্য পশুর দল ছাড়া পাওয়া মাত্র অনুগুলের সংরক্ষিত জঙ্গলে ঢুকে পড়ে আর সরকারি খোঁয়াড়ে চালান হয়ে যায়। কখনও কখনও সরকারি নিম্নশ্রেণীর পাইকেরা নিরীহ প্রজাদের কাছ হতে অর্থ আদায়ের লোভে অকারণে মাঠ হতে পশুর দল খেদিয়ে নিয়ে যায়। প্রজারা খোঁয়াড়ের মাশুল গুণতে গুণতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রজারা দশপল্লার রাজসমীপে আবেদন জানিয়ে আসছে, কিন্তু শোনবার কেউ নেই।

যোরমোর কয়েকজন মোড়ল এবং মুখ্য প্রজারা তাদের কষ্টের কারণ আমার কাছে প্রকাশ করে প্রতিকারের আশায় আমাকে খুব করে ধরল।

যোরমোর উত্তরাংশের অনেক জঙ্গল অনুগুলের জঙ্গলের সঙ্গে সরকারি ফরেস্টার হাকিম মিশিয়ে দিয়েছেন বলে প্রধানেরা প্রকাশ করল। আমি এ সমস্ত বিষয়ে রাজাসাহেবের দ্বারা গড়জাত মহালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে রিপোর্ট করাতে, অনুগুলের তহশীলদার, ফরেস্টার এবং দশপল্লার দেওয়ান একত্র হয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট করার জন্য সরকার হতে হুকুম এল। পূর্ববন্দোবস্ত অনুসারে নিরূপিত তারিখে আমি গিয়ে যোরমো গ্রামে উপস্থিত

হলাম। কটকে প্রথম অবস্থানকালে আমার একমাত্র সহায়, পরমবন্ধু রায় নারায়ণচন্দ্র নায়ক বাহাদুর সে সময়ে অনুগুলের তহশীলদার। ফরেস্টার সাহেব অবধি নিজ নিজ কর্মচারিদের সঙ্গে অকুস্থলে উপস্থিত হলেন। যোরমোর প্রজারা তাদের গ্রামসংলগ্ন বলে যে জঙ্গলের অংশ দেখাল তার বিস্তার প্রায় ২০/২৫ মাইলের কম হবে না। প্রাচীন সার্ভে ম্যাপ পরীক্ষা করলে তাদের উক্তির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়। কথা হচ্ছে, এর সীমানা কোনটা? গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে দুই পক্ষের হাকিম এবং কর্মচারিদের ডেরা লাগাও করে ফেলা হয়। বহুদিন পরে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে মিলন, একত্র পান ভোজন, অরণ্যে ভ্রমণ, সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি করে খুব আমোদপ্রমোদে কটা দিন কাটল। ঠিক সেই সময় গড়জাত মহলের ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পৌঁছে যাওয়াতে খুব জোর শিকার চলতে লাগল। সাহেবটি একনেত্রবিশিষ্ট কিন্তু উত্তম শিকারী। একদিন সকালবেলা সকলে মিলে শিকার করতে গিয়েছিলাম—সেই কানাসাহেব একটা মস্ত সম্বর মারলেন—আমাদের কাছ হতে অল্পদূরে গয়ালের পাল পালিয়ে গেল। পাথরের আড়াল হওয়ায় মারতে পারলাম না।

সীমানা সাব্যস্ত করায় উদ্দেশ্যে অনুগুলের তহশীলদার আমাকে অকুস্থলে রেখে অনুগুলের সদর কাছারিতে চলে গেলেন। আমি ম্যাপখানি হাতে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে সীমান্তরেখা খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুজতে যোরমোর উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা পর্বতের চূড়ায় একস্থানে একটি সার্ভে স্টেশনের চিহ্ন পেলাম। ম্যাপের সঙ্গে ডিগ্রী মিলিয়ে পূর্বদিকে সরলরেখা অনুযায়ী পাহাড়ের গায়ে এক রেখা কেটে গেলাম। যোরমোর ঈশানকোণে সেই পর্বতের শেষ সীমাটা হুবহু অনুগুল, নরসিংহপুর, যোরমো এই তিন জায়গার সীমার মিলন-স্থান। নরসিংহপুরের দেওয়ান দলবল নিয়ে ছুটে এলেন। তাঁর অভিযোগ হল – নরসিংহপুর রাজ্য এলাকা হতে কত জঙ্গল যোরমোর জঙ্গলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে তিনি ভয়ঙ্কর বাদানুবাদ সুরু করলেন। কর্মক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদের কথা শুনে কেউ অনুমান করতে পারলেন না যে আমরা পূর্বহতে উভয়ে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ অথবা পরিচিত লোক। আমার যতদূর সম্ভব মনে পড়ছে নরসিংহপুর আর যোরমোর মধ্যস্থলে একটি পার্বত্য ক্ষুদ্র নদী থাকায়, আমাদের মধ্যে বিবাদটা আর অগ্রসর হতে পারল না।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেটকাফ্ সাহেব অনুগুল সদর কাছারি মুকামে নির্ধারিত মাস ও তারিখে সীমা বিবাদমামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে দিন ধার্য করে স্বয়ং হাকিম অঃ সুঃ রায় নন্দকিশোর দাস বাহাদুরের সঙ্গে সদর মুকামে উপস্থিত হলেন। আমিও সরকারি চিঠি পেয়ে নির্ধারিত তারিখে তিনচার দিন পূর্ব হতে উক্ত স্থানে উপস্থিত হলাম। সেই সময় ঢেঙ্কানলের ম্যানেজার বাবু সুদামচন্দ্র নায়ক (পরে রায় বাহাদুর) স্বয়ং সাহেবের সঙ্গে সেস্থানে এসেছিলেন। সমস্ত বন্ধুবান্ধব একত্র হয়েছে। একত্র পানাহার, গল্প আমোদ প্রমোদের মধ্যে অর্ধেক রাত্রি অতিবাহিত হল। প্রভাত হতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত সকলে আপন আপন কার্যে নিযুক্ত থাকত। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সীমান্ত মকদ্দমার তদন্ত করলেন।

মামলার সমস্ত কথা শুনে গেলেন। কেবল সর্বশেষ রায় দিলেন না। আমি দশপল্লা হতে চলে আসার দুইবছর পরে অন্য আর একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মামলার শেষ তদন্ত করলেন। আমি যে লাইন কেটে এসেছিলাম সেই সীমারেখা সাব্যস্ত করে তিনি শেষ নিষ্পত্তি করে দিয়ে গেলেন।

অনুগুল হতে যোরমোয় ফিরে এলাম। যোরমোর মহানদীর কূলে কূলে অনেক আমবন আছে। মহানদীর প্রবল বন্যায় নদীগর্ভ হতে বালি উঠে আমবনের অনেক গাছ আধা আধি পুঁতে গিয়েছিল। আমি যে বছরের কথা বলছি, সে বছর গাছগুলিতে যথেষ্ট আম ফলেছিল। থোকা থোকা আম বালিতে পড়ে লুটোচ্ছিল। আমবনের গাছের গোড়া হতে মহানদী অবধি নদীর দক্ষিণ পারে গিরিমালা ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত বরমূল ঘাটের স্বাভাবিক দৃশ্য অতীব মনোহর। সেই প্রকৃতির সায়াহ্নিক মনোমোহন দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়ে পক্ষাধিক কাল আম্রকুঞ্জের মধ্যে থেকে গেলাম। আমি যে আমবনের মধ্যে ছিলাম সেখান হতে পশ্চিম দিকে কিছু দূর অন্তর মহানদীর কূল ধ্বসে পড়ে একটা ঘাই[১] হয়ে গিয়েছে। নদীতে বন্যার সময় সেই ভাঙা বাঁধে মহানদীর জল ঢুকে যোরমো এলাকার শস্যক্ষেত্র সব ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় কৃষকদের ভয়ংকর ক্ষতি সহ্য করতে হত। প্রজারা আমাকে সেই ঘাই দেখিয়ে তার ভীষণ অনিষ্টকারিতার বিষয় আমার কাছে প্রকাশ করল। সেই ঘাইয়ের উত্তর দিকস্থ ভূমির পাশে অল্পদূরে একটি পাহাড় আছে। আমার যেন মনে হচ্ছে, এই

১ বাঁধ ভেঙে জল নির্গমনের পথ।

অনধিক উচ্চ পর্বতটি অভ্যন্তরের গিরিমালার শেষাংশ। যোরমো এলাকার সমস্ত প্রজাদের আনিয়ে ঘাইতে বাঁধ দেওয়ার প্রস্তাব করলাম। সকল প্রজা আনন্দের সঙ্গে সম্মত হল। স্থির হল প্রত্যেক প্রজা এসে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজে নিযুক্ত থাকবে। সকাল বেলাটা সেই কর্মস্থানে চিঁড়ে আহার করার জন্য দুই তিন পয়সা হিসাবে প্রত্যেক প্রজাকে দেওয়া হবে। আমি নিজের হাতে সেই পয়সা দেব বলে স্বীকৃত হলাম। পরের দিন প্রাতঃকাল হতে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। নিকটবর্তী পর্বত হতে একজন দুইজন ও তিনজন দ্বারা বাহিত বিভিন্ন জঙ্গলের প্রস্তর খণ্ড বাঁধে ফেলতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যে বাঁধ তৈরি হয়ে গেল

বাঁধ তৈরির কাজ সহজে সম্পন্ন হওয়ায় আমি আনন্দের সঙ্গে প্রজাদের একটা ভোজ দিলাম। কয়েকজন তীরন্দাজ গিয়ে বনের মধ্যে হতে পাঁচটা সম্বর মেরে আনল। আম বনে খন্দা[১] তৈরি হল।

ডাল ভাত, কাকরা পিঠে, মাংসের তরকারি সহযোগে একটি সুন্দর ভোজ সম্পন্ন হল।

আমি শুনতে পাই, সেই বাঁধ এবং সীমান্ত পাহাড়ের সঙ্গে এ পর্যন্ত আমার নাম যুক্ত হয়ে আছে। কটক কলেজিয়েট স্কুলের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রথ বাণীভূষণ নিজে একজন উৎকলের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু লোক। তিনি কর্ম হতে অবসর প্রাপ্তির সময়ে উৎকলের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করে প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ করেন। তাঁর অনুসন্ধানের কয়েকটি বিষয় সম্প্রতি সাধারণের গোচরে এসেছে। ইদানিং বাবু চিন্তামণি আচার্য এবং বাণীভূষণ মহাশয়কে ঐতিহাসিক তথ্য এবং প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকতে দেখতে পাই। এখন অবধি উৎকল সাহিত্যজগতে এই বিষয়ের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। উক্ত দুই উৎসাহী ব্যক্তির কার্যকলাপ দেখলে অবস্থার রূপান্তর ঘটবে বলে সম্পূর্ণ রূপে আশা করা যায়।

মৃত্যুঞ্জয় বাণীভূষণ তাঁর দশপল্লা ভ্রমণ বিবরণ ১৩২০ সালের মুকুরের অষ্টম ভাগ মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় যা প্রকাশ করেছেন, তার শেষ পরিচ্ছেদের এক অংশ নিচে দেওয়া হল :

১ প্রায় দশ ফুট লম্বা ও একফুট চওড়া গভীর একটা গর্ত করা হয়। দুদিকে দু তিনটে হাঁড়ি বসিয়ে রান্না করা হয়।

'সুখের কথা, যোরমো অঞ্চলে আমাদের ভক্তিভাজন প্রবীণ কবি ফকীরমোহন সেনাপতির নাম একটি পর্বত ও একটি বাঁধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। দশপল্লার দেওয়ান থাকার সময় এই যোরমো অঞ্চলের সঙ্গে অনুগুলের সীমানা নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। তাঁর চেষ্টা ও অনুকূল মতের ফলে প্রজারা উপদ্রব হতে মুক্তি পেয়ে সীমান্তের একটি পর্বতকে সেইদিন হতে অদ্যাবধি 'ফকীরমোহন ডুঙ্গুরি (পর্বত)' বলে আসছে। মহানদীর বন্যা যে অবনত অংশে প্রবাহিত হয়ে সেই অংশটিকে জলপ্লাবিত করে ফেলছিল সেই অংশে কর্মবীর ফকীরমোহন প্রজাদের একত্র করে একটি পাথরের বাঁধ নির্মাণ করান এবং তার ফলে বন্যার জলের উপদ্রব হতে স্থানটি রক্ষা পাওয়ায় স্থানীয় লোকেরা এটিকে 'ফকীরমোহন বন্ধ (বাঁধ)' নাম দিয়েছে। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী এই সহজ সুন্দর স্মৃতি রক্ষার পদ্ধতি সভ্য সমাজের পক্ষে শিক্ষণীয় নয় কি?'

দশপল্লা মধুবনস্থিত নিজগড় হতে বেলপড়া গ্রাম অবধি একটা রাস্তা তৈরি করব মনস্থ করেছিলাম। মোদ্দা কথা, পথ তো এমনিতেই আছে, লোকে বরাবর যাওয়া আসা করছে। টাকা খরচ করে রাস্তা তৈরি করা আবার কেমন কথা! তথাপি আমি নিবৃত্ত হলাম না। জেলখানায় কয়েদীদের দিয়ে রাস্তা তৈরি সুরু করিয়ে দিলাম। বন্দীদের দ্বারা কাজ আদায় করা সহজ কথা নয়। বিশেষ করে পাণ[১] বন্দী। দক্ষিণ পশ্চিম গড়জাতের জেলখানার প্রায় সমস্ত কয়েদী ছিল পাণ। সে সমস্ত অঞ্চলে বুণা আর ওড়িআ দুইজাতের পাণ আছে। চুরি করা ছিল ওড়িআ পাণদের একপ্রকার জীবিকা বিশেষ। বুণা পাণেরা সাধারণত চুরি করে না, কাপড় বোনা এদের ব্যবসা। প্রাতঃকাল হতে বেলা নয়টা অবধি কয়েদীদের সঙ্গে থেকে রাস্তা তৈরিতে লেগে থাকতাম। প্রায় আধমাইল পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। এই সময় রাজাসাহেবের একটি পুত্র সন্তান জাত হওয়ায় কয়েদীরা মুক্তিলাভ করে আপন আপন ঘরে চলে গেল। সুতরাং রাস্তা নির্মাণ ওইখানেই ইতি।

সরকার বাহাদুরের প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করার পূর্বে অন্যান্য বিভাগের মতো জেল বিভাগের কার্যপ্রণালী অবধি শিথিল ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। কয়েদীদের পুত্র কন্যার বিবাহ কিম্বা কোন সামাজিক ক্রিয়া কর্ম থাকলে তারা ছুটি নিয়ে বাড়ি আসত। কার্য সমাপ্তির পরে আপনা হতে সকলে জেলে

১ অস্পৃশ্য জাত বিশেষ।

উপস্থিত হয়ে যেত। আবার জেল রক্ষকদের কতকগুলি চিহ্নিত কয়েদী থাকত। সন্ধ্যার পরে জেল রক্ষক সেই কয়েদীদের ছেড়ে দিতেন। সমস্ত কয়েদীদের পরের দিন প্রাতঃকালে নিজ নিজ জায়গায় শুয়ে থাকতে দেখা যেত। কয়েদীদের রাত্রের উপার্জিত চোরাই মাল জেল রক্ষক ও চোরেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যেত।

'আহার পরিধেয় কথোপকথন আমোদপ্রমোদ অন্যান্য সমস্ত বিষয় রাজাসাহেবের আচরণ অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অমানুষিক ছিল। রাজাসাহেবও প্রত্যেক বিষয়ে সর্বদা বলতেন, 'আমরা ছামু কি আর সাধারণ মানুষ আমরা রাজা মাজিস্টর, যাহা আজ্ঞা করবেন তাহাই ঠিক।' রাজাসাহেবের পরিধেয় বস্ত্র ওসারে চারহাত, লম্বায় পনেরো ষোল হাত। শ্রীছামুর চলা ফেরার সময় নাপিত কোঁচা ধরে পিছু পিছু চলত। গঞ্জাম অন্তর্গত ব্রহ্মপুরে বিন্ধানী[১] রত্ন নামে এক জনের বাস ছিল। শ্রীছামুর জন্য সে কাপড় বুনে দিত। শ্রীছামুর চাপকান তৈরি করার কাপড়ের যতই ওসার থাক দশ বার গজ কাপড় লাগত। সেই বিচিত্র চাপকানের আকার বর্ণনাতীত। দরজি সামান্য আপত্তি করলে তাঁর আজ্ঞা হয়, 'ওরে কটকের বাবুগুলা কাঙাল, তাদের কাপড় কেনার টাকা কোথায়। দেখেছিস্ দেখেছিস্ বুকে কেমন কাপড় টান হয়ে আছে। দে দে আরও চার গজ কাপড় বাড়িয়ে পিঠ ও ছাতি ঢিলে করে দে।'

শ্রীছামুর মনোহির[২] যোগ্য ব্যঞ্জন খুব বড় বড় কয়েক ফালা আমসির সঙ্গে পনেরো কুড়ি দিনের পচা দই আর এক আঁজলা ধানী লঙ্কার একত্র পাক। বড় বড় লঙ্কায় ঝাল থাকে না। পনেরো দিনের পচা পোকাপড়া শুটকী মাছ কিম্বা মাংস রান্না হয়। রান্না ঘরে অবশ্য অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য পাক হয়, কিন্তু উপরোক্ত ওই দুইটি ব্যঞ্জনই শ্রীছামুর ভোগের যোগ্য ব্যঞ্জন। সবকিছুতে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ ঘি ঢালা চাই। কপি, মটর, সালগম এবং মুলো প্রভৃতি আনাজের নাম দশপল্লায় কেউ তখন অবধি শোনে নি। আমি প্রথম সেই রাজ্য এলাকায় এইসব সবজির চাষ আরম্ভ করিয়ে ছিলাম। অনেক চেষ্টা ও অনুরোধ করা সত্ত্বেও রাজাসাহেবকে এইসব সবজি খাওয়াতে পারি নি। একবার কি দুবার মাত্র রাজার রান্না ঘরে রান্না হয়েছিল। শ্রীমণিমার

১। ভাল কারিগর।
২। রাজারাজড়ার ভোজনকে বলা হয় 'মনোহি'।

ছামু একবার মাত্র শ্রীমুখে স্পর্শ করে ফেলে দিলেন। অনেক কপির চাষ করিয়ে ছিলাম। প্রজা এবং প্রধানেরা কপির আস্বাদন পেলে তারা সেই আনাজের চাষ করায় প্রবৃত্ত হবে এই উদ্দেশ্যে আমি তাদের সেধে সেধে বড় বড় বাঁধাকপি দিতাম। জিজ্ঞেস করতাম, 'কপি কেমন লাগল?' উত্তর পেতাম 'আজ্ঞে—আজ্ঞে—এঁ্যা।' মোদ্দা কথা তাদের অনিচ্ছার সঙ্গে কপি নিতে দেখতাম। একদিন দশপল্লা এলাকার খণ্ডপড়া নামক গ্রামের প্রধান করযোড়ে সাহসপূর্বক বলল, 'আজ্ঞে! আমাদের আর এ পদার্থগুলি দেবেন না, যত রকমে রাঁধলাম ভাল লাগল না। গত কাল খোদ আম্‌সি দিয়ে রান্না করলাম তবুও হাঁ—ই—আঁ—তার গন্ধ মরল না।' অনেক কপির চাষ করেছিলাম, অধিকাংশ গোরুতে খেল।

রামনবমী কি দোল যাত্রা মনে পড়ছে না পর্ব উপলক্ষ্যে খুব সমারোহ উপস্থিত। রাজ্যের সব প্রধান ও অনেক প্রজা একত্রিত। গঞ্জাম ব্রহ্মপুর কটক এবং অন্যান্য গড়জাত অঞ্চল হতে, বাই, গোটিপুঅ[১], রামলীলা পালাগান প্রভৃতি দশ পনেরোটা দল এসে উপস্থিত। প্রতিবছর পালাপার্বনে তাদের আসা রেওয়াজ ছিল। সন্ধ্যার পর শ্রীছামু রাজবাড়ির বাইরে দোল মণ্ডপে বিজে হলেন। মণ্ডপের উপর গালিচা ও বড় বড় তাকিয়া দিয়ে শ্রীছামুর উপবেশনের জন্য সিংহাসন প্রস্তুত হয়েছিল। সিংহাসনে অবস্থান করার পর শ্রীমস্তকে পাগড়ি লাগানো ও শ্রীঅঙ্গে অলংকার ধারণ করার কার্য আরম্ভ হল। নানা রংয়ের জড়োয়া রত্ন খচিত খুব ভারি ভারি অনেকগুলি সোনার অলংকার গায়ে পরতে আধ ঘণ্টা সময় কেটে গেল। সেই সময় আটটি মশাল জ্বলছিল। নাপিতদের প্রতি বারংবার আজ্ঞা হতে লাগল, 'ওরে মশালে তেল দিয়ে দে। ভাল করে আলো হোক।' নাপিতেরা রাজার খুব কাছাকাছি মশাল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তথাপি পুনঃ পুনঃ আদেশ করলেন, 'আমাদের ছামুর শ্রীঅঙ্গে ধারণ করা অলংকারগুলি সকলে দেখুন।' নাপিতগুলি খুব কাছ ঘেঁসে মশাল ধরে দাঁড়িয়েছিল, তা সত্ত্বেও বারংবার তিনি আজ্ঞা করেন, 'মশাল কাছে ধর।' এধারে মশালচিরা ভয়ে মরে, পাছে জ্বলন্ত মশাল শ্রীমুখে লেগে যায়। অলঙ্কার ধারণ করার পর নিকটে উপস্থিত লোকেদের জিজ্ঞেস করা হল, 'আমাদের ছামুকে

১ স্ত্রীবেশে পালাগান ও নৃত্যকারী অল্পবয়স্ক বালক। গোটি (একটি), পুঅ (পুত্র)। সঙ্গে একজন বেহালাবাদক থাকে।

খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, নয় কি?' প্রকৃতই রাজাকে সে সময়ে পুরাণ বর্ণিত সিংহাসনে আসীন রাজার মতো মনে হচ্ছিল।

সেরূপ সুন্দর সুগঠিত বিশাল দেহ ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ, শাল প্রাংশু মহাভুজ স্বরূপ। এর পর সংগীত আরম্ভ হল। যতরকম সংগীতকার উপস্থিত ছিলেন সকলের বাদ্য যন্ত্র অর্থাৎ সারঙ্গ, বাঁয়া তবলা, মৃদঙ্গ পাখোয়াজ, বেহালা, মন্দিরা, করতাল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রকারী বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে যার যা ইচ্ছা একসঙ্গে বাজাতে লাগল। 'গোটিপুঅ,' 'লীলাপিলা,'[১] নর্তকী পালাগানকারীরা ধান মাড়াই করার বলদের ন্যায় ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গান গাইতে লাগল। সে যে কি অপূর্ব অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, যাঁরা সংগীতের রস গ্রহণ করেছেন তাঁরাই বুঝবেন, তাছাড়া বুঝিয়ে দিতে আমি অক্ষম।

সময় সময় ব্রহ্মপুরের নর্তকীদের দল নিজ নিজ শিক্ষা নৈপুণ্য দেখিয়ে অর্থোপার্জনের আশায় দশপল্লার শ্রীমণিমার সমীপে আসতেন। তারা যুবতী সালংকারা আপন আপন ব্যবসা অর্থাৎ সংগীতকুশলতায় পারদর্শী অপিচ একটি দোষের জন্যে সব গুণ বৃথা হয়ে যেত। অর্থাৎ তারা মোটা নয়, সুতরাং অসুন্দরী। সংগীতবিদ্যায় অনিপুণা তাদের সঙ্গিনী দাসীটি কালো কুৎসিত বুড়ি হলেও নাচ গান না জানলেও যদি মোটা হয়ে থাকে, সেই স্ত্রীলোকটি শ্রীমণিমার দরবারে লাফালাফি করে কেবল চেঁচামেচি করলেও পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য হত।

আমার দশপল্লা যাবার পূর্বে অন্য দুইজন দেওয়ান গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে রাজার বনিবনা না হওয়াতে তাঁদের অন্যত্র বদলি করা হয়েছিল। দশপল্লা যাবার সময় নন্দকিশোর বাবুকে বললাম, 'সেই দেওয়ানদের সঙ্গে রাজার মনের মিল হল না কিন্তু আমি রাজাকে ঠিক পটিয়ে নেব।' নন্দকিশোরবাবু ছিলেন লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আচ্ছা ভাল কথা, আগে দশপল্লায় যাও ত—' নন্দকিশোরবাবু যে ভাবে হেসে হেসে কথা বললেন তা থেকে আমি বুঝলাম, তাঁর বিশ্বাস ছিল আমি পারব না। আমিও হাসতে হাসতে মনে করলাম, আচ্ছা আপনাকে দেখিয়ে দেব।

এখন থেকে সবসময় রাজাসাহেবের সঙ্গে মতান্তর হতে লাগল। রাজা সাহেবের বিশ্বাস হল আমার মত অনুযায়ী কাজ করা অথবা আমার প্রস্তাবে

১ পিলা—অল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা।

সম্মতি দেওয়া তাঁর পক্ষে অগৌরবের বিষয়। সব সময় লোকেদের বলতেন, 'আমরা ছামু হচ্ছি রাজা, দেওয়ানের কোন কথা আমরা শুনব না।'

রাজাসাহেবের সঙ্গে আমার ক্রমশঃ মতান্তর ও মনান্তর ঘটতে লাগল। এরূপ কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দিলাম।

রাজাসাহেবের অভ্যাস ছিল যে কোন শ্রেণীর হোক বিদেশী ভদ্রলোক তাঁর নিকটে উপস্থিত হবা মাত্র রাজাসাহেব খুব চেঁচিয়ে বলতেন, 'আরে ভাণ্ডারী, এই বাবুকে আমাদের ছামুর তোষাখানা দেখিয়ে আন।'—ভাণ্ডারী আগন্তুককে নিয়ে ভাণ্ডারে রক্ষিত চেলী, সোনা, রূপা সমস্ত একটি একটি করে দেখিয়ে আনত। রাজাসাহেব জিজ্ঞেস করেন, 'ওহে বাবু, এত পাট-কাপড় এত সোনা রূপা আর কারুর ঘরে আছে কি? না বাবা না! আমরা ছামু রাজা আমাদের না থাকলে, আর কারুর ঘরে কি থাকবে?' রাজার স্বভাব সকলের জানা ছিল, আগন্তুক কোন কার্য উপলক্ষ্যে এসেছেন। রাজার কথা অস্বীকার করলে কাজ ত হবেনা অধিকন্তু মার খেয়ে পালাতে হবে। আগন্তুক বলতেন, 'আজ্ঞে আজ্ঞে শ্রীছামু রাজা—শ্রীছামুর ভাণ্ডারে না সব সম্পত্তি থাকবে! আর কারুর বাড়িতে এত আসবে কোত্থেকে?'

এ সমস্ত দেখে শুনে আমার মনে লজ্জা এবং দুঃখের সঞ্চার হত। খুব ধীরে ধীরে সম্মানের সঙ্গে রাজাকে বলি, 'আজ্ঞে, বিদেশী লোকেদের তোষাখানা দেখাবেন না। শহরের মতো জায়গায় অনেক মুদি, বিধবা আর সাধারণ লোকেদের ঘরে অবধি আপনার তোষাখানার দ্রব্য হতে ঢের ঢের পরিমাণে সোনা, রূপা ও কাপড় আছে। যে সমস্ত লোক আপনার ভাণ্ডারে অল্প জিনিষ দেখে যাচ্ছে তারা আড়ালে হাসবে ও ঠাট্টা করবে।'

আমার কথা শুনে রাজাসাহেব রেগে গম্ভীরভাবে বসে থাকেন। আমি বেরিয়ে এলে কাছের লোকেদের বলেন, 'শুনলে ত, শুনলে ত, দেওয়ান আমাদের ছামুকে কি রকম অপমান করে গেল। এই দেওয়ানের সঙ্গে আমাদের শ্রীছামুর বনবে না। আমলা পাঞ্জিয়ারা[১] সব বুঝতে পারেন, কেবল ভয়ে ভয়ে বলেন, 'আজ্ঞে, আজ্ঞে, শ্রীছামু যে আদেশ দেন, তা সত্যি নয়ত কি? দেওয়ান বাবুটা ভাল লোক নয়।'

১ এক শ্রেণীর রাজ কর্মচারী, এরা করণ (কায়স্থ)।

একদিন রাজাসাহেবের সঙ্গে আমার মনান্তরের একটা বড় কারণ উপস্থিত হল। পূর্বে অনেক ভ্রমণকারী নাগা সাধু দলবদ্ধ হয়ে ওড়িশায় আসত। দেবপূজার বাহানায় গ্রাম হতে অর্থ লুণ্ঠন করা এদের ব্যবসা ছিল। অনুসন্ধান করে সেই দলবদ্ধ লোকেদের ভিতরের কথা আমি জানতে পারি। অনেক ছোট জাতের লোক, চোর ডাকাতরাও অঙ্গে বিভূতি মেখে সাধু সেজে সেই দলে ভিড়ে যেত। মফঃস্বলের গ্রামবাসীরা তাদের ঠাকুরপূজো, সাধুসেবার জন্য যথেষ্ট টাকা না দিলে লোকেদের ঘরের খুঁটি, দরজা ভেঙে এনে ধুনিতে জ্বেলে দিত।

দশপল্লার কোন একটি মফঃস্বল গ্রামে সাধুদের দল উপস্থিত হল। সেই গ্রামে একটি বিত্তবান গোয়ালা ছিল। সে সাধুসেবার জন্য যথেষ্ট টাকা না দেওয়াতে দুইজন সাধু তার ঘরের ভিতর ঢুকে খুঁটি ও কবাট ভাঙতে সুরু করল। গোয়ালা সাধু দুজনকে ধরে খুব প্রহার করাতে তারা এসে রাজাসাহেবের কাছে অভিযোগ করল। সেই গোয়ালার গোরু ও মহিষের পাল এবং তার ঘরে অনেক টাকা থাকার কথা পাখলোকেরা জানিয়ে দেওয়ায় শ্রীছামু আদেশ করলেন 'অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি? গোয়ালা বেটা সাধুদের প্রহার করল?' পুলিশ দারোগাদের প্রতি হুকুম হল, 'যাও গোয়ালার গোরু মহিষ সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে এস।'

ওই ধরনের একটি পুলিশ দারোগা সে সময় রাজার কাছারিতে নিযুক্ত ছিল। তার পক্ষেও কিছু লাভ করার মওকা এল। ঘর ক্রোক করায় তার পকেট পূর্ণ হবার সম্ভাবনা। সে পাইক সংগ্রহ করার সময় গোয়ালা ছুটে এসে আমার কাছে কাতর হয়ে মাটিতে গড়াতে লাগল। আমি কাছারিতে উপস্থিত হয়ে মাল ক্রোকের হুকুম বন্ধ করে দিলাম। পুলিশ দারোগা আমার সাক্ষাতে রাজাকে বোঝাল এরূপ অপমানিত হলে সাধু সন্তের দল এ রাজ্যে আর আসবে না। রাজ্য হতে ধর্ম ছেড়ে যাবে। আমি ধমক দিয়ে তাকে চুপ করালাম। প্রহৃত অভিযোগকারী সাধু দুজন দাঁড়িয়েছিল। তাদের বললাম, 'এখনই রাজ্য হতে বেরিয়ে অন্যত্র চলে না গেলে তোমাদের কয়েদ করব।' আমার কথা শুনে তারা তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল। এইভাবে রাজাসাহেবের সঙ্গে মনান্তর উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেট্কাফ্ সাহেব দশপল্লা রাজ্যের কাজকর্ম তদারক করতে আসবেন। কন্দমাহাল মুকাম অফিস হতে তাঁর সফরের চিঠি পেয়ে তাঁকে

এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য দশপল্লার সীমানা কুলুরকুম্পা গ্রাম অবধি গেলাম। একসঙ্গে গড় মুকামে এলাম। গড় মুকামে সাহেবমহোদয় একটি একটি করে সমস্ত বিভাগ তদারক করলেন। শেষ দিনে রাজাসাহেব বললেন, 'এই দেওয়ানের সঙ্গে আমাদের বনবে না। আমাদের আর এক জন দেওয়ান দিন।' আমি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আমার কার্যে কোন দোষ পেলেন কি।' সাহেব বললেন, 'আমরা ত আপনার কোন দোষ দেখছি না। রাজাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনিও কোন দোষ দেখাতে পারলেন না। তবে রাজার সঙ্গে যখন মনের মিল হচ্ছে না, তোমার পক্ষে এ ক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব হবে কি?' সাহেবমহোদয় আমাকে ময়ুরভঞ্জ এলাকায় বামনঘাটি সাবডিভিশনে নিযুক্ত করে কমিশনর কাছারির একজন কেরানীকে দশপল্লার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন।

আমি নূতন দেওয়ানকে চার্জ বুঝিয়ে কটকে চলে এলাম। বালেশ্বর হতে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী স্থানে কাজ হল ভেবে মনে খুব আনন্দ হল, কিন্তু কটকে উপস্থিত হবা মাত্র অ্যাসিস্টান্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নন্দকিশোরবাবু আমাকে বললেন, 'স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছোটরায়বাবুকে খোদ গভর্নমেণ্ট বামনঘাটিতে নিযুক্ত করেছে।' অগত্যা বেকার অবস্থায় আমাকে কটকে বসে থাকতে হল।

পাললহড়াতে দেওয়ানি

কিছুদিন পূর্বে পাললহড়ার প্রজারা সেখানকার রাজাসাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় প্রধান প্রধান বিদ্রোহীরা ধরা পড়ে দণ্ডভোগ করছিল। আর কোন কোন বিদ্রোহীদের সর্দার আত্মগোপন করে ছিল। পুনর্বার কেউ বিদ্রোহ আরম্ভ করলে তাদের ধরে বিচারপূর্বক দণ্ড দেবার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়ে পাললহড়া পাঠালেন। আমি গিয়ে দেখলাম বিদ্রোহী সর্দারেরা দণ্ডিত হওয়ায় অন্যান্য বিদ্রোহীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে নিবিড় অরণ্যদেশে পালিয়ে গেছে। অন্যান্য প্রজারা নীরব হয়ে আছে। কোনরকম মামলা মকদ্দমা নেই। রাজ কাছারি শূন্য। আমার হাতে সম্প্রতি কোন কাজ নেই। সকাল বেলাটা মহাভারত অনুবাদ করে কাটে। বিকেল্ বেলা রাজাসাহেবের একজন বেরাদার বাবু, পুরোহিত মহাপাত্র মহাশয় এবং আরো দুজন ব্রাহ্মণ আসেন। সন্ধ্যা অবধি পাশা খেলা হয়। সন্ধ্যার পর আর কেউ ঘর হতে বার হন না। সে সময় পাললহড়া অত্যন্ত অরণ্যময় ছিল। সন্ধ্যার পর বাঘ ভাল্লুক গাঁয়ের পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াত।

অপরাহ্নে একদিন আমি রাজাসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই। রাজা সাহেব অতি ভদ্র, বুদ্ধিমান, মিষ্টভাষী কিন্তু অসঙ্গত দাতা। এই দানশীলতার জন্য তিনি অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন লোক মুখে শুনতে পেলাম রানীসাহেবা রাজ ভগিনীগণ যেমন পুণ্যবতী সেইরকম দানশীলা।

রাজাসাহেব কি ধরনের অসঙ্গত দানশীলতার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন সে বিষয়ে অনেক কথা শুনেছিলাম। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি। কটকে একজন দরিদ্র কাবুলিওয়ালা ঘুরে বেড়াত। স্বজাতীয় লোকেদের কাছে ভিক্ষা করে তার চলে। পাললহড়ার রাজার কাছে কিছু টাকা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য অন্যান্য কাবুলিওয়ালারা তাকে পরামর্শ দিল। কিন্তু কথা উঠল খালি হাতে সে কিভাবে রাজার কাছে যাবে। কটকের সব কাবুলিওয়ালা মিলে তিন চার টাকা চাঁদা তুলে তাকে একটি বিলিতি কম্বল

কিনে দিল। সেই বাণিজ্যদ্রব্য নিয়ে সওদাগর সাহেব পাললহড়ায় উপস্থিত। সওদাগরদের পরামর্শ অনুযায়ী সওদাগর কম্বলখানি আমাদের ছামুর সম্মুখে রেখে সেলাম করে বেরিয়ে এলেন। রাজ্যের প্রচলিত প্রথা অনুসারে খাজাঞ্চি খানার রক্ষক সওদাগরকে প্রতিদিন একটাকা করে খোরাকি দিচ্ছিল। এদিকে সওদাগর 'সরঘর' (ভাঁড়ার ঘর) হতে চাল ডাল চেয়ে এনে খায়, টাকাটি বেঁধে রাখে। কম্বলটি দরদাম করে কেনার অবকাশ রাজাসাহেবের নেই। রাজাসাহেব ছিলেন বুদ্ধিমান, কিন্তু অতিশয় দয়ালু। সওদাগরের হালচাল দেখে রাজা বুঝতে পেরেছিলেন লোকটার নিতান্ত কাঙাল অবস্থা। কিছু ভিক্ষা নিতে এসেছে। তিন মাস কাল গত হয়ে গেল—ইত্যবসরে সওদাগর সাহেবের কোমরে নব্বইটি টাকা আঁট করে বাঁধা হল। যে পুরোনো পচা পোষাকটি পরে কটক হতে বেরিয়েছিল তা ছিঁড়ে পচে সুতো বেরিয়ে গিয়েছিল। কোমরের টাকা দিয়ে পোষাক কিনলে সওদাগরি করবে কি দিয়ে?

শীতকাল, খুব ভোর, পাললহড়া পার্বত্য বনাঞ্চল, প্রচণ্ড শীত। একটা বড় ধুনি জ্বেলে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় সওদাগর সাহেব ছাইয়ের গাদার উপরে বসে আগুন পোয়ায়। রাজাসাহেব সকালবেলা পথে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ সওদাগরের উপর দৃষ্টি পড়ে গেল। তাকে এতদিন বসিয়ে রাখার দরুণ সে বেচারা কষ্ট পাচ্ছে মনে করে দুঃখিত হলেন। তার কাছ হতে কেনা কম্বলখানি দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে ভাণ্ডারীকে আজ্ঞা দিলেন। সেই মুহূর্তে কম্বলখানির দাম হিসাবে দশ টাকা ধরে দিয়ে আর পথ খরচা দিয়ে তাকে বিদায় করা হল। ময়ূরভঞ্জ জেলায় স্বর্গীয় মহারাজা মহাত্মা যদুনাথ ভঞ্জ ওইরকম দাতা ছিলেন। তাঁর বালেশ্বর আগমনের কালে এইরূপ দানপুণ্য করতে লেখক বাল্যকালে প্রত্যক্ষ করেছে।

সরকারী ভাঁড়ারঘর হতে প্রতিদিন আমার জন্য সকালে মাংসের সঙ্গে সিধে আসত। মাছ যোগান দেবার জন্য একজনের (বোধহয় তিঅর[১] জাত) সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল। সেই তিঅর এক একদিন মাছ দিতে আসত না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলত সোনা ধরতে যাচ্ছে। একটি পার্বত্য নদী রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে প্রবাহিত। কোন কোন বছর প্রবল বৃষ্টির সময় সেই নদীর বন্যার জলে রাজবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে অনেক সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে।

১ উচ্চারণ তিঅর-অ

সেই নদীর বালি স্বর্ণ রেণু মিশ্রিত। মাছওয়ালা তিঅর এক একদিন মাছ ধরা ছেড়ে সোনা ধরতে যায়। আমি জিজ্ঞেস করে দেখেছি, সে সারাদিন বালি ঘেঁটে ঘেঁটে দুই তিন আনার বেশি সোনা পায় না। মাছ ধরেও দিনে ওই পরিমাণ সে রোজগার করত। তুমি মাছ ধর অথবা সোনা ধর তোমার পূর্বজন্মার্জিত যে পরিমাণ সম্পত্তি বিধাতার ধনাগারে জমা দিয়ে এসেছ, হিসাব অনুসারে প্রতিদিন ততটুকুই পাবে। অবিবেকী নির্বোধ লোক খামখা পরের গলা কেটে টাকা রোজগার করতে ছোটে। কিন্তু পারে না। আরেক দল লোক গোঁজা-মিল দিয়ে অন্যের বিত্ত ঘরে তোলে সত্য কিন্তু সময় সময় কোষাগারের রক্ষক সুদে আসলে হিসাব মিলিয়ে চুরি ধরে ফেলে। পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে অন্যায় ধন সুদে আসলে নিয়ে যায়। তার উপর বেড়ি, হাত-কড়া, অপমান ও মনস্তাপ পাওনা হয়।

পাললহড়ায় আমার পক্ষে একটি বিষয়ে কিছু অসুবিধা ছিল। আমার অতিরিক্ত পান চিবানো একটি বদ অভ্যাস। প্রতিদিন পঞ্চাশ ষাট খিলি পান খেতাম। সে সময়ে পাললহড়ায় পানের দোকান ছিল না। পাললহড়া গড় হতে আঠারো ক্রোশ দূর তালচের গড়ে ছিল পানের দোকান। রাজাসাহেব, রানীসাহেবা, ভগিনী মণিমা সকলের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে পান কিনতে সপ্তাহে একবার একটি লোক তালচের যেত। আমিও প্রতি সাতদিনের পালায় সেই লোকটিকে দুটি করে টাকা দিতাম। এক টাকা তার মজুরি বাবদ পাওনা হত আর এক টাকার সে পান কিনে আনত। অবশ্য এত পান আমার কাজে আসত না। আধাআধি পান পচে যেত। একদিন সকালে আমার বাসায় পান ছিল না। ভাত খাবার পর রাজাসাহেব রানীসাহেবা ভগিনী মণিমা সকলের নিকটে পানের জন্য লোক পাঠালাম। কারও মহলে পান ছিল না। আবার লোক পাঠালাম যদি কিছু পানের গুটকি[1] মেলে। কিন্তু 'নাসতে বিন্ততে ভাব' অভাবের সময় সব কিছুর অভাব। মহাল হতে কারুর কাছে পানের গুটকির গুঁড়োটুকু পর্যন্ত পাওয়া গেল না। আমি সজোরে নিঃশ্বাস ফেলে খুব চেঁচিয়ে বললাম, 'হে ঈশ্বর, আমাকে আজ পান খেতে দিলে না?'

এই কথাটুকু বলে পথের দিকে চেয়ে দেখলাম। একটা লোক পিঠে বোঝা

---

১ শুকনো পান। পানের বোঁটা শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখা হয়। পান না থাকার সময় সুপুরি চূণ খয়ের দিয়ে সেই গুঁড়ো খাওয়া হয়।

বেঁধে নুয়ে পড়ে ধীরে ধীরে চলেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে হে?' উত্তর হল, 'কটক পুলিশ বিভাগের বাবু কেওঞ্চরের বনে আছেন, তাঁর বাড়ি হতে জিনিষ পত্র নিয়ে যাচ্ছি।' 'দেখি, দেখি এস ত এখানে—আমার কাছে এস'—কাছে ডাকলাম। অবশ্যই পান পাব এ আশা আমার মনের মধ্যে উদিত হয় নি, কেবল কটকের কথা জিজ্ঞেস করব বলে লোকটি'ক কাছে ডেকেছিলাম, বোঁচকাটা খোলামাত্র দুই তিনশ পান বাঁধা একটা গোছা টপ্ করে আমার সামনে পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তিন চারটা পান চিবিয়ে ফেলে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করলাম। ক্ষীণ বিশ্বাসী, অজ্ঞানান্ধ লোকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করায় অক্ষম। প্রভুর কার্যকরি হস্ত দেখতে পায় না। মন প্রাণ সমর্পণপূর্বক ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করুন—ভক্তিপূর্ণ সরল মনে প্রার্থনা করুন, সুখ শান্তি সান্ত্বনা, স্বাস্থ্য সমস্ত প্রভুর কাছ হতে পাবেন[১]। আমি প্রত্যেকে মুহূর্তে, প্রত্যেক ঘটনায় প্রভুর হাত দেখতে পাই। আমি শৈশব অবস্থা হতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী বিহনে সহায়হীন। একমাত্র প্রভুই আমার রক্ষাকারী। আমার নিজস্ব বলে কিছু নেই, সকলই প্রভুদত্ত। সম্প্রতি তাঁর দত্ত জ্ঞানের বলে আমার এই অসার জীবন চরিত লোককে শোনাতে বসেছি। আজ কেবল পান খেতে পেলাম তাই নয়, আর একবারও এরূপ অবস্থায় অন্যত্র পান পেয়েছিলাম। কেবল পান নয়, শত শতবার প্রভুর করুণাময় প্রসারিত হস্ত জীবনে অনুভব করেছি।

পাললহড়ায় সে সময়ে আমার কিছু অভাব ছিল না। মহাভারত লেখায় ও পাশা খেলায় সুন্দর দিন কেটে যাচ্ছিল। তথাপি সেখানে অধিকদিন থাকার ইচ্ছা হল না। মূল কারণ হাতে কিছু কাজ ছিল না। কাজ ছাড়া চুপচাপ বসে থাকা মানুষের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। গীতায় ভগবান বাসুদেব বলেছেন—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি
জাতু তিষ্ঠত্য কর্মকৃৎ।"

সেই সময় একদিন সকালে একটি বৃদ্ধা আমার বাসায় মাছ বিক্রী করতে এসেছিল—আমার চাকর বলল, 'বুড়ি আমাদের মাছের দরকার নেই।' বুড়ি বলল, 'হাঁ গো, তোমরা রাজার ভাঁড়ারের সিধে খাও নাকি?' আমি নিকটে দাঁড়িয়েছিলাম, বুড়ির কথা শুনে বড় অপমান বোধ হল। ভাবলাম সত্যি

---

১ "দুয়ারে আঘাত কর, তোমার জন্য কপাট খুলে যাবে"—বাইবেল

কথা, কিছুমাত্র কাজ না করে অকারণ বসে বসে মাইনে নেব? সিধে খান, এ কেমন কথা? চাকরি ছেড়ে দিলে দুর্দশায় পড়তে হবে—এ জ্ঞান রইল না। কর্ম ত্যাগ করার অভিপ্রায় রাজাসাহেবকে জানালাম। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকেও লিখলাম। অল্পদিন পরে আমার কর্মত্যাগ প্রার্থনার মঞ্জুরি হুকুম কটক থেকে এল। আমার বেতনের টাকা রাজাসাহেব সমস্ত হিসাব করে, আমাকে বেতন ছাড়া অনেকগুলি টাকা, শাল, পাটের জোড় এবং রানীসাহেবা ভগিনী মণিমারা পথ খরচা বলে বিস্তর টাকা ও কাপড়ের জোড় দিলেন। রাজ-কর্মচারীরা ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা বললেন—এটা পাললহড়া পরিবারের বিধি। এই বিদায়ের টাকা ও জোড় না নিলে রাজাসাহেব নিজেকে অপমানিত বোধ করবেন। সংকোচ ও আনন্দপূর্বক সেই সমস্ত উপহার গ্রহণ করে বালেশ্বরে চলে এলাম।

কেঁওঞ্ঝরের ম্যানেজারি

আমার বালেশ্বরে চলে আসার অল্পদিন পরে অর্থাভাবজনিত ক্লেশ অনুভ করতে লাগলাম। গড়জাত এলাকার সাঁওতাল গাঁয়ের কাছাকাছি লোকেদের কাছে একটা প্রবাদ শুনেছিলাম :

'পাকল ধান বাজল চাঙ্গু
গালের উপরে গাল।
এল চৈত্র ফুরোলো ধান
চল খুঁড়তে খন্দ খাল।'

পৌষমাসে ধান পাকলে সাঁওতালেরা দুই বেলা ভাত খায়! উদ্‌বৃত্ত ধানে হাঁড়িয়া (এক প্রকার মদ) প্রস্তুত করে খেয়ে চাঙ্গু বাজিয়ে সারারাত নাচে। চৈত্র মাসে ধান ফুরিয়ে যায়। ভাত ও হাঁড়িয়া খেয়ে গাল ফুলো ফুলো হয়ে থাকে। অর্থাৎ দেহ মোটা সোটা থাকে। চৈত্র মাসে ধান ফুরিয়ে গেলে দেহ শুকিয়ে যায়। এর পরে আট মাস কালঅবধি আহার টুঙ্গা, কড়বা, মসিআ প্রভৃতি জঙলি আলু আর মহুয়া, আম প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলমূল। তাছাড়া তাদের খাদ্য ছিল শিকার করে আনা মাংস। ইদানীং এদের অবস্থা ঢের উন্নত হয়েছে। আমি সেইরকম একটি অপরিণামদর্শী সাঁওতাল স্বভাবের লোক। অর্থোপার্জনের সময় আমার ভবিষ্যৎ ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না।

সম্প্রতি বালেশ্বর অবস্থানকালে অর্থাভাবজনিত আমার অস্থিরতা দেখে আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু সুখে দুঃখে পরম সহায় বালেশ্বর নর্মালস্কুলের হেডমাস্টার বাবু গোবিন্দচন্দ্র পট্টনায়ক পুন: পুনঃ উপদেশ দিলেন, 'ব্যস্ত হবার দরকার নেই। প্রভু কোনো রকম একটা ব্যবস্থা করবেন, প্রার্থনা কর।' গোবিন্দর যেরূপ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র,সেইরূপ তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ও প্রার্থনাশীল ছিলেন।

এই সময় কেঁওঞ্ঝর রাজ্যের ম্যানেজারের পদ শূন্য হওয়ায় সেই পদ প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত করলাম। আমার যোগ্যতা এবং চরিত্র সম্বন্ধে মহারাজ বাহাদুর

আ. সু. রায় নন্দকিশোর দাস বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করলেন। —একই সময়ে মহারাজের কাছ হতে নিয়োগপত্র এবং শীঘ্র কেঁওঞ্ঝর রাজ্যে উপস্থিত হবার জন্য নন্দকিশোরবাবুর নির্দেশপত্র প্রাপ্ত হয়ে কেঁওঞ্ঝর চলে গেলাম। সে সময় কেঁওঞ্ঝর নিজগড়[১] জায়গাটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। আষাঢ়ের আরম্ভ হতে কার্তিকের শেষ পর্যন্ত বর্ষাকালটায় কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলের জ্বর হয়। শীত পড়লে ছেড়ে যেত। আনন্দপুরে উপস্থিত হওয়া মাত্র মহারাজের কাছ হতে একখানা পত্র পেলাম। পত্রের মর্ম অল্প কিছুদিনের মধ্যে শ্রীযুতের আনন্দপুরে শুভাগমন করার কথা আছে। নিজগড়ে রওনা না হয়ে শ্রীযুতের উপস্থিতি পর্যন্ত আনন্দপুরে অপেক্ষা করার জন্য আমার প্রতি আদেশ ছিল। আমার আনন্দপুরে পৌঁছোবার চার পাঁচ দিন পরে সদববলে মহারাজা আনন্দপুরে উপস্থিত হলেন। কিছুদূর হতে হাতীর উপর হতে অবতরণ করার পূর্বেই 'ম্যানেজারবাবু ম্যানেজারবাবু' বলে চিৎকার করে ডাকলেন। চিরপরিচিতের ন্যায় কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন।

মহারাজা ধনঞ্জয়নারায়ণ ভঞ্জ সর্ব বিষয়ে বিচক্ষণ লোক ছিলেন। সমস্ত কেঁওঞ্ঝর রাজ্য প্রায় তিন হাজার বর্গ মাইল। সমস্ত জায়গাটা যেন নখদর্পণস্বরূপ করে রেখেছিলেন। রাজ্যের মধ্যে কোন লোকের কিরূপ অভাব তা তাঁর জানা ছিল। তিনি বাক্‌পটু, কর্মবীর, রুগ্ন, ক্ষীণকায়। কিন্তু প্রাতঃকাল হতে অর্ধ রাত্রি অবধি কাজে লেগে থাকেন। রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় প্রত্যেক কাজ স্বচক্ষে দেখতেন। রাজ্যের সাধারণ কার্যের উন্নতির জন্য তাঁর বিশেষ উৎসাহ এবং অনুরাগ ছিল। কেবল উপযুক্ত কর্মচারীর অভাবে কিছু করে যেতে পারেন নি।

আনন্দপুর হতে ছ'মাইল দক্ষিণে দেগাঁ নামক গ্রামে কুটলেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিরাজিত। এই মন্দির ছিল অতি প্রাচীন। উৎকলের পূর্বতন স্বাধীন মহারাজা যযাতি কেশরী এই মন্দিরের নির্মাতা ছিলেন। মন্দিরের অদূরবর্তী দক্ষিণ দিকে কুশভদ্রা নদী প্রবাহিত। এই নদীটি ব্রাহ্মণীর শাখাবিশেষ। এর প্রবল স্রোতের আঘাতে উত্তর কূলের মাটি তোড়ে খেয়ে খেয়ে উক্ত মন্দিরটিকে কুশভদ্রার গর্ভজাত করাতে আরম্ভ করেছিল। এই উৎপাত হতে মন্দিরটি রক্ষা

১ রাজ্যের সদর। কেঁওঞ্ঝর গড় ছিল কেঁওঞ্ঝরের নিজ গড়।

করার উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় মহারাজা ধনঞ্জয়নারায়ণ ভঞ্জ মহোদয় নদীর উত্তর কূলে একটি বিশাল পাথরের বাঁধ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন।

কোন বহুদর্শী স্থপতির বিনা সাহায্যে স্বয়ং মহারাজার নিজ কল্পনা ও তত্ত্বাবধানে সাধারণ পাথুরে মিস্ত্রিদের দ্বারা এই বাঁধটি নির্মিত হয়। এটা মহারাজার বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পকলা জ্ঞানের পরিচয় স্বরূপ। নিকটেই পাথর সহজ-প্রাপ্য ছিল। কারিগর এবং মজুর শস্তা, তথাপি এটা নির্মাণ করতে রাজভাণ্ডার হতে দেড়লক্ষ পর্যন্ত টাকা ব্যয় হয়েছিল। উৎকলের কটক শহরের নিকটবর্তী কাঠজুড়ি নদীকূলস্থিত মরকত কেশরী দ্বারা নির্মিত পাথরের বাঁধের মতো এই কীর্তি যুগ যুগান্তর অবধি মহারাজার নাম ঘোষণা করবে।

বৈতরণী নদীর উৎপত্তি স্থান গোনাসিকা নামক নিবিড় অরণ্য প্রদেশে একটি বিশাল মন্দির ও কেঁওঝর নিজগড়ে বিরাজিত বলদেব জীউর বিশাল গুণ্ডিচা মন্দির—এই দুইটি মন্দির মহারাজার দ্বারা নির্মিত।

কেঁওঝর রাস্তার সমীপে বুঢ়াপথর নামক একটি স্থানে নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব বিরাজিত। উক্ত মহাদেবের কাছে যাবার পথ ছিলনা। পূজক এবং ভক্ত-দর্শকগণ লোহার শিকল ধরে ধরে পাথরের উপর উঠতেন। মহারাজা ধনঞ্জয় নারায়ণ ভঞ্জ উক্ত মহাদেবের মন্দির এবং মন্দিরে যাবার জন্য ২৫০ হাত উঁচু পাথরের সিঁড়ি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। ভূয়াঁপীড়ের নিকট পাটশাণে অবস্থিত পাটেশ্বর মহাদেবের বিশাল মন্দির মহারাজের অন্যতম কীর্তি।

মহারাজের কীর্তিকলাপের নিদর্শন অধিকাংশই প্রত্যক্ষ করেছি এবং এ সমস্ত কার্যের উৎপত্তির ইতিহাস এবং খরচপত্রের হিসাব সম্বন্ধে তৎকালীন সদর কাছারির পেসকার বর্তমান অ্যাসিস্ট্যান্ট্ ম্যানেজার বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয়ের মুখে শুনেছি। রাজ সরকারে নিযুক্ত প্রাচীন কর্মচারীদের মধ্যে বৈকুণ্ঠবাবু একজন বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান কর্মঠ রাজভক্ত এবং ধর্মভীরু লোক ছিলেন। মহারাজার তাঁর প্রতি বিশেষ বিশ্বাস ছিল। সাধারণ লোকেও তাঁকে সম্ভ্রম করত। সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে আমি কেবল তাঁকেই বিশ্বাস করতাম। তৎকালীন নিযুক্ত অন্যান্য কর্মচারীদের অসচ্চরিত্রতা, অত্যাচার এবং স্বার্থপরতার জন্য মহারাজ ধনঞ্জয়নারায়ণ ভঞ্জকে অনেক দুর্ভোগ সইতে হয়েছিল। 'ভৃত্যাপরাধে স্বামিনঃ দণ্ডং' হয়েছিল।

আমি পূর্বেই বলেছি মহারাজার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্বেও কর্মচারীর অভাবে অধিক কিছু করে যেতে পারেন নি। মহারাজা বিশেষ অধ্যয়নশীল স্বভাবের ছিলেন। বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, দীপিকা প্রভৃতি সংবাদ পত্রিকাগুলি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতেন। তাঁর পাঠের নিমিত্ত সেই সময়ের প্রকাশিত অনেকগুলি বাঙলা এবং উৎকলীয় পুস্তক তাঁর পুস্তকালয়ে সংগৃহীত ছিল।

মহারাজা আনন্দপুর মুকামে সাত আটদিন মাত্র ছিলেন। গড়ে ফিরে যাবার সময় আমাকে ডেকে আদেশ করলেন. 'দেখুন ম্যানেজারবাবু, বর্ষাকাল আগত-প্রায়, গড়ে প্রত্যেক লোকের জ্বর হবে আপনি নিজগড়ে গেলে নিশ্চয় জ্বরে পড়ার কথা। আপাততঃ আপনি এই আনন্দপুরে থেকে যান। এদেশের জলবায়ু সহ্য হয়ে গেলে আসছে শীতকালে গড়ে যাবেন।' আমার ত সেইরূপ ইচ্ছা ছিল, ঈশ্বর আমার কামনা পূর্ণ করলেন। মহারাজ নিজগড়ে ফিরে গেলেন। আমি আনন্দপুরে থেকে গেলাম। আনন্দপুর হতে নিজগড়ের দূরত্ব প্রায় ৫২ মাইল।

আনন্দপুর কাছারি বাড়ি বৈতরণীর উত্তর কূলে অবস্থিত। স্থানটি মনোহর, কাছারি ঘরের পূর্ব এবং উত্তর দিকে আনন্দপুর গ্রাম, বৈতরণীর কূলে কিন্তু নিবিড় কাঁটা বাঁশের বন। পশ্চিম দিকে কাছারির ছাঁচতলা অবধি নিবিড় জঙ্গল। সময় সময় রাত্রে কাছারি ঘরের ছাঁচতলা অবধি ভাল্লুক চরতে আসত। কাছারি ঘর হতে বৈতরণীতে স্নান করার উদ্দেশ্যে মাথায় ছাতা দিয়ে যাবার উপায় ছিল না। যাবার সময় স্থানে স্থানে বাঁশ ঝাড়ের কাঁটায় গায়ের কাপড় আটকে যেত। আমার কার্যভার গ্রহণ করার অল্পদিন পরে নদীকূলস্থিত সমস্ত বন কাটিয়ে জ্বালিয়ে পরিষ্কার করে দিলাম। পশ্চিম দিকের কাছারি ঘরের ছাঁচতলা অনেক দূর পর্যন্ত জঙ্গল কাটিয়ে বাগান তৈরি করা আরম্ভ করলাম। জঙ্গলের মধ্য হতে কয়েকটা গোক্ষুর সাপ মারা হল। একদিন সকাল বেলা কয়েকজন মজুর দিয়ে জঙ্গল কাটাবার সময়ে একটি অহিরাজ সাপ একটা খরগোসকে তাড়া করল। খরগোসটা বনের মধ্য হতে পালিয়ে এসে জঙ্গল কাটা মজুরদের কাছে পৌঁছাল। পিছনে সাপ সামনে মজুর খরগোসটা ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া মাত্র অহিরাজ সাপটা তাকে কামড়ে নিয়ে বনে চলে গেল। জঙ্গল পরিষ্কার করার পর কলকাতা হতে নানাপ্রকার কলমি আম, লিচু. জামরুল, পেয়ারা, কাঁঠালের চারা আনিয়ে রোপণ করলাম। বাগানের একঅংশে গোলাপ ও জাত ফুলের কলম চারা দিয়ে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান রচনা করলাম।

কপি, মটর, আলু, পটল, কলা, মূলা প্রভৃতি শাকসব্জিতেও উদ্যান পূর্ণ হয়ে গেল।

আনন্দপুর কাছারি ঘরটি পাকা দোতলা বাড়ি, নদীকূল হতে সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু বাড়িটা অর্ধেক তৈরি অবস্থায় পড়ে থেকে পুরোনো দেওয়ালের ন্যায় খাড়া হয়ে ছিল। সদর কাছারি হতে অনুমতি আনিয়ে নির্মাণ আরম্ভ করিয়ে দিলাম। কাছারি ঘরের সম্মুখের বারান্দা ভূমি হতে প্রায় পাঁচ ছয় ফুট উঁচু ছিল ও সামনে কোন রেলিং ছিলনা। রাত্রে কিম্বা অসাবধানতায় মানুষ উপর হতে নীচে পড়ে গেলে হাত পা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা ছিল। শুনলাম একবার একজন লোক পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল। কলকাতা হতে ঢালাই করা লোহার রেলিং আনিয়ে বারান্দার ধারে বসিয়ে দিলাম।

কাছারির সেরেস্তা নিতান্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। রীতিমত রেজেষ্ট্রি বই ছিল না। সে সমস্ত নূতন ভাবে ব্যবস্থা করতে হল। শমন, ওয়ারেন্ট প্রভৃতি নানারকম ফর্ম বালেশ্বর হতে ছাপিয়ে এনে চালালাম। বছরখানেক পরে মহারাজের কাছ হতে অনুমতি গ্রহণ করে আনন্দপুরে একটি প্রেস স্থাপন করলাম। সেই প্রেসে আনন্দপুরের কাছারির এবং সদর কাছারির জন্য শমন, এত্তেলানামা অন্যান্য চিঠিপত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ছাপা হতে লাগল।

আনন্দপুরে একটি পাকা স্কুল ঘর নির্মাণের জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। সেখানে সমস্ত আমলা ও মোক্তারদের এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং কিছু অর্থ চাঁদাও তোলা হয়েছিল, আমি ঠিক এই সময় আনন্দপুর ছেড়ে চলে এলাম।

আমার ম্যানেজারি পদে নিযুক্তির কিছুদিন পূর্বে আনন্দপুর এলাকায় একটি ফৌজদারি মামলা উপস্থিত হয়েছিল। ফরিয়াদী কেঁওঞ্ঝর এলাকাবাসী। আসামীদের গৃহ সুকিন্দা এলাকায়। সুকিন্দা রাজ্যটা জমিদারি, সুতরাং মোগলবন্দি[১] সামিল। আনন্দপুর এলাকায় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কিছুদিন আসামীদের হাজতে রাখবার পর আসামীদের বাসস্থান মোগলবন্দি এলাকায় হবার দরুণ সেই মামলার বিচারের উদ্দেশ্যে মহারাজা বাহাদুর যাজপুর সাবডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট সমস্ত কাগজপত্রের সঙ্গে আসামীদের

১ কটক জেলার অংশ। পূর্বে বোধহয় গড়জাতের অন্যতম ছিল।

পাঠিয়ে দিলেন। ইত্যবসরে আমি গিয়ে আনন্দপুরে উপস্থিত হলাম। মামলার স্থান গড়জাতে হওয়াতে সে মামলা আনন্দপুর আদালতের বিচার্য বিষয় ছিল। মহারাজাবাহাদুর আপন ভ্রমের বিষয় বুঝতে পেরে পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ে ভ্রম সংশোধনের উপায় ছিলনা। যাজপুরে উপস্থিত থেকে সেই মামলা চালাবার জন্য কেঁওঝর সদর কাছারি হতে মহারাজের স্বাক্ষরিত আদেশপত্র পেয়ে যাজপুর চলে গেলাম। কটক হতে দুজন উকিল আনিয়ে মামলা চালাতে লাগলাম। যাজপুর আদালতের বিচারে আসামীরা মুক্তিলাভ করল, অধিকন্তু আনন্দপুরের কর্মচারী মোগলবন্দি প্রজাদের অন্যায়রূপে অবরোধ করে রাখার অপরাধে অভিযুক্ত হল।

মামলা ক্রমশঃ নিম্ন আদালত হতে হাইকোর্টে উপস্থিত হল। আমি কলকাতায় উপস্থিত হয়ে চারজন উকিলের দ্বারা মামলা চালাতে লাগলাম। গবর্নমেন্টের তরফ হতে একজন ইংরেজ ব্যারিস্টার উপস্থিত ছিলেন।

কিছুদিন পর্যন্ত হাইকোর্টে মামলা চলার পরে কেঁওঝরের স্বপক্ষে ডিক্রী রায় প্রচারিত হল। হাইকোর্ট সুস্পষ্টরূপে আপন রায়েতে উল্লেখ করল, 'ব্রিটিশ আদালতে প্রচলিত কোনো প্রকার আইন করদ রাজ্যে প্রযুক্ত হওয়া উচিত নয়।' মামলার রায় শুনে মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সেইদিন হতে আমার বেতনের উপর মাসিক ২০ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি হল। অন্যান্য কতক গড়জাতের প্রজাদের কাছ হতে ধন্যবাদ সংবলিত খ্যাতিপত্র পেলাম। করদ রাজাদের পক্ষে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আদালতে প্রচলিত কোন কোন আইন কতদূর পালনীয় এ বিষয়ে কোনো জায়গায় সুস্পষ্ট বিধান উল্লেখ না থাকায় রাজারা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলেন। এবার তাঁরা আপন আপন ক্ষমতার সীমা স্পষ্টরূপে বুঝতে সক্ষম হলেন। সতেরো দফা নামক বিধানে সরকার বাহাদুরের আদেশ আছে গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত আদালতে প্রচলিত আইনকানুন প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রেখে করদ রাজারা আপন আপন রাজ্য শাসন বিষয়ে মনোযোগী হবেন। এর স্পষ্ট অর্থ অনেক রাজা বুঝতে পারতেন না। প্রথম অবস্থায় রাজ্যের রাজাদের হাতে অপরাধীদের চরম শাস্তি অর্থাৎ প্রাণদণ্ড দেবার ক্ষমতা অর্পিত ছিল। নরসিংহপুরের পূর্বতন কোন একজন রাজা কোন একজন অপরাধীকে ঢেঁকিতে কুটিয়ে প্রাণবধ করায় ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট

সেই ভীষণ ক্ষমতা রহিত করে দিয়েছেন। অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলে অনেক রুলিং চীফ্ এবং ময়ূরভঞ্জ রাজার হাতে সেই ক্ষমতা আছে।

কেঁওঞ্ঝর এবং ছোটনাগপুর সীমান্ত নিয়ে বহুকাল পূর্ব হতে বিবাদ চলে আসছিল। আমার কেঁওঞ্ঝরে ম্যানেজারির দ্বিতীয় বর্ষে সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করবার জন্য কেঁওঞ্ঝর মহারাজা এবং নাগপুরের চীফ্ কমিশনরের তাগাদা হুকুম আসতে সেই মামলা চালাবার জন্য মহারাজা আমায় ভার দিয়েছিলেন। কেওঞ্ঝরের কতকগুলি বাজেয়াপ্ত জমি উদ্ধার করিয়ে দেওয়ায় মহারাজ আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

কেঁওঞ্ঝর প্রজাবিদ্রোহ

আমার কেঁওঞ্ঝরে ম্যানেজারির তৃতীয় বর্ষে কেঁওঞ্ঝরে ভয়ঙ্কর প্রজাবিদ্রোহ আরম্ভ হল। রাজ্যশাসন সম্পর্কে কেঁওঞ্ঝর দুইভাগে বিভক্ত, পূর্বাঞ্চলে আনন্দপুর বিভাগ, পশ্চিমাংশ নিজগড় বিভাগ। আনন্দপুর বিভাগটা কেঁওঞ্ঝরের ভূষণ স্বরূপ, সবরকম স্বচ্ছল কৃষক ব্যবসায়ী মহাজনদের নিবাস। মধ্যভাগে বৈতরণী প্রবাহিত হওয়ার দরুণ এর ভূমি উর্বর। এই অংশে বন পর্বত অপেক্ষাকৃত বিরল। পশ্চিমাঞ্চলে কেবল ভূঁইয়াদের আবাস এবং অল্পসংখ্যক কৃষক শ্রেণীর লোকের নিবাস।

আমি আনন্দপুর এলাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলাম। আরেকজন অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজারও ছিলেন। সর্ববিষয়ে রাজ্যে এই এলাকা হতে আদায় বেশি হত। সন ৮৯১ সালে প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল। এই বিদ্রোহের সঙ্গে আনন্দপুরের প্রজাগণ সম্পর্কশূন্য ছিল। আমি মফঃস্বল সফরে গিয়ে আনন্দপুর কাছারি হতে প্রায় পাঁচ মাইল দূর বৈতরণী কূলবর্তী মুআগড় গ্রামের নিকটস্থ একটি আমবনে ডেরা ফেলে ছিলাম প্রায় রাত এগারোটার সময় আহারাদি শেষ করে তাম্বুর বারান্দায় একটি আরাম চৌকিতে বসে নদীর শীতল বায়ু সেবন করছি এমন সময় কেঁওঞ্ঝর গড় হতে দুইজন 'দৌড় পাইক' মহারাজার নিকট হতে একটি গোপনীয় পত্র নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হল। কেঁওঞ্ঝরের প্রজাবিদ্রোহের বিবরণ সংক্ষেপে সেই পত্রে উল্লিখিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডেরা তুলে দিয়ে আমি আনন্দপুরে চলে এলাম।

পরের দিন প্রাতঃকাল হতে প্রতিদিন দৌড় পাইক যোগে মহারাজার কাছ হতে দুই তিনখানা পত্র পেতাম। পত্রে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আনন্দপুর এলাকার বহুসংখ্যক পাইক নিজগড়ে পাঠাবার আদেশ থাকত। প্রতি মুহূর্তে নিজগড় হতে সংবাদ নেওয়া ও আনন্দপুর এলাকার পাইক সংগ্রহ করে নিজগড়ে পাঠানো এখন আমার কাজ। নিজগড় সদর কাছারি হতে আনন্দপুর কাছারি পর্যন্ত ডাক চলাচল বন্ধ। বিদ্রোহীরা একদিনের চিঠিপূর্ণ ডাকের থলে লুঠ

করেছে, পথে স্থানে স্থানে বিদ্রোহীদের পাহারাদারের ঘাঁটি বসে গেছে, বন পথে গোপনে পাইকদের দ্বারা চিঠিপত্র যাতায়াত হচ্ছে।

তৃতীয় দিবস রাত নটার সময় আমার দৈনন্দিন কার্য সমাপ্ত করে আহার করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি এমন সময় স্বয়ং শ্রীযুক্ত মহারাজ, অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার বিচিত্রানন্দ দাস ও কয়েকজন বিশ্বাসী পার্শ্বচরের সঙ্গে তিনটে হাতীতে চড়ে আনন্দপুর কাছারিতে উপস্থিত হলেন। হাতীগুলি খুব ভোরে নিজগড় হতে বেরিয়ে অনেক স্থলে বিপথে অর্থাৎ বনপথে চার চার জন আরোহী পিঠে নিয়ে যথাশক্তি দ্রুতগতিতে ৫২ মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছে। পশুগুলি মুমূর্ষু প্রায়। আরোহীদের অবস্থা হয়েছিল ততোধিক শোচনীয়। গ্রীষ্মকাল সারাদিনে বিন্দুমাত্র জল স্পর্শ করা হয় নি। মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র, হাতীর চলায় দোলানিতে আরোহীর সারা দেহের সন্ধি অংশগুলি যেন শিথিল হয়ে গেছে। মহারাজা এবং অন্য সমস্ত আরোহী হাতী হতে নেমে নিচে পড়ে গেলেন। তাঁদের হাওয়া করে সুস্থ করতে একঘণ্টার অধিক সময় লাগল। আমার বাসায় এবং আমলাদের বাসায় অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত ছিল। মহারাজার সঙ্গের লোকেরা ভোজন করল। মহারাজার জন্য রান্না বান্নার ব্যবস্থা শীঘ্র করানো হল।

মহারাজা, আমি এবং অন্য দুই তিনজন লোক বসে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য আলোচনা করতে লাগলাম। স্থির হল মহারাজা আনন্দপুরে থাকবেন আর আমি কটকে গিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে প্রজা বিদ্রোহের বিষয় জানিয়ে সর্দার বিদ্রোহীদের ধরবার জন্য পুলিশের সাহায্য আনব। পরের দিন সকালে হাতীতে চড়ে কটক যাত্রার জন্য বাহির হলাম। সেদিন রাত্রে কেঁওঞ্জরের জমিদারী কণ্টাঝরির কাছারি ঘরে থাকতে হল। দ্বিতীয় দিন দিবা চারটার সময় ব্রাহ্মণী নদীর কাছে দুলিডিহা লকের কাছে হাতীকে বিদায় দিয়ে স্টিমারে চড়ে তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নটার সময় কটকে উপস্থিত হলাম। প্রথমে অ্যাসিস্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় নন্দকিশোর দাস বাহাদুরকে সমস্ত হাল চাল জানিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টয়েনবি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমার সমস্ত কথা শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে পড়লেন। এতবড় পদস্থ লোক বেসামাল ভাবে চৌকি হতে উঠে পড়ে কামরার এধারে ওধারে ছুটোছুটি করতে করতে বললেন, 'আচ্ছা হল ভাল হল, রাজা যেমন

অত্যাচারী, গবর্নমেন্ট হুকুম অমান্যকারী সেইরূপ দণ্ডভোগ করুন, আমরা কিছুমাত্র সাহায্য করব না।' আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম আমার উপস্থিতির পূর্বে সাহেব প্রজাবিদ্রোহ ঘটিত সমস্ত বিবরণ শুনেছিলেন। এর সঠিক বৃত্তান্ত পরে উল্লেখ করব। যেখানে সাহেব চৌকি হতে উঠে পড়ে ঘরের ভিতর ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছেন আমি আর চৌকিতে বসে থাকার ভরসা করি কি করে? সাহেব একটু নিবৃত্ত হওয়ায় আমি খুব ধীরভাবে খুব বিনয় সহকারে জানালাম, 'হুজুর! কেঁওঞ্জর মহারাজা চিরকাল গবর্নমেণ্টের আদেশ পালনকারী। এ-বিষয়ে সরকারী কাগজপত্রে উল্লেখ আছে। হুজুর অনুগ্রহ করে কাগজপত্র অনুসন্ধান ক'লে সহজেই আমার কথার সত্যতার প্রমাণ পাবেন। আর হুজুর বলছেন রাজা অত্যাচারী সে সম্বন্ধে আমি দৃঢ় রূপে বলতে পারি মহারাজের অত্যাচার সম্বন্ধে কেঁওঞ্জরের প্রজারা অথবা নিঃসম্পর্কীয় বাহিরের লোক, কেউই সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হবে না। সম্প্রতি যে সাধারণ প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত এর সঙ্গে রাজ্যের প্রজাদের সম্পর্ক নেই। কেবল ভূঁইয়া জাতীয় প্রজারা গোলযোগ আরম্ভ করেছে। তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক, সময়ে সময়ে বিদ্রোহ করা তাদের স্বভাব। মহারাজের অত্যাচার হেতু প্রজাবিদ্রোহ যদি হত তাহলে সকল প্রজা একত্রিত হত।

সম্প্রতি বিদ্রোহী প্রজাদের সংখ্যা অল্প। মহারাজা অতি সহজে তাদের দমন করতে সক্ষম। কিন্তু মহারাজা হুজুরকে মুরুব্বি হিসাবে মানেন। হুজুরের নির্দেশ এবং সাহায্য ছাড়া তিনি কোন কাজ করতে পারছেন না। সেই উদ্দেশ্যে আমাকে হুজুরের কাছে পাঠিয়েছেন। বিশেষ করে ভূঁয়া জাতি নিতান্ত বন্য, মূর্খ এবং হাঁড়িয়া প্রিয়। সামান্য কারণে তীরধনুক ও তরবারি চালায়। রক্তপাত হোক এটা মহারাজার ইচ্ছা নয়। এই কারণে মহারাজার অভিলাষ হুজুর একশজন কনস্টেবলের সাহায্য দিলে বন্য লোক তাদের দেখে ভয়ে পালাবে। সহজেই বিদ্রোহ দমন হয়ে যাবে।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টয়েন্‌বি সাহেব কিছুক্ষণ শান্তভাবে চৌকিতে বসে কি ভাবলেন, তার পরে বল্লেন, 'আচ্ছা বাবু, আমরা বালেশ্বর জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গায়স্‌ সাহেবকে লিখব। তিনি একশজন কনেস্টবল নিয়ে তোমাদের সাহায্য দেবার জন্য কেঁওঞ্জর যাবেন, তোমরা এখন সামলে থাক।'

আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে মাথা খুব ঝুঁকিয়ে সেলাম করে বিদায় গ্রহণ করলাম।

সাহেবের সঙ্গে যা কিছু কথোপকথন হল এবং তিনি যা ব্যবস্থা করলেন নন্দকিশোরবাবুকে জানিয়ে দিয়ে সেই মুহূর্তে কটক পরিত্যাগ করলাম। পরের দিন সন্ধ্যার সময় কটক ছেড়ে আমি টাঙ্গি মুকামে এসে পৌঁচেছি ঠিক সেই সময় মহারাজাও কয়েকজন মাত্র পরিচারক সঙ্গে নিয়ে আনন্দপুর হতে এসে সেই টাঙ্গিতে উপস্থিত হলেন। কটকের সংবাদ আমার কাছে সব শুনলেন। কথা হল যখন এত দূর তিনি এসেছেন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাওয়া তাঁর উচিত।

পরের দিন কটকে নন্দকিশোরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনার পর কর্তব্য স্থির হল। লেফটনেণ্ট গবর্নর এবং চীফ সেক্রেটারি কটন্ সাহেবকে বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ টেলিগ্রাফ দ্বারা জানিয়ে অস্ত্রধারী পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করা হল। সেই টেলিগ্রামে উল্লেখ করা হল—'বিদ্রোহ সামান্য, কেবল রক্তপাত নিবারণের জন্য সৈন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।' তারপরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা। মহারাজা কেবল একটি ধূতি ও কোর্তা পরে কটক গিয়েছিলেন সঙ্গে আর কিছু জিনিস ছিল না। মহারাজা বল্লেন, 'আমরা এই পোষাকেই সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। সাহেব দেখুন প্রজারা আমাদের কিরূপ অবস্থায় ফেলেছে।' আমি বললাম, 'আহা! আপনি এ কি আদেশ দিচ্ছেন? সাহেব যে হুজুরকে ভীরু ভাববেন, প্রজাদের ভয়ে পালিয়ে এসেছেন বলবেন। খুব সাহসের সঙ্গে কথা বলবেন। এই প্রজা বিদ্রোহকে গ্রাহ্য করেন না এমনি ভাব দেখাবেন।' নন্দকিশোরবাবু মহারাজা এবং আমি এই তিনজন নির্জনে বসে কথোপকথন করছিলাম, নন্দকিশোরবাবু আমার কথা শুনে মুচকে মুচকে হাসছিলেন। মহারাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন উপযুক্ত পোষাক দরকার। নন্দকিশোরবাবু তাঁহার আর্দালীকে পাঠিয়ে সেইস্থানে একটি দর্জি আনালেন। সে মহারাজের দেহের মাপ নিল সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ পোষাক তৈরি করিয়ে দেবে বলে কড়ার করিয়ে নেওয়া হল।

দর্জি বেরিয়ে যাবার পর আমরা তিনজন নন্দকিশোরবাবুর দপ্তরখানা কামরায় বসে কথোপকথন করছি ঠিক সেই সময় আমাদের মাননীয় মধুসূদন দাস এসে

পৌঁছলেন। মধুবাবুকে দূর হতে আসতে দেখে মহারাজকে চুপি চুপি বললাম—'আমাদের পরামর্শ করার দলের ভিতর মধুবাবুকে আনলে ভাল হবে। এর পরে এই সম্পর্কে কটকে অনেক কার্য উপস্থিত হবে। আমাদের উকিল হিসাবে তিনি সমস্ত কাজ করবেন। বিশেষ করে মামলা মোকদ্দমার সময় তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ নিতান্ত আবশ্যক হবে।' নন্দকিশোরবাবু মহারাজকে বললেন, 'হাঁ আমিও আপনাকে সেই কথা বলতে যাচ্ছিলাম, ফকীরমোহনবাবুর প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করা হোক।'

মাননীয় মধুসূদনবাবু কেঁওঞ্ঝর মহারাজার তরফ হতে ওকালতি করায় নিযুক্ত হলেন। বিদ্রোহের সমস্ত বিবরণ মধুবাবুকে বলা হল।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি ও মহারাজা, কমিশনর টয়েনবি সাহেবের কুঠিতে গেলাম। সাহেবের খাস দপ্তরখানায় আমাদের তলব হল। আমরা সেলাম করে সাহেবের সম্মুখে দুইটি চৌকিতে বসবামাত্র সাহেব যেন প্রবল ক্রোধ দমন করে মুখ নিচু করে বললেন—

রাজাসাহেব, গড়ে রানীসাহেবা আর শিশু ও স্ত্রীলোকদের অসহায়ভাবে বিদ্রোহীদের হাতে ফেলে দিয়ে আপনি ভয়ে কটকে পালিয়ে এসেছেন, এ কেমন কথা।'

মহারাজা সাহেবের কথার উত্তর দেবার পূর্বেই আমি ত্বরিতে বলে ফেললাম, 'না হুজুর, গড়ে উপযুক্ত প্রহরী আছে। বিশেষ করে গড়ের চতুর্দিকে বিশ্বাসী প্রজাদের গ্রাম, বিদ্রোহীরা গড়ের পানে চেয়ে দেখতেও সাহস করবে না।' সাহেব ক্রুদ্ধ নেত্রে আমার পানে চেয়ে রইলেন।

বিদ্রোহ সম্বন্ধে কথোপকথন হল। ইত্যবসরে গবর্নমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারির নিকট হতে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোল। অবশেষে স্থির হল কেঁওঞ্ঝর যাবার নিমিত্ত বালেশ্বর জেলার পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গায়স্ সাহেবের প্রতি যে আদেশ পাঠানো হয়েছিল তা রহিত করা হবে। দুইশত মিলিটারী পুলিশের সঙ্গে ডাউসন্ সাহেব চাঁইবাসা পথ দিয়ে গড় রক্ষা করবার জন্য আসবেন।

কটক হতে বিদায় হয়ে আমি আর মহারাজা দুইজন এসে আনন্দপুরে উপস্থিত হলাম। আনন্দপুর এলাকা হতে পাইক সংগ্রহ করতে একটা দিন গেল। শনিবার প্রাতঃকাল পূর্ণ বারবেলার সময় তিনশত পাইক নিয়ে মহারাজা কেঁওঞ্ঝর নিজগড় অভিমুখে যাত্রা করলেন। আনন্দপুর হতে প্রায় চারক্রোশ দূরে

কেঁওঞ্জরের পথে একটা গিরি নদী অথবা কোয়া ছিল, তার দুধারে ছিল ঘন জঙ্গল এবং সেই স্থান হতে অল্পদূরে গ্রামাঞ্চল। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী কোয়ার পূর্বকূলে একস্থানে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করিয়ে ডালপালা দিয়ে দুটো অস্থায়ী ঘর প্রস্তুত ছিল। নিকটবর্তী গ্রামের প্রধানেরা রসদের সরঞ্জাম প্রস্তুত রেখেছিল। সেই স্থানে শ্রীযুক্তের প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন হল। আমরা তাঁর অনুচরেরাও সবাই স্নানহার সারলাম।

বারোটা বেজে গিয়ে দুটোর সময় মহারাজার সভা বসল। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হতে মোড়লেরা ও প্রধান প্রধান প্রজা এবং মফঃস্বলের কর্মচারীরা উপস্থিত হলেন। বিদ্রোহীদের গতিবিধি কার্যকলাপের যথাসম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করা হল। তার পরে মহারাজা আদেশ দিলেন, দিন থাকতে থাকতে পাইক আর সব সঙ্গের লোকেরা রান্না করে আহার সমাপন করবে। সন্ধ্যা হলেই নিজ গড়ের পানে যাত্রা শুরু হবে।

আমি জানালাম, 'আজ্ঞে, আজ রাত্রে যাত্রা করা উচিত নয়। শোনা যাচ্ছে বিদ্রোহী ভূঁইয়ারা ধনুক তরবারি নিয়ে দলে দলে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্ধকারে বিদ্রোহীদের চলাচলের গোপন পথ দিয়ে যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না। রাত্রির যাত্রা রহিত করা হোক, কাল সকালে যাত্রা আরম্ভ করা যাক।' অনেকদিন হল মহারাজ গড় ছেড়ে এসেছেন। রাজবাড়ির ভিতরের খবর কিছু জানা নেই। এই কারণে খুব শীঘ্র গড়ে পৌঁছোবার তাঁর ইচ্ছা। আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। আমি দ্বিতীয়বার জানালাম, 'তবে অল্প সংখ্যক পাইক নিয়ে আমি আগে আগে যাব, পথের অবস্থা বুঝে পাইক দিয়ে খবর দেব, দুই তিন ক্রোশ পশ্চাতে থেকে মহারাজা সদলবলে অগ্রসর হবেন।' এ প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হল।

সন্ধ্যাদীপ জ্বলে ওঠামাত্র আমাদের যাত্রা শুরু হল। সর্বাগ্রে চলল মহারাজার হাতী তাঁর পিছনে আমার হাতী, আমার পিছনে কয়েকজন কামলার হাতী, হাতীগুলির পশ্চাতে প্রায় তিনশত শ্রেণীবদ্ধ পাইক।

অন্ধকার রাত্রি, পথ অনেক স্থানে একপদিআ[১]। এবড়ো খেবড়ো উঁচু নীচু। আবার অনেক জায়গায় দুই পাশের গাছের ডাল ঝুঁকে পড়ার জন্য পথ একটুও

১ একজন চলার মত সরু পথ।

দেখা যাচ্ছে না। এ হেন পথে দিনের বেলা অবধি দৃষ্টি না রেখে চললে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে হাঁটু মুড়ে পড়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

পাইকগুলি ছিল বৃদ্ধ ও নিস্তেজ, এদের মধ্যে হয়ত অর্ধেক সংখ্যক রাতকানা। সহজে রাজার কাজে বেগার খাটতে জোয়ান সক্ষম লোক কেউ যায় না। বৃদ্ধ ও রোগা, ঘরের কাজে অযোগ্য, সেই ধরনের লোকই রাজার কাজে বেগার খাটতে যায়। আজ আবার প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত, বন্দুক তরবারি নিয়ে যাওয়ার জন্তে সরকার হতে হুকুম এসেছে। মারামারি কাটাকাটি হবার কথায় ঘরের যুবক, যোগ্য কর্মঠ ছেলেরা কি আর তার মধ্যে যাবে? বুড়োরাই যাক্। বুড়ো পাইকদের মাথায় ছেঁড়া কাপড় ফুকেরতা করে বাঁধা অথবা একটা গামছা জড়ানো। কাঁধের উপর দশসেরি সাড়ে তিন হাত লম্বা গাদা বন্দুক কোমরে তরবারি ঝুলছে, হাতে একটা লাঠি পিঠে দশ পনেরো দিনের খাবার মতো দশ পনেরো সের চালের ভিতর একটি পেতলের হাঁড়ির সঙ্গে একটি বাটি সমেত বোঁচকাটি আঁট করে বাঁধা। এই বেশে বীর পাইকেরা সেই আঁধার রাস্তায় লাঠি ঠক্ ঠক্ করে হাতড়ে চলেছে। এই রে, মাঝখানে একটি পাইক হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পথ মাটিতে পড়ে গেল। পিছনের পাইকশ্রেণী তার ওঠা অবধি পাঁচ মিনিট অবধি দাঁড়িয়ে গেল। হাতীগুলি দুশ হাত এগিয়ে গেল তো পাইকশ্রেণী একশ হাত পিছনে পড়ে রইল। কিন্তু পাইকদের পিছনে হাতীগুলির এগিয়ে যাবার কথা নয়। হাতীর পিঠ হতে হাঁকডাক শুরু হল। আরে কনস্টেবলরা তাড়াতাড়ি চল। পাইকদের খেদিয়ে নেবার জন্য পাঁচ সাতজন কনস্টেবল নিযুক্ত ছিল। এক ক্রোশ পথের মধ্যে হাতীগুলিকে চল্লিশ পঞ্চাশ জায়গায় দাঁড়াতে হয়েছে। এইভাবে চললে কি আর বনের পথ শেষ হবে? পরামর্শ হল হাতীগুলি সব পিছনে থাকবে। পাইকশ্রেণী আগে আগে চলবে। সেইরূপ ব্যবস্থা হল, বোঁচকা পিঠে পাইকশ্রেণী নুয়ে পড়া কচ্ছপের মতো ধীরে ধীরে আগে আগে পথ জুড়ে চলেছে। হাতীদের সহজ ভাবে পথচলার উপায় নেই। পিছনের পাইককে তাড়া দিলেও তার চলবার সাধ্যি কই। পথ তো এক জনের চলার মতো। আগের পাইক পথ আটকে চলেছে। পিছনের পাইকদের একটু তাড়া দেবার জন্য তাদের নিকটে চলা হাতীদের একটু পিঠ ঘেঁষে কাছাকাছি চালিয়ে দিলে তারা ব্যস্ত হয়ে ছোটে, ছুটে সামনের পাইকদের উপরে পড়ে যাওয়াতে কতকগুলো পাইক দুম্ দাম করে মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। চলার পক্ষে এ

নিয়মটাও সুবিধা জনক হল না। অবশেষে স্থির করা হল মহারাজার সওয়ারি হাতী আর কর্মচারীদের হাতী এই দুইটি হাতী আগে আগে চলবে। সকলের পশ্চাতে ম্যানেজারের হাতী থাকবে। হুজুরের হাতীর পিছু ঘেঁষে চলবার জন্য সামনের পাইকদের বিশেষরূপে নির্দেশ দেওয়া হল। পিছনের পাইকদের তত্ত্ব নেবার জন্য সবার পিছনে ম্যানেজারের হাতী চলেছে। এই ব্যবস্থাটা আগের চেয়ে সুবিধাজনক হল। যাই হোক এ ছাড়া উপায় নেই। এইরূপে নবরঙ্গ চলনে মাঝরাতের কাছাকাছি পথের ধারে একটি বন্যজাতির গাঁয়ের মাথায় পৌঁছোলাম। আমি দেখলাম, পায়ে হাঁটা লোকগুলো আধমরা হয়ে পড়েছে। পথ চলায় অধিকাংশ লোক অক্ষম। তাদের আর অপরাধ কি? বুড়ো বেচারাগুলো সারাদিন পাঁচ ছয় ক্রোশ হেঁটেছে। আবার সন্ধ্যেবেলা এক পেট করে ভাত খেয়ে পিঠে ভারি বোঁচকাটি বেঁধে আঁধারের মধ্যে দেখতে না পাওয়া পথে চলেছে, পাথরে হোঁচট খেয়ে খেয়ে অনেক লোকের পায়ের আঙুল কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। মহারাজাকে জানিয়ে বিশ্রাম করার জন্য আধঘণ্টার মতো তাদের সময় দেওয়া গেল। হুকুম পাওয়া মাত্র যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সে সেইখানে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ল। পিঠে বোঁচকা সেইরকম আছে। কাঁধের বন্দুকগুলি পাশে শুইয়ে দিল, পথের উপর কাঁটা অথবা শিশিরে ভেজা ঘাস বন, সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই। আমিও নিতান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, অত্যন্ত ঘুম পাচ্ছিল। হাতীর পিঠ থেকে নেমে শিশিরে ভেজা এবড়ো খেবড়ো পথের উপর শুয়ে পড়লাম। সেই পথের উপর ডুমো ডুমো এক একটা পাথর পিঠে গলায় ও পায়ে ফুটছিল। হরি হরি অমন পাথরের উপরে পড়ে কি ঘুম আসে? এপাশ ওপাশ দুইচার বার গড়াগড়ি দিয়ে উঠে বসলাম। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, নিঃশ্বাসের শব্দে জানতে পারলাম ঢের লোক এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার প্রার্থনায় মহারাজ আধঘণ্টার জন্য বিশ্রামের সময় দিয়েছিলেন সত্যি কিন্তু এতে তাঁর একটুও ইচ্ছা ছিল না। চল চল, কোন রকমে গড়ে শীঘ্র পৌঁছে যাওয়া যাক। আধ ঘণ্টা পরে মহারাজের হুকুম হল, ওঠ চল। আগের মতো হাতীগুলো সামনে ও পিছনে থাকবে, মধ্যে পাইকগুলি। রোজকার মত আজও রাত পোহাল। আমাদের মনে হল যেন কত অন্ধকারময়, কত কষ্টকর, কত অন্তহীন রাত্রির মধ্য হতে বেরিয়ে এসে একটি সুখময় রাজ্যে পৌঁছালাম। গতকাল সন্ধ্যায়

যাত্রার সময় হতে কেউ কারও মুখ দেখে নি কিম্বা কারও মুখ থেকে একটুকু কথা বেরোয় নি। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে কথা বলাবলি করাতে সকলের মনে যেন ভরসা এল।

১৮৯১ সাল মে মাস ১৩ তারিখ রবিবার পূর্বাহ্ন আটটার সময় আমরা ঘটগ্রাম নামক স্থানে উপস্থিত হলাম। কেঁওঞ্জরের পথে এটি একটি বিশেষ জায়গা। পার্শ্বচরদের সঙ্গে মহারাজ সরকারী ঘরে রইলেন। ম্যানেজারের থাকার জন্য স্বতন্ত্র একটি ঘর প্রস্তুত ছিল। পাইকেরা পথের ধারে আমবনে গড়িয়ে পড়ল। পূর্ব আদেশ অনুযায়ী পাশের গ্রামের প্রধানেরা রসদের সরঞ্জাম, হাঁড়ি কাঠ ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত ছিল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করার পর সকলের রান্নাবান্নার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। মহারাজার ইচ্ছা যত রাতই হোক যে করেই হোক আজ গড়ে পৌঁছুতে হবে।

বেলা প্রায় এগারোটার সময়, রান্নাঘরে মহারাজার ইষ্টদেবতার পীঠস্থানের জন্য জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। মহারাজা আর একটি চোরা কুঠরী হতে দেবার্চনা শেষ করে রান্না ঘরে যাবার জন্য বেরিয়ে এলেন। আমি পথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলেছে ঠিক এইসময় দুজন দৌড় পাইক বিপথে বন পর্বতের মধ্য দিয়ে সারারাত ঘুরে ঘুরে নিজগড় মুকাম হতে একখণ্ড চিঠি এনে মহারাজার সমীপে উপস্থিত হল। পাইকদের হাত হতে আমি চিঠিখানা নিয়ে পড়ে রাজাকে শোনালাম। চিঠির মর্ম এই:

'মে মাস ১২ তারিখ শনিবার সন ১৮৯১ নিজগড় আজ সকালে বেলা ছয়টার সময় প্রায় পাঁচশত ভূঁইয়া এসে ঘেরাও করেছিল, গড়ের ভিতর ঢোকার উদ্যোগ করায় আমরা গড়ের প্রাচীরের উপর হতে বন্দুক ফায়ার করলাম। ভূঁইয়ারা ভয়ে পালিয়ে গিয়ে রাইমুআঁ মুকামে ছাউনি ফেলে আছে।'

মহারাজা চিঠির কথা শোনামাত্র খুব উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন, 'মাহুত হাতীতে হাওদা লাগাও।'

মহারাজা রান্না ঘরে না গিয়ে পোষাক পরার জন্য ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। আমি খাবারের জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মহারাজ পোষাক পরে শীঘ্র বেরিয়ে এসে আমার মুখের দিকে ক্ষণিকের জন্য চেয়ে দেখলেন। আমি দৃষ্টি হতে অনুমান করলাম, মহারাজা জিজ্ঞেস করছেন, তুমি পোষাক পরতে এত দেরী করছ কেন? আমি করযোড়ে বিনয় সহকারে বললাম, 'আজ্ঞে, আমরা ত

পালিয়ে যাব, গড়ে রানীসাহেবা, জেমা[1] মণিমা, শিশু রাজকুমারদের মান ইজ্জত ও প্রাণরক্ষা করতে কে রইল, হুজুর আনন্দপুরে ফিরে যান, আমি গড়ে যাচ্ছি।' মহারাজ অস্থির ভাবে বললেন, 'আচ্ছা তবে গড়ে যাও।' আমি বললাম, 'আজ্ঞে, চিঠির বিষয় ত শুনলেন, ভূঁইয়ারা গড় ঘেরাও করে আছে, তারা কি সহজে আমাকে পথ ছেড়ে দেবে? আমাকে এমন আদেশ দিন, তারা যদি আমাকে মারতে আসে, তাদের সঙ্গে যেন যুদ্ধ করে হত্যা করতে পারি।'

লিখিত আদেশের প্রয়োজন। কিন্তু দোয়াত কলম কাগজ নেই। একখানা তালপাতায় লিখে দিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—'ভূঁইয়ারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে তুমি তাদের হত্যা করতে পারবে।'

মহারাজা বাহাদুর অভুক্ত অবস্থায় হাতীতে চড়ে ত্বরায় আনন্দপুরে ফিরে গেলেন। পাইকদের নিয়ে আমি ঘটগ্রামে থেকে গেলাম। আমার পক্ষে এখন দারুণ সঙ্কট সময় উপস্থিত হল। এই মহারাজা গদিনশীন হওয়ার সময় ভূঁইয়ারা দল বেঁধে কেঁওঞ্ঝরের প্রধান কর্মচারী দেওয়ানকে হত্যা করেছিল। আমি সম্প্রতি কেঁওঞ্ঝর রাজ্যের প্রধান কর্মচারী। আমাকে হাতে পেলে তারা হত্যা করবে, ধ্রুব নিশ্চয়। হোক, আমার সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ আছে মরি তো যুদ্ধ করে মরব। গৃহে আমার সংসারে অল্পবয়স্কা নিরাশ্রয়া পত্নী ও শিশু সন্তান বিপক্ষমণ্ডলী বেষ্টিত হয়ে আছে। তাদের প্রতিপালক রক্ষাকারীর অভাব। আমার এসব কথা মনের মধ্যে একটুও স্থান পেল না, একমাত্র যে করে হোক রাজপরিবারকে রক্ষা করতে হবে।

যুদ্ধ উপস্থিত, পাইকদের সময়োচিত কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া এবং অস্ত্র-শস্ত্র পরীক্ষা করার জন্য তাদের শ্রেণীবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দেখলাম। পাইকদের সংখ্যা প্রায় তিনশত। তাদের অস্ত্র শস্ত্রও দেখলাম। হা অদৃষ্ট! একি কাণ্ড? তিনশ'র মধ্যে প্রায় দুইশ বন্দুক ফাটা অকেজো ও ভাঙা, কোনটার অর্দ্ধেক কোনটার সিকিভাগ ভেঙে পড়েছে। অবশিষ্ট বন্দুকের নলগুলির ভিতরে ও ও বাইরে আধ আঙুলের মতো মরচে পড়ে আছে। অনেকগুলি নলে মরচে পড়ে থেকে বারুদের ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেছে। তার পর হল গুলি বারুদের কথা—বারুদ দানি অর্থাৎ বারুদ রাখা নারকোলের মালা কোমরের পিছনদিকে ঝুলছে। বারুদ দানিতে এক চোট, দুই চোট চার চোটের অধিক গুলি বারুদ নেই।

---

১ কুমারী রাজকন্যা।

কোমরে দুটি বা তিনটি, খুব বেশী তো কারু কারু কোমরে বা পানের বটুয়াতে আর কিছু সীসার গুলি আছে। অনেক লোকের বন্দুকের কুঁদায় রঞ্জকের পলতেও ঝুলছে না। প্রায় সকলের তরবারি মরচে ধরা, ফোঁপড়া, পাইকরা জবাব দিল—আজ্ঞে তাড়াতাড়ি চলে আসতে আদেশ পাওয়াতে বারুদ ভরতে পারলাম না। গুলি পাকাতে অবধি সময় ছিল না। এদিকে কার বাপ ঠাকুরদা এই বন্দুক নিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে লড়াই করেছিল, পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিল, একথা মনে আছে, গর্বটাও আছে। রক্তের গুণাগুণ অনেক অধস্তন পুরুষ পর্যন্ত নিজের ধর্ম প্রকাশ করে থাকে। অনেকগুলি সাহসী পাইক এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি আদেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, হুজুর দেখবেন এই ভাঙা তরবারি দিয়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরে পিটে ভূঁইয়াদের মেরে একশা করে দেব।'

সত্যি সত্যি পাইকদের মধ্যে সাহসী বুদ্ধিমান লোক ছিল, উপযুক্ত শিক্ষা ও অস্ত্র পেলে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সহায় হতে পারে। পাইকদের কথা শুনে আমার কিছু সাহস হল। হাসিও পেল। যাই হোক অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু উপস্থিত পাইকদের প্রতি নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। মনে পড়ল গড়ে অনেক পাইক মজুত আছে। কতক সংখ্যক পাইক গড় হতে পাঠিয়ে পথে আমাকে সাহায্য দেবার জন্য সে সময়ে ভারপ্রাপ্ত সেরেস্তাদারকে চিঠি লিখে জানালাম। সেই মুহূর্তে চারজন ধাবমান সংবাদ বাহক পাইক চিঠি নিয়ে সোজা পথ ছেড়ে বনপথে গড় অভিমুখে রওনা হল। বর্তমান ভূঁইয়াদের জনবল চেষ্টা চরিত্র গতি বিধির সংবাদ নেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। সন্ধান দ্বারা জানতে পারলাম ভূঁইয়ারা রাইসুআঁ গ্রামের দিকে চলে গেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ত সৈন্যবল—আবার পরমের্শ করার জন্য কাছে কোনো লোক নেই। আর যাদের গুপ্তচর রূপে নিযুক্ত করেছিলাম প্রচ্ছন্ন ভাবে তারা ভূঁইয়াদের হিতৈষী। আমার কার্যের প্রতি তাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না।

ঘটগ্রাম হতে যাত্রা করে দিবা অবসানের সময় বসন্তপুর মুকামে পৌছোলাম। বসন্তপুর ও নিজগড়ের মাঝখানে পর্বতশ্রেণীর মধ্যে ছিল ঘাট। সেই স্থানটি আমার কাছে ভয়ের কারণ ছিল। ঘাটের দুই পাশে পর্বতের উপর দশজন লোক অদৃশ্য ভাবে দাঁড়িয়ে একশ জন লোককে আটকাতে পারে। সেই

জায়গায় ভূঁইয়াদের লুকিয়ে থাকার আভাস পেয়েছিলাম, সে স্থানের সন্ধান না নিয়ে অগ্রসর হতে আমার সাহস হল না। বসন্তপুর মৌজার মোড়ল ফৌজদারকে ডাকিয়ে ঘাটের অবস্থার সন্ধান নেবার জন্য পাঠালাম, ফৌজদার সরকারী চাকর সে যে সম্পূর্ণরূপে ভূঁইয়াদের সঙ্গে মিশে গেছে, সেই সময় আমি তা জানতাম না। দুই ঘণ্টা পরে ফৌজদার ঘাট দেখে এসে আমাকে সংবাদ দিল পথ পরিষ্কার এই অঞ্চলে একজনও ভূঁইয়া নেই।

রাত হয়ে গেছে, অন্ধকারে ঘাটপথে যেতে ইচ্ছা করল না, পাইকরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই সময় গড় হতে চিঠি এল গড়ের পাইকরা আমাকে সাহায্য দিতে পারবে না। আচ্ছা, তাই সই, পথ তো পরিষ্কার, এখান হ'তে গড়ের দূরত্ব মাত্র পাঁচ ক্রোশ, কাল সকালে রওনা হব। সেইস্থানে রাত্রে বিশ্রাম করার জন্য হুকুম জারী করলাম। বসন্তপুর গ্রামের পশ্চিমদিকে বাণিজ্যের নালার ধারে আমবনে পাইকেরা বোঁচকা নামিয়ে রান্নার আয়োজন কর'তে লাগল, একটা বড় আমগাছের নীচে আমার বিশ্রাম স্থান ঠিক হল।

এই জায়গায় আমার বড় ভুল হয়ে গেল, অল্পবুদ্ধির জন্য দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। সে সময়ে ঘাটের মধ্যে অল্পসংখ্যক, পাহারাদার ভূঁইয়া ছিল। আমি সেই মুহূর্তে যাত্রা করলে মাঝরাত্রি আন্দাজ নিরাপদে গড়ে পৌঁছে যেতাম। কিন্তু বিপদের সময় বিপরীত বুদ্ধি। আমি এই দীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ে কষ্ট ভোগ করে করে নিতান্ত অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়েছিলাম।

সম্মুখের ঘাটের পথ পরিষ্কার আছে কি নেই, সন্ধান নিয়ে আসার জন্য বসন্তপুর মৌজার ফৌজদারকে যে চররূপে পাঠিয়েছিলাম সে গিয়ে ভূঁইয়াদের তরফ হতে ঘাটের ঘাটিয়ালকে আমার সঙ্গে থাকা পাইকেরা সংখ্যা, তাদের, বিবরণ, কখন গড়ের অভিমুখে যাত্রা করব, ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ দেওয়াতে ভূঁইয়া ঘাটিয়াল ছুটে গিয়ে রাইসুআঁ মুকামের ধরণী ভূঁইয়াকে সংবাদ দিল। রাইসুআঁ মুকামে এবং অন্য স্থানগুলিতে যেখানে যত ভূঁইয়া ছিল সকলকে সংগ্রহ করে ভূঁইয়াদের ঘাঁটির আস্তানায় আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়ে দিল। তারা বন্দুক, তরবারি, ধনুক, তীর নিয়ে পর্বতে গোড়া থেকে চূড়ো অবধি ঘাটের দুইধারে গুপ্তভাবে পাহারায় রইল। প্রথম হতে সে জায়গাটাকে আমি বড় ভয় করছিলাম। কারণ শত্রুপক্ষ বৃক্ষমূলে অথবা পাথরের ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে থেকে পথচলা লোকেদের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। অথচ নিচে

অবস্থিত লোকেদের পক্ষে সেই অদৃশ্য শত্রুদের উপর অস্ত্রপ্রয়োগ করবার উপায় ছিল না। আবার ঘাটের পথটা এত সংকীর্ণ যে, অধিক লোকের পক্ষে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে যুদ্ধ করার সম্ভাবনা ছিল না।

খুব ভোরে ঘাটে সন্ধান নিয়ে আসার জন্য পুনর্বার বসন্তপুরের সেই ফৌজদারকে পাঠিয়ে দিলাম। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পাইকদের আদেশ করলাম। এত লোক প্রস্তুত হওয়া, আবার হাতী জুততে প্রায় একঘণ্টা কাল কেটে গেল। সূর্য উদয় হয়ে সর্বত্র রোদে ভরে গেছে, আমরা কানিজোর পার হয়ে অল্পদূর গিয়েছি, বসন্তপুরের ফৌজদার ঘাটি হতে ফিরে এসে সংবাদ দিল— ঘাটির কাছে কেউ নেই স্বচ্ছন্দে চলে যান। এইটুকুমাত্র কথা বলে দিয়ে ফৌজদার বনের মধ্যে কোথায় অন্তর্ধান হয়ে গেল, পরে খোঁজ খবর নিয়ে তার আর সাক্ষাৎ পেলাম না। আমরা নিশ্চিন্তে চলতে লাগলাম। কানিজোর হতে প্রায় অর্ধক্রোশ গিয়ে পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হবামাত্র বন্দুকের আওয়াজ ও মানুষের কোলাহলে তিনদিকের সমস্ত পর্বত কয়েক মিনিট পর্যন্ত কম্পিত হতে লাগল। আমার সওয়ারী হাতী সমস্ত পাইকের সম্মুখ ভাগে ছিল, হাতীটা অবধি চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। আমার সম্মুখ আর দুই পাশে পর্বতশ্রেণীর মধ্যে বহুসংখ্যক লোক পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মনে হল। পরে বুঝতে পারলাম যত লোক থাকার ও যত বন্দুকের আওয়াজ হওয়া অনুমান করেছিলাম প্রকৃতপক্ষে তত ছিল না। পর্বত গহ্বর হতে উত্থিত প্রতিধ্বনি আমার ভ্রমজাত করিয়েছিল। সে স্থানে একটা বন্দুকের আওয়াজ করলে দশটা বন্দুকের আওয়াজের মতো শোনা যেত।

মুহূর্তের জন্যে হাতীর উপরে বসে চিন্তা করলাম, এখন কি কর্তব্য। পাইকদের সেই স্থানেই দাঁড় করিয়ে দুই পাশের কিছুদূর অবধি হাতী দৌড় করিয়ে একটা উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করলাম। অভিপ্রায় একটা উঁচু বৃক্ষবহুল স্থান পেলে সেই স্থানে পাইকদের রেখে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করব। দুর্ভাগ্য উপস্থিত হবার সময় কোনো প্রকার সুবিধা হয়ে ওঠে না। সে স্থানটা পাতলা জঙ্গলময়, শত্রুপক্ষের দৃষ্টিগোচর স্থান। আর কোনো রকম উপায় নেই। সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়লাম। শতখানেক বন্দুক গুলি বারুদ প্রস্তুত ছিল। হয়ত আমি কারও প্রতি বন্দুক চালাবার হুকুম দিয়ে ফেলব, ফলে পরাজয় নিশ্চয়। একটি অকারণ রক্তপাত কেন হবে? সমস্ত বন্দুকের গুলি খালি করে

ফাঁকা আওয়াজ করার হুকুম দিলাম। সেই শত বন্দুকের আওয়াজ সহস্র বন্দুকের আওয়াজের মতো শোনাল। সেই সময় আমার ভ্রম বুঝতে পারলাম, তাহলে তো ভূঁইয়াদের নিকট এত বন্দুক নেই। খামখা প্রতিধ্বনি শুনে এত ভয় পেলাম, অকারণ চিন্তা করেছি, কিন্তু সব চিন্তার সমাপ্তি হয়েছে।

আমি হাতী দৌড় করিয়ে স্বচ্ছন্দে আনন্দপুরে পালিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু পাইকদের শত্রুর হাতে ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসতে বড় লজ্জা বোধ হল। পিছনে সরে এসে বসন্তপুরে সেই আমবনে উপস্থিত হলাম। পাইকদের শ্রেণীবদ্ধ করে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করছি, ইত্যবসরে ভূঁইয়ারা এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। বেষ্টনকারী ভূঁইয়াদের সংখ্যা অল্পমাত্র ছিল। স্বচ্ছন্দে তাদের মেরে তাড়িয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু অল্প দূরে বহুসংখ্যক ভূঁইয়া উপস্থিত থাকায় ভরসা পেলাম না।

কেঁওঞ্ঝর প্রজা বিদ্রোহ। শেষাংশ

ভূঁইয়ারা আমার নিকটে উপস্থিত হয়ে বলল, ধরণীধরবাবুর নিকটে যেতে হবে। আমি দ্বিরুক্তিমাত্র না করে হাতীতে চড়ে দলবল সকলকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। বসন্তপুরের পশ্চিমদিকে সেই বয়ারাশি পর্বত পাদদেশের বাসাঘর আস্তানা ভূঁইয়াদের একটি প্রধান আড্ডার জায়গা। ধরণীধরের বড় ভাই গোপালিআ সেই বাসাঘর ঘাঁটির রক্ষক, আবার সে ভূঁইয়াদের সমস্ত সৈন্যের উপর সেনাপতি। এর ছয়মাস পূর্বে তাকে নিজগড় জেল-খানাতে দেখেছিলাম, পায়ে একটা মোটা লোহার বেড়ী পরে হরিকাঠে[১] বাঁধা ছিল। গোপালিআ পাঁচ হাত লম্বা পুরুষ। বিশাল শরীর দেখতে স্থূল এবং ভয়ংকর। তার ষাঁড়ের মতো মাংসপেশীগুলি যেন কাষ্ঠ নির্মিত, ছাতি চওড়া, চেপ্টা মুখ, বিশাল এবং বিকৃতাকার, ভয়ংকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু। একটা মোষের মতো বলবান। লোকটা যেরূপ মূর্খ সেইরূপ নৃশংস এবং অত্যাচারী। অনেকগুলি খোলা তরোয়াল ও ধনুক দুই পাশে নিয়ে একটা পাথরের উপর বসে ছিল। অনেকগুলি ভূঁইয়া, ধনুক, বাঁশ, কুঠার, খোলা তরোয়াল নিয়ে গোপালের হুকুমের অপেক্ষায় তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। আমি উপস্থিত হবামাত্র রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়ে কঠিনভাবে আমাকে একদণ্ড চেয়ে দেখল। আমিও বন্দী অবস্থায় তার সামনে দাঁড়িয়ে তার ভীষণ আকৃতি, মুখের ভাব চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। একদণ্ড পরে আমার প্রতি হুকুম হল, 'চল রাইসুআঁ ধরণীবাবুর কাছে।' আমি হাতীতে বসলাম, দুই হাতে দুইটি খোলা তরোয়াল নিয়ে সে আমার কাছে বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর হাতে পিস্তল আছে কি?' আমি বললাম—না। সে বলল,—'আচ্ছা, শোন্ তুই যদি গড়ে পালাবার চেষ্টা করিস তবে তোকে কেটে ফেলব, জেনে রাখ্।' কোমরে কুঠার ও তরবারি বেঁধে, গুণ চড়ানো তীর ধনুক হাতে করে চল্লিশ পঞ্চাশ জন প্রহরী আমাকে ঘিরে রাইসুআঁর দিকে চলল। আমাদের যাত্রার

১ কাঠের ফ্রেম যাতে হাত পা বদ্ধ হয়ে থাকে। হাড়িকাঠ।

সময়ে দলে দলে লোক রাইস্থআঁর দিক থেকে বাসাঘর মাটির পানে আসছিল। সম্মুখে কোন লোক আসতে দেখলে আমাদের প্রহরী ডাক দিত, 'হুঁসিয়ার' আগন্তুক যদি জবাব দেয় 'হুঁসিয়ার' তবে ত কোন কথা নেই, যদি কোন জবাব না দেয় তবে তার প্রতি হুকুম হবে—তফাত, তফাত, তফাত। ভূঁইয়াদের মধ্যে সংকেত ছিল 'হুঁসিয়ার' বলে ডাক দিলে যে হুঁসিয়ার বলে উত্তর দেবে সে আত্মপক্ষীয় লোক, জবাব না দিলে বাইরের লোক।

আমাদের যাত্রার প্রায় আধাআধি রাস্তায় একটা ভীষণ লোক ধনুকে গুণ চড়িয়ে আমাকে ডাক দিলে, 'ওহে বিচিত্রানন্দ সকাল হতে সন্ধ্যে অবধি আমাকে উপোষ রেখে, কষ্ট দিয়ে কাজ করিয়েছিলে না? আজ তোকে নিশ্চয় মারব।' আমাকে লক্ষ্য করে গুণ টানল। আর সিকি সেকেণ্ড মাত্র বিলম্ব। সেই সময় স্থির করলাম, মৃত্যু নিশ্চয়। ইত্যবসরে পিছন হতে একজন লোক ছুটে এসে ধনুকধারীর গুণের মুঠিটা ধরে নিল।

বেলা আন্দাজ তিনটার সময় আমরা রাইস্থআঁয় পৌছলাম। হাতী হতে নামামাত্র ধরণী ভূঁইয়া আমার কাছে ছুটে এসে বলল, 'আমার পায়ে পড়, আমার পায়ে পড়।' আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছি, মনে ভাবলাম একি, কাল লোকটা আমার অধীনে সার্ভে কাজ করছিল; আজ এ ছোঁড়াটার পায়ে পড়ব? আমায় রসুয়ে বামুন ব্যাকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে পিছন হতে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আপনি পায়ের তলে পড়ুন।' মনের মধ্যে চিন্তা করলাম ধরণী হুকুম দিলে গোপালিয়া আমাকে এখনই কেটে ফেলবে। তার জন্য ভাবি না। কথা হচ্ছে আমার লোকজনকে কষ্ট দেবে। আমি পায়ে না পড়ে অবনত মস্তকে নমস্কার করাতে ধরণী আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তার বিছানার পাশে বসাল।

দিবা অবসান প্রায়, স্নানাহার করার অনুমতি পেলাম। ধরণীর সভাঘরের অল্প দূরে আমার রাত্রিবাসের জন্য একটা অস্থায়ী ছাউনি করা ঘর দেওয়া হল। ভিতরটা লম্বায় চওড়ায় পাঁচ হাত করে। পাতা ভরা শাল গাছের ডাল দিয়ে চার পাশের বেড়া হয়েছে, সেই শালের ডাল দিয়ে উপরের চাল। ভিতরে বসে আকাশের নক্ষত্র গোনা যায়। কিছুদিন পূর্বে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, মেঝেটা ভিজে। আমার ছাউনি ঘরের সামনে খোলা তরোয়াল নিয়ে একদল ভূঁইয়া আমাকে পাহারা দিচ্ছে। ছাউনি ঘরের পিছন দিকেও পাহারা বসেছে। আমি নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। চাকর সেই ভিজে মাটির উপর বিছানা পেতে

দিল। সন্ধ্যার পর আহার করে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার অল্পক্ষণ পরে রাশি রাশি ডেয়ো পিঁপড়ে আমার গায়ে উঠে কামড়াতে লাগল। ছাউনির ভিতরে ভিজে মাটির উপরে ডেয়ো পিঁপড়ে সারি সারি চলছিল। আমার আগে জানা ছিল না। শোব কি ? সারা শরীর আগুন ধরে যাওয়ার মতো জ্বলছে। গায়ে হাত বুলিয়ে বিছানার উপর হতে পিঁপড়ে তাড়াতে রাত কেটে গেল। সকালে ধরণীধরের সভা বসল। চারদিক হতে ভুঁইয়া জড় হতে লাগল। আজ ভুঁইয়া অঞ্চলের সকলের ভারি আনন্দ, ম্যানেজার ধরা পড়েছে। পাঠকদের বোঝাবার সুবিধার জন্য ধরণীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এখানে প্রকাশ করা আবশ্যক।

ধরণীধর একটি ভুঁইয়া যুবক। মহারাজা ধনঞ্জয় নারায়ণ ভঞ্জ তাকে কটকে পাঠিয়ে সার্ভে পড়িয়েছিলেন। মহারাজার খরচে কটকস্থিত মহারাজার কেঁওঞ্ঝর কুঠিতে থেকে সার্ভে স্কুলে পড়ছিল। স্কুল হতে পাশ করে এসে কেঁওঞ্ঝর রাজ সরকারে কয়েক মাস সার্ভেয়ারের কাজ করার পর প্রচার করে দিল মহারাজ প্রজাপীড়ক অত্যাচারী।[১]

১ পরলোকগত মৃত্যুঞ্জয় রথ উৎকল সাহিত্যের ২২শ ভাগ, পঞ্চম সংখ্যায় বিদ্রোহের যে কারণ দেখিয়েছেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হল :

"এই বিদ্রোহের প্রধান কারণ হচ্ছে, কেঁওঞ্ঝরের ভূতপূর্ব মহারাজা ধনুর্জয় নারায়ণ ভঞ্জদেও বড় প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁর অত্যাচারে প্রজারা, বিশেষতঃ ভুঁইয়ারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দল বেঁধেছিল। ধরণীধর নামক একজন ভুঁইয়া যুবক এই বিদ্রোহের দলপতি হয়েছিল। বিদ্রোহের সূত্রপাত এইভাবে হয়েছিল। ধরণীধর রাজদত্ত বৃত্তিতে কটক সার্ভে স্কুলে শিক্ষা করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে বিনা বেতনে কেঁওঞ্ঝরের সার্ভেয়ারের কাজ করছিল। এইসময় কেঁওঞ্ঝর সিংভূমের সীমা বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে কেঁওঞ্ঝর মহারাজার পক্ষ হতে উক্ত ধরণীধর বিবাদ স্থলে প্রেরিত হয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে শুনল যে বিনাদোষে তার ভাই এবং কয়েকজন ভুঁইয়া মহারাজার আদেশে কারারুদ্ধ হয়েছে এবং সে ফিরে এলে তারও সেই দশা হবে।

ধরণী একথা শোনামাত্র রাজকার্য ছেড়ে তার শ্যালক নরেন্দ্র মহাপাত্রের গৃহে আশ্রয় নিল এবং অত্যাচার নিবারণের উপায় বিধানের নিমিত্ত ভুঁইয়াদের উত্তেজিত করে চাঁদা সংগ্রহ করল। ১৮৯১ সনে জানুয়ারি মাসে তারা কমিশনর সাহেবের নিকট এক বিবরণ পত্র এবং তার একটি প্রতিলিপি ময়ূরভঞ্জের ম্যানেজারের নিকট প্রেরণ করেছিল। কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায় অত্যাচার নিবারণের জন্য ধরণীধর ভুঁইয়াদের 'নায়ক' পদে অভিষিক্ত হয়ে গুপ্তভাবে চারিদিকে সংবাদ পাঠাল। অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচশত ভুঁইয়া তার কাছে একত্র হল এবং অনেক গ্রাম হতে বহু লোক স্বাক্ষরিত অত্যাচার কাহিনী তার নিকট উপাহৃত হল।

ধরণীধর নিজের দলবল নিয়ে তাহাদের আহারাদি ব্যয় নির্বাহ নিমিত্ত মহারাজার খামারাদি লুণ্ঠন করেছিল। যুদ্ধ করার জন্য তিনটি তোপ ও কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল। মহারাজা এসব দেখে রাজ্য ছেড়ে কটকে পালিয়ে এলেন।—প্রকাশক।

সে (ধরণী) কটক হতে মহারানীর ধর্মপুত্র হয়ে এসেছে। রাজ্যে ন্যায় স্থাপন করবে। ভূঁইয়ারা নানা কারণে মহারাজার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। ধরণী একথা প্রকাশ করা মাত্র সকলে তার বশ্যতা স্বীকার করে রাজশক্তিকে অমান্য করতে লাগল। ধরণীর আদেশ লঙ্ঘনকারী অন্য জাতীয় প্রজাদের এবং রাজার খামার ঘর লুঠতরাজ হতে লাগল। বিদ্রোহীরা কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করে রাখল। সিংভূমের দিক থেকে মহাপাত্র নামে একজন ভূঁইয়া এসে ধরণীর সঙ্গে যোগ দিল। এ লোকটা বুদ্ধিমান, মামলা মকদ্দমা বোঝে। বিদ্রোহের প্রাধান্য দেখে মহারাজা নিজ গড় পরিত্যাগপূর্বক আনন্দপুরে চলে গিয়েছিলেন।

সকালবেলা মহারানীর পুত্র ধরণীধরবাবু দরবার করে বসে আছেন, কেঁওঞ্ঝর ভূঁইয়া এলাকার সকল প্রধান প্রধান ভূঁইয়া উপস্থিত। আমার তলব পড়ল। ধরণী আমাকে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ফকীরমোহনবাবু, তোমার এখন কি বলবার আছে?' আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, 'আমার আর কথা কি আছে? আমি কিন্তু এ দেশের লোক নই, বালেশ্বর হতে চাকরি করতে এসেছি। মহারাজা আমাকে ম্যানেজারের পদে রেখেছিলেন। এখন মহারাজা চলে গিয়েছেন, আপনি এখন দেশের অধিপতি, প্রকৃতই এটা ভূঁইয়াদের রাজ্য। আমাকে ম্যানেজারের পদে রাখেন ত থাকব. না হলে দেশে চলে যাব। আমার আর বলা কওয়ার কি আছে?' ধরণী বলল, 'ঠিক বলেছে, বাবুটা ঠিক বলেছে। আমরা তোমাকে ম্যানেজারের পদে রাখব।' ভূঁইয়াদের দিকে তাকিয়ে ধরণী জিজ্ঞেস করল—'তোমরা কি বল?' সমস্ত ভূঁইয়া একবাক্যে চিৎকার করে বলল—'না না, এ লোককে ম্যানেজার রাখা হবে না। এ হচ্ছে মহারাজার তরফের লোক।' ধরণী বলল—'মহারাজা কে হে! আমি মহারানীর পুত্র, আমি মহারাজা আর এ তো আমাদের ম্যানেজার।' আমি যে বলেছিলাম এ রাজ্যটা ভূঁইয়াদের এ কথাটি শুনে ঢের ভূঁইয়া আমার উপর খুসি হয়ে গেছে। ভূঁইয়াদের এ পর্যন্ত একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল, প্রকৃত কেঁওঞ্ঝর রাজ্যটা তাদের, ইচ্ছা করলে পুরোনো রাজাকে বার করে দিয়ে নতুন রাজা নিযুক্ত করার তাদের অধিকার আছে। এই ভ্রান্ত নিতান্ত মূর্খ ধারণা হেতু এর পূর্বেও কয়েক বার বিদ্রোহ হয়েছিল। এ-প্রকার মারাত্মক বিশ্বাসের ঐতিহাসিক কারণ—

প্রথম অবস্থায় ময়ূরভঞ্জ এবং কেঁওঞ্ঝরে মিলে একটা রাজ্য ছিল। ময়ূরভঞ্জ

রাজধানী দূরের পথ, অভাব অভিযোগ জানানো কেঁওঞ্ঝরের ভূঁইয়াদের পক্ষে অসুবিধাজনক। এই কারণে ভূঁইয়ারা ময়ুরভঞ্জ রাজবংশের একটি বালককে চুরি করে এনে কেঁওঞ্ঝর রাজ গদিতে বসিয়েছিল। গদিতে বসতে যাবার সময় রাজার হাতী কিম্বা ঘোড়া ছিল না। দুইজন ভূঁইয়া চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়া হল। ময়ুরভঞ্জ হতে অপহৃত শিশু রাজা তাদের উপর চড়ে রাজসিংহাসনে বসতে গেল। রাজা গদিনসিন হবার পরে একটি কল্পিত অপরাধী ভূঁইয়া সিংহাসনের সামনে লম্বা হয়ে পড়ে গেল। রাজাসাহেব গদিতে বসে তার গলায় একটি উন্মুক্ত তরবারি ঝুলিয়ে দিলেন। তার অর্থ অপরাধী ভূঁইয়াকে কেটে ফেলার অধিকার রাজাকে দেওয়া হল। বর্তমান কাল অবধিও কেঁওঞ্ঝরের নূতন রাজা গদিনশিন হবার সময়ে সেইরূপ অভিনয় হয়ে থাকে।

বর্তমান বিদ্রোহের কারণ মাছকান্দণা জোর[১]। নিজগড়ের নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত অনুচ্চ পর্বতশ্রেণীর মধ্যভাগে মাছকান্দণা ঝরণা প্রবাহিত। সেই ঝরণার জল উত্তরদিকে বয়ে গিয়ে বৈতরণী নদীতে পড়েছে। নিজগড় মুকাম হতে পার্বত্য প্রদেশে যাবার জন্য যে পথ পড়ে আছে, পর্বতের পাদদেশ হতে সেই পথে অল্প দূর গেলে মাছকান্দণা ঝরণা পড়ে। কেঁওঞ্ঝর নিজগড় গ্রামটা পর্বতের উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। পথের পাশে পর্বত শৃঙ্গের অতি অল্প অংশ মাত্র ভেঙে দিয়ে পূর্বদিকে একটি খাল খুলে দিলে ঝরণার জলটা উত্তরদিকে না গিয়ে পূর্বদিকস্থ নিজগড়ের সমস্ত খেতে ছড়িয়ে যেত। খাল খোঁড়ার সময় আমি সেই মাছকান্দণা দেখতে গিয়েছিলাম। ঝরণা দেখে আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হল। এই ঝোরাটি নিজগড়ের পক্ষে যথেষ্ট আয়কর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। কিন্তু যে কল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলাম তার সার্থকতার সম্ভাবনা এতে ছিল না। অনুমান করলাম ঝরণার দুই পাশে উচ্চ পর্বত। উত্তরদিকে ঝরণার স্রোতের জল আটকাবার জন্য একটি বড়ো বাঁধ বেঁধে দিলে একটা হ্রদের মতো জল জমা হয়ে যাবে। পূর্বদিকে খাল খুলে দিয়ে কপাট লাগিয়ে দিলে ইচ্ছানুসারে গ্রামের মধ্যে জল নেওয়া যাবে। এ ব্যবস্থা থাকলে যতই অনাবৃষ্টি হোক ফসল নষ্ট হবে না। কেবল এই নয়, পর্বত মূল হতে পূর্বদিকে নিজগড় গ্রামকে দুই ভাগে বিভক্ত করে কেনালের মতো একটি নালা আছে। বর্ষার সময় কেবল জল থাকে, অন্য সময়ে শুষ্ক। এতে জলপূর্ণ করে রাখলে গড়বাসীদের পক্ষে স্নান, পান এবং খেতের ফসল

১ ঝোরা। উচ্চারণ জোর অ।

আবাদের পক্ষে বড় উপকার হত। গড়বাসীরা যে সর্বদা জ্বর ভোগ করছে, ভাল জলের ব্যবস্থা করলে স্বাস্থ্য রক্ষা হত, আর জ্বর হত না। এই ঝরণার জন্য আনুমানিক দশ হাজার টাকা ব্যয় আবশ্যক। গড়ের অ্যাসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজারবাবু বিচিত্রানন্দ দাস আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার অভিপ্রায় তাঁকে জানালাম।

ঝরণা দেখে ফেরার পর মহারাজা বিচিত্রানন্দবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন— 'ঝোরা দেখে ম্যানেজারবাবু কি বললেন ?' বিচিত্রানন্দবাবু কেবল এই মাত্র বললেন, 'খাল খোঁড়াতে দশ হাজার টাকা খরচ হবে।' মহারাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ম্যানেজারবাবু সব বিষয়ে টাকা খরচ করাতে চান।' মহারাজা সে সম্বন্ধে আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেন না, আমিও নিজে থেকে কিছু বললাম না। মহারাজার আদেশ অনুযায়ী আমি কটক হতে খুব মোটা মানুষ প্রমাণ লম্বা ইস্পাত লোহার শাবল আনিয়ে দিলাম। মাছকান্দণার জল নিজগড় মৌজার খেতে আনাবার জন্য পর্বতশৃঙ্গ ভেঙে খাল খনন আরম্ভ হল। তাতে ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হলেন নিজগড় কাছারির অ্যাসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজার বিচিত্রানন্দ দাস। ভুঁইয়া প্রজাদের ধরে এনে বেগার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল।

অ্যাসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজারবাবু আনন্দপুর অফিসে পেস্কার ছিলেন। লোকটি অত্যন্ত পরিশ্রমী, স্নানাহার না করে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজে লেগে থাকতেন। তাঁর কর্মঠ স্বভাব দেখে মহারাজা নিজগড় এলাকায় তাঁকে অ্যাসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজারিতে নিযুক্ত করেছিলেন। বিচিত্রানন্দবাবুর ইচ্ছা তিনি যেরূপ পরিশ্রমী, বেগার খাটা মজুররাও সেরূপ পরিশ্রম করুক। ভুঁইয়া বেগার শ্রমিকরা খাল খননে লেগে আছে। দশ পনরো সের ওজনের শাবল দিয়ে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাথর ভাঙতে হবে, এটা সহজ কথা নয়। মাঝখানে খাবার জন্য বারোটার সময় দুই ঘণ্টা ছুটি। কাজে কিছু ঢিলা দিলে মজুর মার খায়। যে মজুর ঘর হতে চাল বেঁধে এনেছে, সে রান্না করে খায়, যে কাঙালের ঘরে কিছু নেই, চাল আনতে পারে নি সে উপোসে শুয়ে থাক্, বেগার খাটা মজুরকে আবার চাল দেবে কি ?

নিতান্ত কষ্ট পাওয়াতে তারা মরিয়া হয়ে সমস্ত ভুঁইয়ারা একজোট হয়ে বিদ্রোহী হল। অভিলাষ অ্যাসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজারবাবু বিচিত্রানন্দ দাসকে কেটে রাজাকে বার করে ফেলে দেবে। বিচিত্রানন্দবাবু তাদের হাতে পড়লে নিশ্চয়ই কোতল হতেন। পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেলেন।

এই সময় ধরণীধর ভূঁইয়া কটক হতে এসে নিজেকে মহারানীর পুত্র বলে পরিচয় দেওয়াতে তাকে মহারাজার পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ভূঁইয়াদের বিশ্বাস রাজাকে বার করে দেবার এবং নূতন রাজা নিযুক্ত করার অধিকার তাদের আছে। প্রসঙ্গক্রমে অতীতের কতকগুলি কথা লিখে ফেললাম, বর্তমানে উপস্থিত ঘটনার বিষয় আরম্ভ করা যাক।

সেদিন আমার ম্যানেজারিতে নিযুক্তি সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে পারল না। অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হল। সেদিন রাত্রিতেও ছাউনির মধ্যে ডেয়ো পিঁপড়ের উৎপাতে, নিদ্রার অভাব। দ্বিতীয় দিনের সভা আরম্ভে আমাকে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করার প্রসঙ্গ উঠল। অধিকাংশ সর্দার আমাকে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করার সম্বন্ধে আপত্তি করাতে মহারানীর পুত্র ধরণীধর বলল, 'একজন বুদ্ধিমান্ যোগ্য লোক আমার পাশে না থাকলে এত বড় রাজ্য কিরূপে চালাতে পারব? আচ্ছা, তোমরা তো এত লোক আছ, এই বাবুকে দাঁড় করিয়ে দেখ ত—এমন রূপবান্, গুণবান্ একটা লোক বার কর তাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করব, ফকীরমোহনবাবুকে বার করে দেব।' সে সময় ভূঁইয়া এলাকার সমস্ত লোক ধরণীকে দেবাবতার বলে বিশ্বাস করত। আমি মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়ে গেলাম।

ভূঁইয়ারা নিতান্ত বুনো লোক। নিজের দেশ বন পর্বত ছেড়ে অন্য দেশে যাবার ইচ্ছা করে না। নিতান্ত মূর্খ, সুতরাং অন্য দেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান তাদের একেবারেই ছিল না। ভূঁইয়ারা জানত একজন মহারানী আছেন তিনি পৃথিবীর সমস্ত রাজার উপরে অধিশ্বরী। তাঁর রাজধানী কটকে। ধরণীধর কটক গিয়েছিলেন। কেঁওঝর মহারাজা অন্যায় বিচার করাতে মহারানী ধরণীধর ভূঁইয়াকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে তাকে কেঁওঝরের মহারাজার পদে নিযুক্ত করেছেন। এই হেতু সেই মহারানী পুত্র ধরণীধর ভূঁইয়ার আজ্ঞা অমান্য করার শক্তি কারও ছিল না। পূর্বলিখিত মহাপাত্র ভূঁইয়া সমস্ত সর্দার ভূঁইয়াদের গুপ্তভাবে বোঝাচ্ছিল ফকীরমোহন মহারাজার তরফের লোক। সে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হলে ভূঁইয়াদের অমঙ্গল করবে। তাকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা উচিত না। কেবল প্রকাশ্যভাবে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলত না। ধরণীধরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুমাত্র কথা বলার তার সাহসে কুলাত না। অনেক সর্দারের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মহারানীর পুত্র ধরণীধর ভূঁইয়া আমাকে তাঁর মন্ত্রী পদে নিযুক্ত

করলেন। নিযুক্তি পত্রের উপর দস্তখত করে দিলেন মহারানীর পুত্র ধরণীধর ভূঁইয়া। প্রত্যেক কাগজে এইপ্রকার দস্তখত চলছিল।

আমি মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়ে মাহিনার বিষয় উত্থাপন করলাম। মহারানীর পুত্র আজ্ঞা করলেন, 'কোনো কর্মচারী কিছুমাত্র বেতন পাবে না, আমরা কেঁওঝর রাজ্যে ন্যায় বিচার করতে এসেছি, কোন প্রজা খাজনা দেবে না।' বালেশ্বরে আমার ঢের পোষ্য পরিবার আছে বলে আমি নিতান্ত ওজর আপত্তি করতে লাগলাম। বেতন না পেলে তারা রক্ষা পাবে কি করে? বহুক্ষণ অবধি এ বিষয় আলোচনা হতে লাগল। আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, 'বেতন না পেলে আমি আর চাকরি করতে পারব না।' আমার চাকরি করার নিতান্ত অনিচ্ছা'এ বিষয়ে ভূঁইয়াদের জানানো এবং ধরণী ও ভূঁইয়া সর্দারদের অন্যমনস্ক করিয়ে সময় কাটানো আমার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে সময় সময় এক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এইরূপ আলোচনা লাগিয়ে দেই যে বাদ অনুবাদে সময় কেটে যায়। মহারাজা কিম্বা রাজপরিবারের বিপক্ষে কোন বিষয় আলোচনা করার সময় পাই না। অনেক প্রার্থনা ও বাদ অনুবাদের পরে বেতন স্বরূপে ২১ বিঘা জমি নিষ্কর ভোগ করার স্থির হয়ে গেল।

রাইসুঁআয় আসার আজ তৃতীয় রাত্রি উপস্থিত। গত দুই রাত্রি শুতে পারি নি। অনেক চেষ্টা ও প্রার্থনা করে রাইসুঁআ মৌজার প্রধান আমাকে একটি পুরনো দড়ি বোনা ছেঁড়া চারপাই এনে দিল। চাকর তার উপর সুন্দররূপে বিছানা পেতে দিল। আহারাদি সমাপ্ত করে খাটিয়ার উপর গিয়ে বসলাম। মনে ভারি আনন্দ।

এই কাটা ভাঙা চারপাইখানি সম্প্রতি আমার পক্ষে দ্বিরদরদ নির্মিত পর্যঙ্ক বিশেষ বলে মনে হল। গত দুই রাত্রি শুতে পারি নি, আজ ভাল করে শোব। চাকরকে ডেকে বললাম, 'ছিলিমে বেশী করে তামাক আর গণগণে আগুন ভরে এনে দে।' অভিলাষ ভাল করে তামাক টেনে শোব। চাকর তামাক সেজে এনে আমার সামনে ভরে ভাল করে আগুনে ফুঁ দিল। জ্বলন্ত আগুনগুলি দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠছিল। চাকর আমার হাতে হুঁকো বাড়িয়ে দিল। হা অদৃষ্ট একি হল আবার?

আমি ডান হাতে হুঁকো নিয়ে তার ছিদ্রে যেই মুখ দিয়েছি কি রূপে কে জানে হুকোর নলের মাথার উপর হতে ছিলিমটা খসে পড়ে আমার মাথায় আগুন

ছড়িয়ে গেল। হাঁ হাঁ ঝাড় ঝাড়—ঝাড়তে ঝাড়তে জলন্ত আগুনের ফুলকি আমার মাথা হতে পা অবধি সারা বিছানায় পড়ে ছড়িয়ে গেল। ঝেড়ে ঝুড়ে চারপাইএর উপর বসলাম। গালে হাত বুলিয়ে দেখলাম ছোট বড় অনেকগুলি ফোসকা হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও ফোসকা পড়ে নি কেবল জ্বালা করছে। সেই দারুণ যন্ত্রণার সময়ও বড় হাসি পেল। ভাবলাম বিপদ এই ভাবে অকস্মাৎ আসে।

আমি মহারানীর পুত্র ধরণীধরের মন্ত্রী একথা ভুঁইয়া এলাকায় প্রচার হয়ে গেছে। ধরণীধরেরও আমার উপর খুব বিশ্বাস। রাজকার্য নির্বাহের সময় আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন না। ধরণীধর বর্তমানে সেই অঞ্চলে দেবতা তুল্য পূজ্য। প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হতে দলে দলে স্ত্রীলোক শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে ধরণীকে পূজো করতে আসে। ধরণীধর পা বাড়িয়ে দেয়, স্ত্রীলোকেরা হলুদ জলে পা ধুয়ে দিয়ে তার পরে ফুল দিয়ে পূজো করে। ধরণীর পূজো সমাপ্ত হয়ে গেলে আমার পা ধুয়ে পূজো করতে আসে। যে হেতু আমি মন্ত্রী আমাকে পূজা করা আবশ্যক। কিন্তু অমি তাদের নমস্কার করে বলতাম, 'তোমরা আমার মা, আমার পা ছুঁয়ো না। আমি একজন কর্মচারী। আমাকে আবার পূজো করা কি ?' ধরণী আমার কথা শোনে। আমার পাতার ছাউনিতে এসে আমার সঙ্গে পান খায়। এ কথা গোপালিআ আর মহাপাত্রের পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। গোপালিআ পূর্বে অপরাধ হেতু কেঁওঞ্ঝর জেলখানায় হরিকাঠে পড়ে বড় কষ্ট পেয়েছে, সেই কারণে মহারাজার উপরে এবং যে হেতু আমি মহারাজার ম্যানেজার সুতরাং আমার উপরে তার বড় ক্রোধ। আমাকে কেটে ফেলার তার নিতান্ত ইচ্ছা। অনেক সময় আমার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে থাকে—ওঃ এই লোকটার গলাটা বড় লম্বা, কেটে ফেললে হয়। মহাপাত্রের নিতান্ত ইচ্ছা আমাকে পাহাড়ের উপরিস্থিত ভূইয়াদের গ্রামে বন্দী করে রাখে। কেবল ধরণীর ভয়ে তারা কিছু করতে পারছিল না। শেষে ধরণীর অনুপস্থিত অবস্থায় আমাকে ধরে নিয়ে বনে পালিয়ে যাবার জন্য মহাপাত্র আর কয়েকজন ভুঁইয়া গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল। সত্যি সত্যি একদিন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ঘিরে ফেলল। ধরণী সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে তাদের কাছ হতে আমাকে ছাড়িয়ে নিল।

আমি মন্ত্রী, কিন্তু আমার ছাউনির চারধারে কুঠার ধনুক তীরধারী পাইক

পাহারা বসেছে। আমি রাত্রে অনেকবার বাইরে যাই। প্রহরী পাইকেরা বসে ঢুলতে থাকে। আমি খুব তেজের সঙ্গে তাদের বলি, 'আরে তোমরা পাহারায় ঢিলে দিচ্ছ ? এখানে একজন দাঁড়াও, ওখানে একজন দাঁড়িয়ে পাহারা দাও।' এরূপ তেজের সঙ্গে বলার উদ্দেশ্য আমি হাকিম ও মন্ত্রী, বন্দী নই। পাইকেরা হাকিমের দরজায় পাহারা দিচ্ছে। এধারে মনে ভয়ও থাকে, এরা রেগে উঠে আমাকে কেটে ফেললে কি করব ? কিন্তু পাইকেরা আমার তেজের কথা শুনে আজ্ঞে, আজ্ঞে বলে ভয়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে পড়ে।

রাজপ্রাসাদে অনেক লক্ষটাকা জমা আছে। সেই সব টাকা নিয়ে আসা আর রাজপরিবার পরিজনদের ধরে আনা ভূইয়াদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা বিষয় নিয়ে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকায় রাজবাড়িতে লুঠতরাজের বিষয় তারা মন দিতে পারে নি। বর্তমানে সে সমস্ত কাজ আরম্ভ করার সময় উপস্থিত। রাজরানী, রাজকন্যা আর সব পরিজনদের থাকবার জন্য পর্বতমূলে সারি, সারি অস্থায়ী পাতার ছাউনি ঘর প্রস্তুত হতে লাগল। আগে হতে ঘর প্রস্তুত না থাকলে তারা ধরা হয়ে থাকবে কোথায় ? এত দিন হল কষ্টে পড়ে ধৈর্যাবলম্বন করেছিলাম। রানী, রাজকন্যাদের ভূঁইয়ারা ধরে আনবে, একথা শোনা মাত্র আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হল। কোন উপায় স্থির করতে পারছি না।

আজ বিরাট একটা সভা বসেছে। ভূইয়া এলাকার সমস্ত সরবরাকার প্রধান প্রধান ভূইয়া, স্বয়ং মহাপাত্র, স্বয়ং পাইক দলপতি গোপালিআ সকলে উপস্থিত। দরবারে স্থির হয়ে গেল কুঠার তরবারি কোমরে বেঁধে হাতে তীর ধনুক নিয়ে চার পাঁচ হাজার পাইক বাণুআ[1] অমুক দিন সকালে ওখানে উপস্থিত হবে। সকলে একসঙ্গে রাজবাড়ি ঘিরে ফেলবে। প্রাচীর পুড়িয়ে, ভেঙে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে রাজবাড়ির পরিজনদের ধরে আনবে।

আমি ছাউনির ভিতর বসে শুনছিলাম। সব কথা স্থির হয়ে যাবার পর মহারানীর পুত্র ধরণীধর ভূইয়া বলল, 'আচ্ছা, সব কথা ত স্থির হয়ে গেল, মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হোক, সে কি পরামর্শ দেয় দেখা যাক।' আমি দরবারে উপস্থিত হয়ে মহারানীর পুত্রের নিকটে বসলাম। সকল ভূইয়া একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। ধরণী আমাকে সব কথা বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বল ? এ বিষয়ে কি করা হবে ?'

১ বাণুআ মানে যে বাণ মারে। তীর ধনুকধারী।

আমি কয়েক মিনিট অবধি চোখ বুজে গম্ভীর ভাবে বসে রইলাম। এটা হল একটা কৌশল অর্থাৎ আমি সকলকে দেখাচ্ছি যেন অনেক কিছু চিন্তা করছি। শেষে খুব তেজের সঙ্গে চিৎকার করে বললাম, 'সকলে শুনুন, রাজার তোষাখানায় অনেক টাকা আছে। সে সমস্ত বয়ে আনতে হবে। নিশ্চয় আনতে হবে। না আনলে এ জায়গায় কাজ কি করে চলবে?' এইটুকু শুনে সকলে সমস্বরে চিৎকার করে বলল, 'ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন।' তার পরে আমি বললাম, 'সকলে শুনুন, বাঘের বাচ্চা ধরে আনতে হবে, আর যারা বাচ্চা ধরতে যাবে তাদের যেন বাঘে না কামড়ায়! যদি বাঘ তোমাদের ধরে ঘাড় মটকে দেয় তবে ত বাচ্চা ধরতে পারবে না। ধরে আনা যাবে কি? আমি এ কথা কেন বললাম জান? গড়ের ভিতরে দেয়ালের কাছে দুই তিনশ পাইক বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যদি একবার বন্দুক ছোঁড়ে তবে বাইরে থেকে আসা তিনশ লোক এক সঙ্গে উড়ে যাবে। আর গড়ের দুয়ারে যে তোপ বসেছে সেটা একবার দাগা হলে একসঙ্গে পাঁচশ লোক উড়িয়ে দেবে। তবে কি হবে বলত? এই যে সর্দারেরা বসে আছেন, গড় আক্রমণ করতে যাওয়ার সময় তাঁরা সবার আগে থাকবেন ত? কারণ তাঁরা আগে না চললে অন্য লোক পিছনে চলবে না। গড়ের মধ্য হতে বন্দুক ছুঁড়লে সর্দারেরাই ত আগে মারা পড়বেন। এঁরাই ত দেশের মাথা, এঁরাই ত ভূঁইয়া রাজ্যের রক্ষাকারী। এঁরা চলে গেলে আর কাদের নিয়ে রাজ্য করব? এঁরা চলে গেলে গড় হতে ত টাকা আনতে পারব না। আনলেও সে টাকায় কি হবে? এঁরা বড় না টাকা বড়।' সেয়ানা মন্ত্রী এই উপদেশগুলি একসঙ্গে উজাড় করে দিলেন। ভূঁইয়া সর্দারেরা চুপ করে বসে শুনছিলেন। শেষে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে কি করা হবে?' খোদ মন্ত্রী একদণ্ড গুম হয়ে বসে পেট হতে বুদ্ধি বার করল। 'একটা ভাল উপায় আছে। গড়ের তোষাখানা হতে সব টাকা বয়ে আনব, অথচ আমাদের একজন লোকের উপর পাটকেলটিও লাগবে না। তবে চার ছয়দিন দেরী হবে।'

ভূঁইয়ারা—'হোক দেরি—হোক দেরি—উপায়টা কি?'

মন্ত্রী—'উপায় হচ্ছে বোমা ডিনামাইট আনা হবে।'

ভূঁইয়ারা—'বোমা ডিনামাইট্ কি?'

মন্ত্রী—'বোমা ডিনামাইট্ হচ্ছে—গড়ের পিছন দিকের পর্বতের উপর আমরা

লুকিয়ে বসে গড়ের উপর এক একটা বোমা ডিনামাইট্‌ ছুঁড়ে দেব, এক একটা বোমায় গড়ের প্রাচীরের এক একদিকের দেয়াল ধূলোর মতো উড়ে যাবে। প্রাচীরের গায়ে যে পাইকগুলি বন্দুক নিয়ে বসে আছে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সাহেবদের ভিতরের সব কথা মহারানী পুত্রের জানা আছে। সত্যি কি মিথ্যা তাঁকে জিজ্ঞেস কর। সে সব জিনিস এদেশে নেই। কলকাতার দোকানে পাওয়া যায়। কুড়িটা বোমা আমাদের দরকার, লোক গিয়ে একশখানা কিনে আনুক। মাটির প্রাচীরের কথা ছেড়ে দিন, একশ বোমা হলে এই পর্বতটা উড়ে যাবে। জিজ্ঞেস করুন মহারানীর পুত্রকে, সাহেবরা বোমা দিয়ে পাহাড় পর্বত ভাঙেন কিনা?' স্থির হয়ে গেল কলকাতায় লোক গিয়ে একশ বোমা কিনে আনবে। হাজার টাকা দরকার। সাধ্য অনুসারে টাকা দাখিল করতে বড় বড় প্রজাদের নামে পরোয়ানা জারি কর। দুজন আমলা পরোয়ানা লিখতে বসে গেল। হাজার হাজার পরোয়ানার উপরে 'মহারানী পুত্র ধরণীধর ভূঁইয়ার' দস্তখত হবে এটা কি সহজ, দু একদিনের কথা? দিনরাত লেগে পড়ে আমলারা বসে পরোয়ানা লিখছে। মন্ত্রী মশায় বসে তাদের কার্য তদারক করেন।

কেঁওঞ্ঝর গড় রক্ষার জন্য সৈন্য আনবার কথা। গবর্নমেণ্ট হতে হুকুম হয়ে গেছে। এপর্যন্ত এল না—কতদিন ভুঁইয়াদের আটকিয়ে রাখব? একদিন যদি এরা গড়ের ভিতর ঢুকে যায় তবে রাজবংশের সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত সম্ভ্রম এক পলকে নষ্ট হয়ে যাবে। মহারাজাকে এখানকার পরিস্থিতির খবর দিতে হবে। কিন্তু মহারাজা কোথায় কি ভাবে জানব, কি ভাবে খবর দেব? মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বালেশ্বর নিবাসী বাবু ভোলানাথ দে, আনন্দপুর অফিসে সার্ভেয়ার তাঁকে খবর দিলে মহারাজা যেখানেই থাকুন, তিনি মহারাজাকে সংবাদ দেবেন। আমি পূর্বে লিখেছি, ধরণী পান খেতে বড় ভালবাসে। সর্বদা আমার আস্তানায় এসে পান খায়। আমি গিয়ে তাঁকে জানালাম, 'আজ্ঞে, যত পান এনেছিলাম, সব ফুরিয়ে গেল। এ জায়গায় ত পান পাওয়া যাবে না। ভদ্রকে আমার চাষ ঘরের খামার রক্ষক ভোলানাথকে চিঠি লিখলে সে শীঘ্র পান, সুপারী পাঠিয়ে দেবে। আদেশ দিলে তাকে চিঠি লিখব।' আদেশ হল 'শীঘ্র লেখ।' চিঠিতে পানের কথা লেখার পর জানালাম, 'আজ্ঞে, ভদ্রকে আমি একটি আখের চাষ করেছিলাম। আমিত চলে এলাম, জল না পেয়ে

আখগুলি হয়ত মরে গেছে। আজ্ঞা হলে তাতে জল দিতে খামার রক্ষককে লিখব।' আদেশ হল—'হাঁ লেখ, হাঁ লেখ।' যে চিঠি লিখেছিলাম তার অবিকল নকল নীচে দিলাম—

মে মাস ১৬ তারিখ সন ১৮৯১
মুকাম রাইসুআঁ

ভোলানাথ খামারী জানবি। মহারানী পুত্রের জন্যে নিতান্ত দরকার অতিশীঘ্র একশ খানা অন্ততঃ পান, দুইশ সুপারী পাঠাবি। পশ্চিম দিক[1] হতে খাল কেটে আখখেতে শীঘ্র জল দেওয়াবি নইলে আখের খেত বিনাশ হবে বলে জানবি। ইতি— ফকীর মোহন সেনাপতি।

মহারানী পুত্রকে চিঠি পড়ালাম। ছাড়পত্রে মহারানী পুত্র দস্তখত করলেন। কেঁওঞ্ঝর নিজ গড় হতে আনন্দপুরের পথে তিন চার জায়গায় ঘাঁটি বসেছে। মহারানী পুত্রের দস্তখত ছাড়পত্র না নিলে কোন লোক যাওয়া আসা করতে পারবে না। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আবার পথিকদের কাপড়চোপড় ঝেড়ে খানা তল্লাস হচ্ছিল। চারজন বলবান্ পাইকের হাতে চিঠি দিলাম। একজন খণ্ডায়েৎ পাইকের উপবীতে সোডার বোতলের ছোট ছোট তিনটে তার জড়িয়ে দিলাম। আনন্দপুর মুকামে ভোলানাথ বাবুর হাতে সেই চিঠি আর তার তিনটা দিতে নির্দেশ দিলাম। পাইকেরা বন্দী অবস্থায় ছিল। ঘরের পানে যাবে, দিন কি রাতের কথা না ভেবে আনন্দপুর অভিমুখে ছুটল। মহারাজা আনন্দপুরে উপস্থিত ছিলেন। পাইক তার তিনটে মহারাজের হাতে দিল। মহারাজা ধনঞ্জয় নারায়ণ ভঞ্জ বড় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, চিঠি পড়ে তার তিনখানা দেখে তৎক্ষণাৎ সকলের সাক্ষাতে অর্থ করলেন, এই তার তিনখানার অর্থ—গবর্নমেণ্টকে কটক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে আর একজন কাউকে নন্দকিশোরবাবু কিম্বা মধুবাবুকে তারে খবর দিতে ম্যানেজারবাবু সঙ্কেত করেছেন। পান অর্থ সিপাহী, সুপারী মানে বন্দুকের গুলি অর্থাৎ বন্দুকধারী সিপাহী। আখ খেত অর্থ গড়। সমুদয় কথার অর্থ—একশ জন অন্তত বন্দুকধারী সিপাহী পশ্চিমদিক হতে যেতে

[1] চাইবাসা উত্তর দিকে, আমি ভুল করে পশ্চিমে লেখাতে মহারাজার অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়েছিল।

না পারলে গড় লুঠ পাট ও নষ্ট হয়ে যাবে। আসলে সিপাহীদের উত্তর, দিক চাঁইবাসা পথে যাবার কথা, তিনি পশ্চিম দিক কেন লিখেছেন?

এ দিকে আমার সৈন্যদের পথ চেয়ে দিন কাটছে। মহারানীপুত্র ধরণী আমার হাতে আছে, অনেক ভূঁইয়া সর্দারও আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। তাদের পাশে বসিয়ে হেসে হেসে রাজত্বের কথা, ঘরকরনার কথা সুখ দুঃখের কথা ব'ল। কেবল মহাপাত্রকে পারলাম না। সে সর্বদা আমার গতিবিধি কথাবার্তার উপর লক্ষ্য রাখে। কিন্তু আমি যে তাকে সন্দেহ করছি তা জানতে দেই না। মনে মনে ভাবি—মন্ত্রী বুদ্ধি[১] ভূইঁয়া বুদ্ধি কোলাকুলি কার জিত হবে দেখা যাবে। গোপলিআ আমাকে দেখলে রাগে দাঁত কড়মড় করে। আমার লম্বা গলাটি কেটে ফেলার তার ভারি ইচ্ছা। ভূঁইয়াদের গুপ্তচর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার বন্ধনের অষ্টমদিনে সকালে সরকারী ফৌজ জয়ন্তীগড়ে এসে পৌঁচেছে গুপ্তচর এসে খবর দিল। বিকালবেলা ফৌজের তৎকালীন কাপ্তেন ডাউসন্ সাহেবের চিঠি নিয়ে একজন সিংহভূমি নিবাসী সম্ভ্রান্ত লোক মহারানী পুত্র ধরণীধর ভূইঁয়ার নিকটে উপস্থিত হল। অতি সেয়ানা মন্ত্রী সেই চিঠি পড়ে মহারানী পুত্রকে শুনিয়ে দিল। ধরণীধর ভূঁইয়ার এখন উচিত হচ্ছে, সে স্বয়ং গিয়ে সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুক। মহারানী পুত্র সেই চিঠিখানি তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে টুকরো টুকরো করে তাচ্ছিল্য ভরে ফেলে দিল। খোদ মন্ত্রীও খুব একচোট হেসে ফেলে বলল—'সাহেবটা মূর্খ, সে না এসে আপনাকে সেলাম করবে। তা না করে লিখেছে আপনি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন।' পত্রবাহক ভদ্রলোককে পাশে বসিয়ে সরকারী ফৌজ সংখ্যা, কাপ্তেন সাহেবের অভিপ্রায়, রাইসুআর পানে আগমনের সময় ইত্যাদি বিষয় জেনে নিলাম এবং সংক্ষেপে রাইসুআর অবস্থা সাহেবকে সংবাদ দিলাম। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে আনন্দপুর পথের ধারে ঘটগাঁ মুকাম হতে বালেশ্বর জেলার ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছ হতে মহারানী পুত্রের নিকটে একখানা চিঠি এসে পৌঁছোল। সে পত্রেও মহারানী পুত্রকে হাজির হবার আদেশ। সে পত্রখানিও তাচ্ছিল্যভারে ছিঁড়ে ফেলা হল। ডাউসন সাহেবের সঙ্গে একশজন সশস্ত্র সিপাহী এবং স্বয়ং মহারাজা ছিলেন। মহারাজাকে সঙ্গে না আনতে ডাউসন সাহেবকে গুপ্তভাবে সংবাদ দিলাম। বাসাঘর ঘাঁটির নিকটে অনেকগুলি ভূঁইয়া

১ পাশাখেলার রাজা মন্ত্রীর ইঙ্গিত।

অস্ত্রশস্ত্র ঘিরে পাহারা দিচ্ছিল। সেইটা ভূঁইয়াদের প্রধান ঘাঁটি, গোপালিআ সেই জায়গার সেনাপতি। আমার আশঙ্কা ছিল যদি কোন একজন ভূঁইয়া বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে মহারাজার উপর তীর ছোড়ে।

নবম দিন প্রাতঃকালে চারজন সাহেব ঘোড়ায় চড়ে অনেকগুলি বন্দুকধারী সিপাহীর সঙ্গে রাইসুঁআর দিকে আসছেন এই খবর দৌড়চর সংবাদ দিল। মহারানীর পুত্র তাঁর মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি ? এখন কি করা যায়' মন্ত্রীমহাশয় বললেন, 'আজ্ঞে, ঠিক হল ভালই হল, আপনি হলেন মহারানীর পুত্র, যে সাহেবরা আসছে তারা মহারানীর চাকর। তারা আপনাকে সেলাম দিতে আসছে। আপনার উচিত মহারানীর মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত নিজে এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে আসা।'

সম্প্রতি আমার ভয় ধরণী আর মহাপাত্র দুইজন পালিয়ে গিয়ে যদি বনে লুকোয়, তাদের খুঁজে বার করা মুশকিল হবে। এইহেতু আমি সজাগ হয়ে মহাপাত্র কিম্বা অন্য ভূঁইয়াদের সঙ্গে ধরণীর পরামর্শ করার সুযোগ দিচ্ছিলাম না।

মহারানী পুত্র সাহেবদের প্রত্যুদ্‌গমন করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, একটা লাল কস্তা ধুতি পরনে, মাথায় একটি মূল্যবান্ সাচ্চা জরির কাজ করা টুপি। এই দামী টুপিটা পশ্চিমাঞ্চলবাসী সওদাগরের দ্রব্য লুণ্ঠন দ্বারা প্রাপ্ত। হাতে খোলা তরবারি, সঙ্গে কুঠার আর ধনুক নিয়ে আট দশ জন ভূঁইয়া প্রস্তুত। সেয়ানা মন্ত্রী বলল—'হাঁ হাঁ, এ কেমন হচ্ছে ? সাহেবরা বসে থাকবে ঘোড়ার উপর, আপনি থাকবেন নিচে, সে যে অমর্যাদার কথা হবে।' আন ঘোড়া—রাইসুঁআ গ্রামের প্রধানের একটা বুড়ো, হেড়ো, রোগা ঘোড়া মাঠে চরছিল, ধরে আনা হল। একটা কম্বল চার ভাঁজ করে ঘোড়ার পিঠের উপরে খুব কায়দা করে পাতা হল। একটা শণের দড়ি দিয়ে কষে বাঁধা হল। শণের দড়ি ছেঁড়া ও গেরো পড়া লাগাম ঘোড়ার মুখে দেওয়া হল। মহারানী পুত্র উন্মুক্ত তরবারি কাঁধে ফেলে সওয়ার হলেন। কিরূপে তরবারি তুলে সাহেবদের সেলাম করতে হয় মর্যাদা জ্ঞানে সুনিপুণ বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী শিখিয়ে দিল।

হায় হায়। মহাপাত্রকে আটকিয়ে রাখতে পারলাম না। লোকটা ছিল বুদ্ধিমান এবং অত্যাচারী। তার উপর আমার বড় রাগ ছিল। ধরণী আমার হস্তগত থাকার জন্য তাকে সঙ্গে নেবার সুযোগ না পেয়ে মহাপাত্র একাকী বনের মধ্যে পালিয়ে গেল।

আমি জয়ন্তাগড়ের পথে দূরে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তখন পর্যন্ত ধরণী আমার সঙ্গের দুইশত অবধি পাইক বন্দী করে রেখেছিল। তাদের গড়ের অভিমুখে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলাম। একঘণ্টা পরের কথা। ধরণীকে পাঁচ ছয় জন বন্দুকধারী সিপাই ঘিরে ফেলেছে। হাতে তরবারি নেই, ঘোড়া নেই, সামনে পিছনে চারজন অশ্বারোহী মিলিটারী বেশধারী। পশ্চাদ্‌ভাগে শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য-শ্রেণী দূর হতে আসতে দেখলাম। রাইসুঁআ বনে উপস্থিত হয়ে সাহেবরা ধরণীর সমস্ত পাতার মাচা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। হাতী প্রস্তুত ছিল— বন্দীকে নিয়ে আমি ও সাহেবরা সৈন্যশ্রেণীর সঙ্গে গড়ে চলে এলাম। গড়ে উপস্থিত হওয়ার একঘণ্টা পরে বাসাঘর ঘাঁটির দিক হতে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। ভূঁইয়ারা ডাউসন সাহেবের পথ বন্ধ করে দেওয়াতে যুদ্ধ হল। কতকজন ভূঁইয়া মরল। একগাদা লোক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পালিয়ে গেল। ডাউসন সাহেবের সঙ্গে মহারাজা গড়ে এসে উপস্থিত হলেন।

ধৃত আসামীদের অপরাধ বিচারের জন্য গড়জাত এলাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টয়েনবি সাহেব কটক হতে স্টীমার যোগে চাঁদবালী হয়ে কলকাতা এবং সেই স্থান হতে রেলযোগে চক্রধরপুর এবং চক্রধরপুর হতে হাতীর পিঠে কেঁওঞ্ঝর গড়ে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে একটিমাত্র খানসামা।

ধরণীর সঙ্গে আর চারজন সর্দার ধৃত হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ হল।

প্রথম গবর্নমেণ্টের মিত্ররাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্যম।

দ্বিতীয় কেঁওঞ্ঝর রাজ্যের সর্বপ্রধান কর্মচারীকে অন্যায়পূর্বক অবরোধ।

সাহেবের সঙ্গে আমলা কেরানী কেউ আসে নি। আমি হলাম সাহেবের পেস্কার, আবার এদিকে কেঁওঞ্ঝর তরফ হতে অভিযোগকারী রাজ প্রতিনিধি। মকদ্দমার জবাব সওয়াল, বাদীদের জেরা করব, আবার লিখব।

কি কারণে কার জন্য বিদ্রোহ আরম্ভ হল, তার লিখিত জবাব দিতে সাহেব মহারাজাকে তলব করলেন। কাছারির সেরেস্তাদার খুব আগ্রহের সঙ্গে সেই জবাব লিখবার জন্য প্রার্থনা করে অনুমতি পেলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। কারণ সকাল হতে পেণ্টলুন চোগা চাপকান এঁটে সেই যে বাসা হতে বের হই, পোষাক ছাড়তে রাত দশটা এগারটা বারোটা বাজে। সকাল হতে দশটা অবধি হাকিম, পল্টন আগন্তুক লোকেদের রসদ সম্বন্ধে খোঁজ খবর

নেওয়া। সে সময়ে আগন্তুক লোকেদের উপস্থিতিতে কেঁওঞ্ঝর গড় লোকারণ্য হয়ে পড়েছিল। বিপদের সময় সাহায্য দিতে মিত্ররাজ্য ঢেঙ্কানাল, কমড়া, সিংভূম প্রভৃতি স্থান হতে হাতী, পাইক, অন্যান্য কর্মচারী প্রভৃতি এসেছিল। দিবা দশটা হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার সাহেবের কাছারিতে পেস্কারগিরি, সন্ধ্যা হতে রাত দশটা অবধি মহারাজার দরবারে ম্যানেজারি এর উপর অধিক কাজ করা বোঝার উপর শাকের আঁটি। বাজে কাজ যত কম হয় আনন্দের কথা।

পরদিন প্রাতঃকালে সেরেস্তাদারবাবু একগোছা লেখা কাগজ মহারাজার সম্মুখে রেখে দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে খুব গর্বের সঙ্গে হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, 'ম্যানেজারবাবু কাল রাত্রে আমি খাই নি এবং শুই নি সারারাত লিখেছি।' আমি দেখলাম তার কথা ঠিক সারারাত বসে না লিখলে ৬।৭ গোছা কাগজের চার পৃষ্ঠা ভরে লেখা সম্ভব নয়। মহারাজার আজ্ঞায় আমি সে লেখা পড়তে আরম্ভ করলাম। খুব ধৈর্য ধরে আধাআধি পড়ে গেলাম আর পারলাম না হা কপাল। এ আবার কি এখানে চাণক্য ভাগবত, রামায়ণ হতে ঢের ঢের ঋষি লোকের উদ্ধৃত বাক্য আছে। ভূগোল ইতিহাসের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আমি মহারাজার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'না না এটা হবে না। আমি একটা লিখে দিচ্ছি।' মহারাজ অস্থির ভাবে বললেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি একটা লিখে দাও।' আমি চেয়ে দেখলাম সেরেস্তাদারবাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ, ক্রোধে কাঁপছেন। আর সময় নেই। নটা বেজে গেছে। দশটার সময় রিপোর্ট নিয়ে আমাকে কাছারিতে হাজির হতে হবে। আমি সেই স্থানে বসে একটা রিপোর্ট লিখে দিলাম। ধরণীর বাতুলতা ও ভূঁইয়াদের স্বভাবের জন্য তারা অকারণে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে, এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়েছিল। মহারাজা রিপোর্ট শুনে তাতে দস্তখত্ করে দিলেন। লেখায় কিছু কাটছাঁট থাকলেও তা নকল করার সময় ছিল না। আবার রিপোর্টের লেখক মহারাজার ম্যানেজার। কাছারিতে পড়বে সাহেবের পেস্কার। সুতরাং নকল করার আবশ্যকতা ছিল না। এধারে সেরেস্তাদার স্বয়ং আমার অনিষ্ট সাধন বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে রইলেন।

কাছারিতে উপস্থিত হওয়া মাত্র রিপোর্ট তলব হল। হাকিমের হুকুম অনুসারে আমি রিপোর্ট পড়ামাত্র সাহেব ক্রোধে কম্পিত হতে লাগলেন। অত্যন্ত চিৎকার করে আমাকে বললেন, 'তুমি নিশ্চয় এ রিপোর্ট লিখেছ। এটা তোমার

চালাকি, আমি তোমাকে নিশ্চয় জেলে দেব।' করি কি, এরূপ অবস্থায় আমার রেগে যাওয়া কিম্বা কার্য ত্যাগ করে যাওয়া সাধ্যের বাইরে, চুপ করে সব সহ্য করলাম। (আমার মনে হয় টয়োনবি সাহেবের অভিপ্রায় উপস্থিত বিদ্রোহ হেতু মহারাজার অযোগ্যতা সাব্যস্ত হলে তাকে শাসন কার্য হতে সরিয়ে ফেলে তাঁর (সাহেবের) বন্ধু উআলি সাহেবকে কেঁওঞ্ঝর এলাকার ম্যানেজারের পদে বসিয়ে দেবেন। *

আমি মহারাজার নির্দোষিতা সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে যত্নবান হওয়ার দরুন সাহেবের আমার উপর রাগ। যা হোক ধরণী প্রভৃতি আসামীদের মামলা তদন্তের সময় সমস্ত সাক্ষী ভূঁইয়াদের অপরাধ হেতু বিদ্রোহ হয়েছে এইকথা প্রকাশ হয়ে গেল। সাহেব মহোদয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে আপাতত কোন উপায় দেখা গেল না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নিজগড় পরিত্যাগ করে আসামীদের সঙ্গে নিয়ে কটক অভিমুখে যাত্রা করলেন। আনন্দপুর মুকামে একদিনের জন্য থেকে ধরণী প্রভৃতি আসামীদের মামলার শেষ বিচার করে রায় দিলেন। পাঁচবছরের জন্য ধরণীর কঠিন সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল। আর অন্যান্য আসামীদের দুই তিন বছর হিসাবে কঠিন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

* বন্ধনী মধ্যস্থ অংশ মূল 'উৎকল সাহিত্যে' নেই। কেবল চিহ্ন সূচিত আত্মজীবনচরিত প্রথম সংস্করণ থেকে এই অংশ উদ্ধৃত। —প্রকাশক

বিদ্রোহের পর পরিস্থিতি

টয়েনবি সাহেব আমাকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রক মুকামে উপস্থিত হলেন। আমাদের আগমনের তৃতীয় দিবসে দার্জিলিং হতে লাট সাহেবের হুকুম এসে পৌছল। উআলি সাহেবও ময়ূরভঞ্জ হতে ভদ্রকে এসে উপস্থিত হলেন। উআলি সাহেবের সাক্ষাতে টয়েনবি সাহেব আমাকে হুকুম করলেন, 'আমাদের তরফ হতে মহারাজাকে চিঠি লেখ। পত্র পাওয়া মাত্র তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে চলে আসবেন। যদি না আসেন পুলিশ গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসবে।' আমি চিঠি লিখলাম টয়েনবি সাহেব তাতে দস্তখত করে দিলেন। আমার প্রতি হুকুম হল, 'উআলি সাহেব ময়ূরভঞ্জ ফিরে যাচ্ছেন, সেস্থান হতে কেঁওঞ্ঝর পৌছোতে বিলম্ব হবে। তাঁর আগমন পর্যন্ত সমস্ত রাজ্যের ভার আপনার হাতে রইল।' আমি সাহেবের আদেশ পালন করতে স্বীকৃত হলাম। মহারাজা শীঘ্র গড় হতে বেরিয়ে না এলে, পুলিশ গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসবে। এরূপ অপমানসূচক চিঠি আমার হাত দিয়ে লেখানোর জন্য মহারাজা আমার উপর অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি নন্দকিশোরবাবু প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোককে উক্ত চিঠি দেখালেন এবং সেই চিঠির বিষয় চীফ সেক্রেটারি কটন সাহেবকেও বলেছিলেন। মহারাজার অনুপস্থিতির সময় আমার রাজ্যের ভার নেওয়া মহারাজার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর হয়েছিল। আমি সাহেবের হুকুমে চিঠি লিখতে স্বীকৃত হবার সময় এসব কথা ভাবি নি। পরদিন টয়েনবি সাহেব কটক ও উআলি সাহেব বারিপদা চলে গেলেন। আমি কেঁওঞ্ঝর গড়ে চলে গেলাম।

এই সময়ে কেঁওঞ্ঝরে রথযাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। রথযাত্রা শেষ না হওয়া অবধি মহারাজা কেঁওঞ্ঝরে থাকতে পারবেন এরূপ আদেশ আমি টয়েনবি সাহেবের কাছ হতে সংগ্রহ করেছিলাম। রথযাত্রা উপস্থিত হল। ভূঁইয়া ভূঁইয়ানীরা এবং আরো সব গ্রামবাসী যাত্রা দেখতে উপস্থিত হল। ভূঁইয়া কিশোরীরা রথযাত্রার সময় বিছুটি গাছের ফল আঁচল ভরে নিয়ে আসে। যুবক ভূঁইয়াদের উপর সেই ফল ছুঁড়ে মারে। যুবকেরা বিছুটির জ্বালা হতে রক্ষা

পাবার জন্য দেহে তেল মেখে আসে। এটা হল তাদের মধ্যে খুব একটা আমোদের বিষয়।

রথযাত্রা সমাপ্ত হল, উল্টোরথও হয়ে গেল। মহারাজা বাহাদুর আমাকে সময় উপযোগী কতকগুলি বিষয় উপদেশ দিয়ে কটক যাত্রা করলেন। মহারাজার কটক যাত্রার প্রায় পনেরোদিন পরে উআলি সাহেব বারিপদা হতে এসে কেঁওঞ্ঝর গড়ে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁর কাছে গড়ের কাজকর্মের ধারা এবং খাজাঞ্চি খানার হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে আনন্দপুরে চলে গেলাম।

উৎকলের সর্বপ্রধান উকিলবাবু মধুসূদন দাস কেঁওঞ্ঝর মহারাজার তরফ হতে কলকাতায় গিয়ে লেফটন্যান্ট্ গবর্নরের দরবারে টয়েনবি সাহেবের দ্বারা আনীত বিদ্রোহ সম্পর্কে মহারাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করে মহারাজার নির্দোষিতা প্রমাণ করলেন। স্বয়ং লেফটন্যান্ট গবর্নর অকুস্থানে কেঁওঞ্ঝরে উপস্থিত হয়ে সমস্ত বিষয় তদন্ত করার আদেশ প্রচারিত হল, কিন্তু তিনি কেঁওঞ্ঝর না গিয়ে কটক মুকামে উপস্থিত হয়ে কেঁওঞ্ঝরের বিদ্রোহ সম্বন্ধে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করার পর মহারাজাকে নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবার জন্য অনুমতি দিলেন। সে সময়ের লেফটন্যান্ট গবর্নর ছিলেন Sir Charles Alfred Blliot K. C. S. I.

লেফটন্যান্ট গবর্নরের সঙ্গে ভদ্রক মুকামে সাক্ষাৎ করার জন্য কটক মুকাম হতে সুপরিন্টেণ্ডেন্ট-এর পত্র পেলাম। ভদ্রক ডাকবাঙ্গালায় আমি লেফটন্যান্ট গবর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাঁকে সেলাম করা মাত্র 'তুমি কখন এলে? ভাল আছ?' এইটুকু মাত্র বলে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে জেল দেখতে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পশ্চাতে চিফ্ সেক্রেটারি কটন সাহেব (Sir Henry Cotton) দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিই কেবল কেঁওঞ্ঝরের কথা, ভূঁইয়া জাতির কথা, আমাকে বন্দী করার কথা ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে পাঁচ ছয় মিনিট অবধি কথোপকথন করে আমাকে বিদায় দিলেন।

সাহেবরা ভদ্রকের কাজ সমাপ্ত করে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। উআলি সাহেব তাঁর জিনিসপত্র বয়ে নেবার জন্য কেঁওঞ্ঝর হতে উনিশটি হাতী সঙ্গে নিয়েছিলেন। সে সমস্ত আমার জিম্মা করে দিয়ে ময়ূরভঞ্জ চলে গেলেন।

ভদ্রক হতে আনন্দপুরে ফিরে আসছি। সে সময় নানারকম দুশ্চিন্তায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে উদয় হল, বর্তমান

উৎকলের যত সাহিত্যিক ও প্রধান লোক আছেন, তাঁদের নাম সাহিত্যে প্রকাশিত হওয়া উচিত। পরে মনে করলাম কেবল নামের মালা গেঁথে রাখলে লোকের পক্ষে সুখপাঠ্য হবে না। নামের সঙ্গে তাঁদের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করার জন্য আমার ইচ্ছা হল। হাতীর উপর বসে আছি। পকেট হতে পকেট বই ও পেনসিল বার করে পদ্য লিখতে আরম্ভ করলাম। আনন্দপুরে পৌছানোর সময় আধাআধি লেখা হয়ে গেছে। সেখানে হাতী হতে নামা মাত্র কম্পোজিটরকে ডেকে কম্পোজ করতে দিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার লিখতে আরম্ভ করলাম। এক এক খানা কাগজে লেখা হয়ে যাওয়া মাত্র অক্ষর যোজনা করবার জন্য কম্পোজিটর তা নিয়ে যাচ্ছিল। রাত নয়টা দশটা নাগাদ লেখা সমাপ্ত হল। মহারাজা বাহাদুরের আনন্দপুরে উপস্থিতি কিম্বা আমার আনন্দপুর পরিত্যাগের মাঝে মাত্র দুইদিনের ব্যবধান। এরই মধ্যে পুস্তক মুদ্রণ সমাপ্ত করতে হবে। কম্পোজিটর এটা জানে। আমিও তাদের পিছনে লেগে আছি। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা নাগাদ পুস্তক ছাপা সমাপ্ত হয়ে গেল। এই আমার উৎকল ভ্রমণের প্রথম সংস্করণ।

মহারাজার সঙ্গে আমার মনান্তর এবং আমার আনন্দপুর পরিত্যাগের কারণ এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করি। তিনি রাজ্যচ্যুত হওয়ার পরে আমি যে উআলি সাহেবের অধীনে থেকে কাজ করছিলাম এটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর হয়েছিল। আনন্দপুর বিভাগ দুইজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন— আমি ও একজন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার। এই অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার স্থানীয় অধিবাসী, পূর্বতন দেওয়ানের পুত্র। পূর্বতন দেওয়ান নন্দ ধল মহারাজার গদিনসীন হবার সময় বিদ্রোহী ভূঁইয়াদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। এই কারণেই ধল বংশের প্রতি মহারাজার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। বর্তমান অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার মহারাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। আমরা দুইজন কর্মচারী বর্তমান ম্যানেজার উআলি সাহেবের অধীনে থেকে আনন্দপুরে কাজ করছিলাম। উআলি সাহেবের আগমনের দুইমাস পরে তিনি নানা কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারকে পদচ্যুত করায় মহারাজ আমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করতে শুরু করলেন। এই পদচ্যুতিতে আমার কোন রকম গোপন হাত আছে মনে করে তাঁর এরকম ভ্রান্ত ধারণা হল। মহারাজা কটকে অবস্থান কালে এই পদচ্যুতির সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আমি যে এই

পদচ্যুতির মূল কারণ, আমার পরমশত্রু সেরেস্তাদার তা মহারাজকে বুঝিয়ে দিলেন। আমার প্রতি মহারাজার পূর্বস্নেহ শিথিল হয়ে গেল। গুরুতর রাজকার্য উপস্থিত হলে তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কিন্তু বর্তমানে 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।' বিপৎপাতের সময় মিত্র শত্রু শত্রু মিত্র বলে প্রতীয়মান হয়। এই সময় আমার পুনঃ, পুনঃ জ্বর হতে লাগল। আমার একটি অতিসুন্দর প্রিয় কুকুর মরে গেল। আমার শিশুপুত্র এবং স্ত্রী বালেশ্বরে জ্ঞাতি শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করছিল। আমি ধৃত হয়ে বন্দী অবস্থাতে ভূইয়াদের মধ্যে অবস্থান করার সময় আমাকে ভূইয়ারা মেরে ফেলেছে এই মিথ্যা সংবাদ বালেশ্বরে এবং উৎকলের সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। আমার কাল্পনিক মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে আমার পত্নী পানাহার পরিত্যাগ করেছিলেন।

মহারাজার সঙ্গে মনান্তরের তৃতীয় কারণ—এই সময় আনন্দপুর থেকে অনেক প্রজা ডাক যোগে মহারাজার বিপক্ষে অনেকগুলি আবেদন পত্র লেফটন্যাণ্ট গবর্নর এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে পাঠাতে লাগল। সেই আবেদন পত্রের সঙ্গে আমার গোপন সম্পর্ক আছে এমন কথা মহারাজা বিশ্বাস করতেন। আমি এখন ভাল ভাবেই বুঝতে পারলাম, আনন্দপুরে আর চাকরি থাকার আশা নেই। মহারাজা পদচ্যুত না করলেও আমার থাকা মঙ্গলজনক অথবা নিরাপদ নয়। সুতরাং মহারাজা আনন্দপুরে উপস্থিত হবামাত্র চাকরি হতে ইস্তফা দিয়ে বালেশ্বর চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। পরে আমার কাজে মহারাজা অন্য আর একজনকে নিযুক্ত করে কটক হতে নিয়ে আসার কথা শুনতে পেলাম।

লেফটন্যাণ্ট গবর্নর রায় নন্দকিশোর দাস বাহাদুরকে কেঁওঞ্ঝরের পলিটিক্যাল এজেণ্টের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। মহারাজা বাহাদুর, মধুসূদন দাস ও পলিটিক্যাল এজেণ্টের সঙ্গে কটক হতে এসে আনন্দপুর মুকামে উপস্থিত হলেন। মহারাজার আগমনের পরের দিন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পলিটিক্যাল এজেণ্টের সামনে অফিস এবং খাজাঞ্চিখানার তহবিল অন্যলোকের হাতে ভারার্পণ করে দিয়ে আনন্দপুর হতে অর্ধরাত্রির সময় বেরিয়ে এলাম।[১]

---

১ In May 1891 there took place an insurrection of the Bhuiyans of Keonjhar against their Maharaja, resulting in his flight to Cuttack and final restoration accompanied by Rai Nanda Kishore Das Bahadur as Government Agent. The oppressions and exactions of the Maharaja were the immediate cause of the disturbances, which were promptly suppressed by the local

আনন্দপুর বিভাগে সর্বশ্রেণীর লোক আমাকে অত্যন্ত ভালবাসত। মহারাজার ভয়ে আমাকে বিদায় দিতে আমার কাছে কেউ এল না। কেবল দূরবর্তী গ্রামগুলি থেকে দলে দলে লোক এসে পথের ধারের বনের মধ্যে সেই অন্ধকার নিশীথ সময়ে আমার অপেক্ষায় লুকিয়ে বসেছিল। আমার হাতী উপস্থিত হওয়া মাত্র বনের দুধারের লোকেরা বন হতে বেরিয়ে এসে আমাকে নমস্কার করল, কোন কথাই তারা বলল না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়েছিল। সে সময়ের ঘটনাটি আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে আছে। তাদের প্রীতি ও সহানুভূতি জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি ভুলতে পারব না। দশপল্লা হতে আসবার সময়ও অনেক লোক রাত্রির অন্ধকারে বনের মধ্যে আমার পিছু পিছু অনেকদূর অনুগমন করেছিল। আনন্দপুর এলাকায় দরিদ্র বিধবাদের উপর চুল্লীকর নামে একটি বিরক্তিকর কর স্থাপিত হয়েছিল। অনেক অনুযোগ অভিযোগ করে আমি সেই কর রহিত করে দিয়েছিলাম। এই কারণে তারা আমাকে পিতার ন্যায় সম্মান করত, সময় সময় দলবদ্ধ হয়ে এসে আমাকে প্রণাম করে যেত। শেষরাত্রে কেঁওঞ্ঝরের শেষ সীমা সংলগ্ন বসন্তিয়া মৌজায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে মহারাজার হাতী ফিরে গেল। সেই অবধি পৌঁছিয়ে দেবার জন্য মহারাজার আদেশ ছিল। বসন্তিয়া মৌজার সরবরাকর গৌরী মইকাফ আমার জন্য পালকীর বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। এটা মইকাফবাবুর পক্ষে বড় সাহসের কাজ হয়েছিল। কেঁওঞ্ঝর এলাকায় তাঁর সরবরাকারি এবং আবকারি পাট্টা থাকার জন্য তাঁর অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সদাশয় মহারাজা তাঁর কিছুমাত্র অনিষ্ট করলেন না।

আনন্দপুর পরিত্যাগের সময় কেবল দুটি বিষয় আমার মনে কষ্টের কারণ হয়েছিল। বৈতরণী নদী হতে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে গ্রীষ্মের সময় অত্যন্ত জলকষ্ট হত। শীতকালে আমি মফঃস্বল সফরে গিয়ে প্রজাদের দ্বারা অনেক দিনের বুজে যাওয়া পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার করানো আরম্ভ করেছিলাম। ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাবার ইচ্ছা ছিল। সে বাসনা সফল হল না। দ্বিতীয়তঃ

officers with the aid of the Government Police. A detachment of troops from Calcutta was also ordered under arms, but it was only held in reserve and not called into action. (C. E. Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors* P. 911)

আনন্দপুর শহরের মধ্যে একটি পাকা স্কুল গৃহ নির্মাণ করাবার ইচ্ছা ছিল। অনেকগুলি টাকাও সংগ্রহ করা হয়েছিল তা অসম্পন্ন অবস্থায় রয়ে গেল।

আমি আনন্দপুরে থাকার সময়ে আমার জেঠতুত ভাই নিত্যানন্দ সেনাপতি সস্ত্রীক তীর্থদর্শন করতে গিয়ে অযোধ্যার স্বর্গদ্বারে দেহরক্ষা করলেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী ঘরে ফিরে এলেন। এক অন্নে না থেকে পৃথক ভাবে থাকার তাঁর বিশেষ ইচ্ছা হল। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার সম্প্রতি তিনটি স্বতন্ত্র পরিবারে বিভক্ত হল। আমার জেঠতুত ভাই রাধামোহন সেনাপতি এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র লালমোহন সেনাপতি পৃথক হয়ে গেলেন। আমাদের সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেল। আমাদের বাসগৃহ তিন সমান ভাগে বিভক্ত হল।

ডোমপাড়ায় দ্বিতীয়বার দেওয়ানী

১৮৯৪ সনের প্রথমার্ধে ডোমপাড়ার রাজাসাহেব ব্রজেন্দ্রকুমার মানসিংহ ভ্রমরবর রায়ের কাছ হতে টেলিগ্রাফ পেয়ে ষ্টিমার যোগে চাঁদবালি হয়ে কটক চলে গেলাম। রাজাসাহেব তাঁর রাজ্যে জমিদারিতে ১২০ টাকা বেতনে আমাকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। কিন্তু গদিনসীন হওয়ার দিন হতে লেখাপড়ার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কেবল ডাক্তারি চর্চা করছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত সরল, চরিত্র নির্মল কিন্তু তাঁর কোনো স্বাধীন মত ছিল না। সর্বদা তিনি পরের কথায় চলতেন। তিনি এত অলস ছিলেন যে রাজ্যের কোনো তত্ত্ব নিতেন না। নিজ গড়ে থাকায় অনিচ্ছুক, সর্বদা তিনি কটকে থাকতে সুখ পেতেন। সেজন্যে বহু অর্থ ব্যয় হত। তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেব নিতান্ত দায়ে পড়ে প্রায় ৬০ হাজার টাকা ঋণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় অধিকাংশ ঋণ পরিশোধ করে গিয়েছিলেন, অল্পমাত্র অবশিষ্ট ছিল। আমি সম্প্রতি ডোমপাড়া গিয়েছিলাম, দেখলাম বর্তমান রাজাসাহেবের সহযোগে পৈতৃক সংকীর্ণ ঋণ স্ফীত হয়ে পঁচিশ হাজার টাকায় পৌঁছেছে।

আমার ডোমপাড়া আগমনের কয়েকমাস পরে রাজাসাহেবের বিধবা মাতা পরলোক গমন করলেন। রাজাসাহেব খুব আড়ম্বরের সঙ্গে বিধবা মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। মাতৃবিয়োগের অল্পদিন পরে রানীসাহেবাও পরলোক প্রাপ্ত হলেন। রাজমাতার বিয়োগের কয়েক মাস পরে তাঁর জননী, অর্থাৎ রাজাসাহেবের মাতামহী টিক্‌কালী[১] অধীশ্বরী পাটমহাদেঈর[২] পরলোক গমন সংবাদ ডোমপাড়ায় পৌঁছাল। রাধিকা পাটমহাদেঈ তাঁর অন্য দুই কন্যার সঙ্গে পুরীধামে এসে সেইখানে দেহরক্ষা করেছিলেন। স্বর্গগতা রাধিকা পাটমহাদেঈর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপলক্ষে ডোমপাড়ার পক্ষ হতে আমি টিক্‌কালী গিয়ে সে স্থানে প্রায় ছয়মাস কাল অবস্থান করেছিলাম। সেই ছয়মাস কাল আমার হাতে অন্য কোন কাজ ছিল না। আমি একজন শিক্ষক নিযুক্ত করে তৈলঙ্গী ভাষা শিক্ষা করেছিলাম।

---

১ গঞ্জামের একটি জমিদারী রাজ্য।

২ পট্ট মহাদেবী। প্রধান রানী।

রানীসাহেবার মৃত্যুর সময় আমি হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে একটি প্রত্যক্ষ অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি। রানীসাহেবা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। উপযুক্ত সময়ে গর্ভবেদনা উপস্থিত হল। এই গর্ভ হতে পুত্র অথবা কন্যা জাত হবে তা পূর্ব হতে জানতে পারা এবং সন্তান জাত হলে তার কোষ্ঠী প্রস্তুত করার জন্য খোরদা অঞ্চল হতে একজন জ্যোতিষীকে ডাকালাম। জ্যোতিষী উক্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলে ডোমপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী গড়জাতে খ্যাতি ছিল। জ্যোতিষী উপস্থিত হলে, রানীসাহেবার এই গর্ভে পুত্র কি কন্যা হবে এ বিষয়ে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম। জ্যোতিষী আমার সামনে বসে রানীসাহেবার কোষ্ঠী নিয়ে অনেক সময় পর্যন্ত ভূমিতে অঙ্কপাত করে গণনা করতে লাগলেন। আমি সম্মুখে বসে দেখছি—তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। গণনা সমাপ্ত করে খড়ির খণ্ড মেঝেতে রেখে দিয়ে জ্যোতিষী বিরস বদনে আমার পানে চেয়ে রইলেন, ‘আহা! রানী যে মারা যাবেন।’ আমি বললাম, ‘রানীর কোন প্রকার বেদনা নেই—স্বাভাবিক গর্ভবেদনা মাত্র।’ জ্যোতিষী বললেন, ‘হলে কি হবে? আটটি গ্রহ মারক রূপে উপস্থিত। আর একটি বাকী গ্রহ কি তাঁকে রক্ষা করতে পারবে?’ জ্যোতিষী বিদায় নিয়ে বাসায় চলে গেলেন। রাত্রি নয়টা কি দশটার সময় আমি আবার জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সংবাদ কি?’ তিনি বললেন, ‘আজ শেষ রাত্রি অবধি মারক গ্রহের প্রাধান্য আছে। রাত পেরিয়ে গেলে রানী রক্ষা পাবেন, কিন্তু রাত পোয়াবে না।’ সেদিন আর একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটতে দেখলাম। প্রাতঃকাল হতে একটি শৃগাল বন হতে বাহির হয়ে এসে রাজ অন্তঃপুরের সিংহদ্বারের উপর উঠে গিয়ে মুখ উপরে করে চিৎকার করতে লাগল। সিংহদ্বার হতে তাড়িয়ে দিলে আম্রকুঞ্জে গিয়ে সেইরকম চেঁচায়। সেখান হতে তাড়িয়ে দিলে সিংহদ্বারে আসে। ‘উৎপাত-সাগর’ নামক পুস্তকে এটা একটি ভয়ংকর অমঙ্গলের সূচনা বলে উল্লেখ আছে। শেষরাত্রে বন্য কুক্কুট ডাকতে সুরু করেছে। সেই সময় একটি ভয়ংকর ক্রন্দনের রোল শুনে আমি রাজ অন্তঃপুরের দিকে ছুটে গেলাম। আঁতুড় ঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতর পানে চেয়ে দেখলাম গম্ভীরার[১] ভিতরটা রক্তময়। রানীর শেষ দশা উপস্থিত। সদ্য প্রসূতা কন্যাটি জীবিতা ছিল। দশ পনেরোদিন পরে

১ অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ যার মেঝে অপেক্ষাকৃত নিচু।

সে তার মাতার অনুগামিনী হল। ধাত্রী তার নাভিচ্ছেদন করতে ঠিক পারে নি। নাভিকুলে ঘা হওয়াতে মৃত্যু ঘটল।

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েকমাস পরে আমার জীবনে একটি শোকাবহ ঘটনা' ঘটল। জ্যোতিষীগণ গণনা করে বলেছিলেন যে আমার সহধর্মিণী কৃষ্ণকুমারী দেবীর কোষ্ঠীতে নিধনাধিপতি বলবান এবং কেন্দ্রস্থ হয়ে অবস্থান করার জন্য তাঁর পরমায়ু ৩৪ বছর মাত্র। প্রকৃতই তাঁর ৩৪ বছর বয়সের আরম্ভে অজীর্ণ রোগ শুরু হল। কোন রকম ঔষধ সাহায্যে উপশম হল না। অবশেষে তিনি শয্যাগত হলেন। যতই লঘু আহার করুন পরিপাক হত না। ১৮৯৪ শকাব্দ ১৮১৬ ভাদ্র শুক্লদশমী অপরাহ্ন চারটার সময় তাঁর সমস্ত শেষ হয়ে গেল।

আমার শৈশবাবস্থায় মাতাপিতা গত হয়েছিলেন। আমার জীবন রক্ষাকারিণী ঠাকুরমা অবধি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। জ্ঞাতি কুটুমদের আমার প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। আমার দ্বিতীয় বিবাহের সময় আমার বয়স উনত্রিশ এবং কৃষ্ণকুমারীর বয়স ছিল বার বৎসর মাত্র। সেই অল্পবয়স হতে তিনি মন প্রাণ দিয়ে আমার মঙ্গল কামনা এবং মঙ্গল সাধন করে আসছিলেন। তাঁর পুণ্য স্মৃতি আমি অদ্যাবধি হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছি। আমার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে আজ চব্বিশ বছর। এখন দেখেছি আমার হৃদয় শূন্যময়। আমার মনোবেদনা জানাবার মতো জগতে আর কেউ রইল না। আমার হৃদয়ে কখনও দারুণ কষ্ট জাত হলে, উদ্যানস্থ তাঁর সমাধির নিকট বসে আমি সান্ত্বনা লাভ করি।

আমি যে কবিতা লিখতে শিখেছি তার অন্যতম কারণ আমার পত্নী। তিনি আমার কবিতা শুনতে বড় ভালবাসতেন। প্রথমে তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য কবিতা লিখতাম। তাঁর মৃত্যুর পরে আমার মনের ব্যাকুলতা নিবারণের জন্য আমি কবিতা লিখি। আমার অধিকাংশ কবিতা দারুণ পীড়া, বিপদ ও মনের অস্থিরতার সময়ে লেখা। প্রতিদিন স্নানান্তে কৃষ্ণকুমারী আমার ছাপানো মহাভারতের আদিপর্ব ও রামায়ণের কতক অংশ পাঠ করতেন।

আমার স্ত্রীর মৃত্যুর সময়ে আমার পুত্রের বয়স তের বছর ও কন্যাটির বয়ক্রম এগার বৎসর ছিল। বালেশ্বরে সহানুভূতিশূন্য জ্ঞাতিদের মধ্যে তাদের রেখে যেতে আমার সাহস হল না। আমার কর্মস্থান ডোমপাড়ায় তাদের নিয়ে গেলে তাদের শিক্ষার অসুবিধা হবে, সেই কারণে আমি তাদের কটকে রাখতে

বনস্থ করলাম, তাদের সঙ্গে নিয়ে চাঁদবালি স্টীমারযোগে কটক চলে গেলাম। আমার পরম বন্ধু মধুসূদন রাও[১] সন্তান দুটিকে নিজের বাড়িতে রাখতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সে সময় মধুবাবু কটক নর্মাল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। সেই স্কুলেই তাঁর বাসা। মেসের সমস্ত প্রকার খরচ বাবদ মাসিক ৩৫ টাকা হিসাবে তিন মাসের খরচের জন্য ১০০ টাকা মধুবাবুর হাতে দিয়ে আমি ডোমপাড়া চলে গেলাম। সন্তানেরা এক বছর অবধি মধুবাবুর বাড়িতে ছিল। পরে একটা স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করে তাদের সেখানে রাখলাম।

ডোমপাড়ার রানীসাহেবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া'র অল্পদিন পরে রাজাসাহেবের দ্বিতীয় মাঙ্গলিক ক্রিয়ার প্রস্তাব নিয়ে নানা স্থান হতে প্রতিনিধি আসতে লাগল। স্বর্গগতা রানী পারিকুদ রাজার কন্যা ছিলেন। তাঁর একটি অনূঢ়া কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। সেই কন্যার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে রাজাসাহেবের নামে এবং আমার নামে পারিকুদ রাজার পত্র নিয়ে প্রতিনিধি এসে উপস্থিত হল। অল্পদিন পরে খল্লিকোট রাজার প্রতিনিধিও উপস্থিত হলেন। খল্লিকোট রাজার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা ছিল। ডোমপাড়া রাজার আত্মীয়দের অর্থাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রদের এখানে বিবাহের সম্বন্ধ করবার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, কারণ জাত্যাংশে, কুলমর্যাদায় খল্লিকোটকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। 'বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি।' আমি খল্লিকোট গিয়ে সম্বন্ধ একপ্রকার স্থির করে এলাম। আমি তখন কটকের বাসায় ছিলাম। একদিন সকাল বেলা কণিকার ম্যানেজার ভূতপূর্ব রাজাসাহেব নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভঞ্জদেওকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হলেন। এই ঘটনার দুইদিন পরে কণিকার ম্যানেজারবাবু আমাকে কটকস্থ কণিকা রাজবাটীতে ডেকে নিয়ে গেলেন। কণিকার পূজনীয়া বৃদ্ধারানী আমাকে বললেন, তাঁর কন্যার সঙ্গে ডোমপাড়া রাজার সম্বন্ধ করিয়ে দিলে তিনি আমাকে খুশি করে দেবেন। আমি বললাম, 'এই কাজটি করাতে পারলে আমি খুশি হব।' অন্য সময়ে ম্যানেজারবাবু আমাকে বললেন রাজার পঁচিশ হাজার টাকা দেনা আছে, কণিকার সঙ্গে সম্বন্ধ হলে, বৃদ্ধা রানীসাহেবা সমস্ত দেনা পরিশোধ করে দেবেন। কণিকা পক্ষের কথা রাজাসাহেবকে জানিয়ে উত্তর পেলাম, 'আপনি যা বন্দোবস্ত করবেন আমার তাতে আপত্তি নেই।'

১ রায় মধুসূদন রাও বাহাদুর। বিখ্যাত ওড়িয়া কবি। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা। পূর্বপুরুষ মহারাষ্ট্রীয় বলে রাও পদবী।

কণিকা সম্বন্ধ-সমাচার শুনে ডোমপাড়া রাজার স্বজাতীয় লোকেরা ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তারা সংবাদ পেয়েছিল যে কণিকা কন্যা রাজবংশ জাত নন—পুরী জেলাস্থিত কোন অখ্যাতনামা খণ্ডায়েৎ বংশজা এবং মাননীয়া কণিকা রানীর দ্বারা প্রতিপালিতা। ডোমপাড়া রাজা ক্ষত্রিয়, খণ্ডায়েতের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বিবাহের দ্বারা তাঁরা ডোমপাড়া রাজার জাতিপাত আশংকা করেন। আমি সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে কণিকার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করলাম।

বিবাহের পূর্বদিন সকালে রাজাসাহেব ডোমপাড়া গড়ে নান্দিমুখী [১] শেষ করে ভোগীপুর বাগানে রইলেন। বিবাহের দিন বিকেল বেলায় কটক হতে দুই ক্রোশ দূরে গোড়িসাহিতে যেই পৌঁছালেন ঝড়ের সঙ্গে বর্ষা আরম্ভ হল। কাঠজুড়ির বালিতে পৌঁছোনর সময় প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হল। বাজনা, রোশনাই সমস্ত তছনছ হয়ে গেল। রাজা যে চতুর্দোলায় বসেছিলেন ঝড়ে সে চতুর্দোলা পথে পড়ে গেল। রাজাসাহেব একটি সামান্য পাল্কীতে চড়ে এলেন। কাঠজুড়ির উত্তরকূলে পৌঁছানো মাত্র ঝড় বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল রাজাবর কোনোরকমে কণিকার রাজঅন্তঃপুরে এসে পৌঁছালেন। মঙ্গলকৃত্য আরম্ভ হল। বিবাহকার্য সমাপ্ত হবার পরে, কণিকার ম্যানেজার রাজার সমস্ত দেনা পরিশোধ করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি ডোমপাডা চলে আসবার পরে, ডোমপাড়ার কর্মচারীদের কাছ হতে শুনেছিলাম যে, ম্যানেজারবাবু তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নি। এবং মহাজনদের অতি সামান্য টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

এই সময় আমার দক্ষিণ বাহুমূলে একটা ফোঁড়া বেরুল। একজন আনাড়ি ডাক্তার অপারেশন করলেন। ক্ষতর প্রকোপে জ্বর হল। আমি শয্যাগত হলাম। অপারেশনের ক্ষত ক্রমশঃ মারাত্মক রূপ ধারণ করল। ক্ষতের মুখটি ছোট কিন্তু নালী ঘা বাহুর মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে কনুয়ের পাশ পর্যন্ত পৌঁছাল। আয়ুর্বেদী, হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি সর্বপ্রকার চিকিৎসা ব্যর্থ হল। ডাক্তারসাহেব আমাকে পরিত্যাগ করে যাবার পরদিন ডোমপাড়ার রাজার এক আত্মীয় এসে আমার নিকটে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরামর্শে পদ্মাপলাশ পাতায় একটু ঘি মাখিয়ে ঘায়ের উপর বেঁধে দিলাম। এইভাবে ছয়দিন পাতার প্রলেপ দেবার পরে দেখলাম ঘা সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে। আমি একটি বিষম বিপদ হতে রক্ষা পেলাম।

১ বিবাহের পূর্বে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা হয়।

আমার ব্যাধির সময় কণিকার ম্যানেজারের পরামর্শ অনুসারে এবং কণিকা কন্যা ডোমপাড়ার রানীসাহেবার অনুরোধে ডোমপাড়ার রাজা আমাকে পদচ্যুত করলেন। আমি পূর্বেই বলেছি, রাজাসাহেব অত্যন্ত দুর্বলমনা। লোকে যখন তাঁকে বোঝালে যে আমার দোষের জন্য তাঁর সমস্ত দেনা হয়েছে তিনি আমাকে পদচ্যুত করলেন। দোষ কিন্তু আমার নয়। দোষ রাজার। রাজাসাহেবের কণিকা মঙ্গল কৃত্য হবার পূর্বে তিন বছরের মধ্যে নিত্য খরচ ছাড়া নৈমিত্তিক খরচ হয়েছিল—

রাজমাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে	৯৫০০
রানীসাহেবার ক্রিয়ায়	৩৫০০
রাজার প্রাসাদ তৈরিতে	৫০০০
বন্দোবস্ত খরচ বাবদ	৩০০০
রাজমাতামহীর রাধিকা পাটমহাদেবীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়	৫০০
	২১৫০০ টাকা

এই একুশ হাজার পাঁচশ টাকা খরচ করার জন্য একটি টাকাও ধার হয় নি। যাই হোক আমি যে সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে কণিকা কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করেছিলাম, আমি তার উপযুক্ত পুরস্কার পেলাম, আমাকে নিজের কর্মফল ভোগ করতে হল।

পূর্ব রাজার আমলে আমি ডোমপাড়ার যে সমস্ত বন্দোবস্ত করেছিলাম সেই বন্দোবস্তের সময় হতে অদ্যাবধি কয়েক বছর গত হয়ে থাকার জন্যে অনেকগুলি পতিত জমি আবাদ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই হাল আবাদী জমির জন্য রাজসরকারের কিছুমাত্র আয় হয় নি। আমি সে সমস্ত জমির জরীপ ও বন্দোবস্ত করবার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলাম। আমার এই দ্বিতীয় বন্দোবস্ত দ্বারা ডোমপাড়া ভূমিকর বার্ষিক তিন হাজার টাকা অবধি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ডোমপাড়ার বিদেশীয় ভদ্র অভ্যাগত উপস্থিত হলে, তাঁদের বাসের জন্য উপযুক্ত বাড়ি কিম্বা ব্যবহারের জন্য নিকটে জলের সুব্যবস্থা ছিল না। এই অভাব দূরীকরণের জন্য একটি বাঙলো এবং একটি পাথরের কূপ রাজবাটীর সিংহদ্বারের সম্মুখে নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলাম। লোকে অদ্যাবধি এই বাঙলোকে ফকীর মোহন বাঙলো বলেন। রাজ অন্তঃপুরে পুরোনো ঘর সব ভেঙে এক প্রস্থ নতুন

পাকা ঘর ও একটা বাঙলো নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলাম। নিজগড় গ্রামের মধ্যে কূপ বা পুষ্করিণী না থাকাতে গ্রীষ্মকালে লোকে রণ নদীর জল আনতে যেত। দূর পথে জল আনতে যেতে তাদের কষ্ট হত। আমার পরলোকগতা স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার জন্য শাসনের[১] মাথায় একটি কূপ খুঁড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই কূপের উপরের পাথর খানিতে লেখা আছে 'শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারী দেবী, বালেশ্বর।' এই কূপটি নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করিয়ে ছিলাম। নিজগড় হতে উত্তর দিকে পাথপুরের নিকটবর্তী বাঁকি সড়ক অবধি কোনো রাস্তা ছিল না। লোকে পাথপুর হতে কুশ-পঙ্গী গ্রাম পর্যন্ত নিবিড় কাঁটা বাঁশের বনের মধ্য দিয়ে এবং সেখান হতে নিজগড় অবধি পাটের খেতের খাদের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা করত। আষাঢ় হতে প্রায় কার্তিক পর্যন্ত মহানদীর বন্যার জলে খেত ডুবে গিয়ে পথচলা লোকেদের পক্ষে যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়ত। ডোমপাড়ার পূর্বাঞ্চলবাসিগণ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে পাহাড়ের উপর চড়ে পাথপুর অবধি যাওয়া আসা করত। স্বয়ং রাজাসাহেব কিম্বা প্রধান কর্মচারীরা হাতীর পিঠে যাওয়া আসা করত সত্য কিন্তু নাবাল জমিতে জল সময় সময় হাতীর হাওদা অবধি স্পর্শ করত। পথিকদের সুবিধার জন্য আমি নিজগড় হতে পাথপুর পর্যন্ত একটি পথ তৈরি করাতে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হল না। ডোমপাড়ার একটি স্কুল নির্মাণ আরম্ভ করিয়ে ছিলাম। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আমার রাজ্য পরিত্যাগের সময় স্কুল ঘরের দেওয়াল মাত্র নির্মাণ হয়েছিল।

আমার ব্যাধির সময় যখন আমি ডোমপাড়ার রাজার কাছ হতে পদচ্যুতির পত্র পেলাম, সেই সময় পাল্কীতে চড়ে অতি কষ্টে ডোমপাড়ার রাজার নিকটে গেলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। কণিকার প্রাসাদে গেলাম। যুবক রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভঞ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি পূর্ববৎ করমর্দন করে পাশে বসালেন।

পূর্ববৎ প্রীতি সম্ভাষণ, সহাস্য আলাপ। রাজকুমারের সে সময়ের মোহিনী মূর্তিটি আমার হৃদয়ে এ পর্যন্ত অঙ্কিত হয়ে আছে। বেচারা নাবালক, কিছুমাত্র ক্ষমতা হাতে আসে নি। আমি উপস্থিত ঘটনা সম্পর্কে কোন কথা না বলে, বিদায় নিয়ে বাসায় এলাম। সেই হল তাঁর কাছ হতে চির বিদায়। এই ঘটনার পঞ্চম কি ষষ্ঠ দিন প্রাতঃকালে প্রায় ৯টার

১ ব্রাহ্মণ শাসন। ব্রাহ্মণদের বসতি।

সময় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ছিলাম। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চিৎকার করে বললাম, 'হায়! হায়! কণিকা রাজা মারা গেলেন?' আমার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যা পাশে বসেছিল। সে আমাকে ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করল—'বাবা, বাবা, কোন রাজা মারা গেল?' আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে বললাম, 'না না, এটা আমার প্রলাপ।' উপস্থিত ঘটনার দুই ঘণ্টা পরে কণিকা রাজার পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ শুনলাম। হিসাব করে দেখলাম, আমার প্রলাপের সময়ই কণিকা রাজার প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছিল।

আমি আরোগ্য লাভ করলাম, কিন্তু অর্থাভাব উপস্থিত হল। ডোমপাড়ার রাজাসাহেব একদিন আমাকে তাঁর বক্সী বাজার বাঙলায় ডাকিয়ে মাসিক একশ টাকা সাহায্য দেবার জন্য প্রস্তাব করলেন। কিন্তু কোন কিছু কার্য না করে এত টাকা নিতে আমি অস্বীকার করাতে আমাকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কটকের এজেন্ট স্বরূপ নিযুক্ত করলেন। রাজাসাহেবের গাড়ি ঘোড়া আমার কটকের বাড়িতে থাকত এবং আমি সে সবের তত্ত্বাবধান করতাম। আমার আর একটি কাজ—প্রতিদিন সকালে রাজার নিকটে গিয়ে গল্প করা। কয়েকমাস পরে আমি এই কার্য ত্যাগ করেছিলাম।

আমার ডোমপাড়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হবার পরে শুনলাম, রাজাসাহেবের দেনা বাড়তে বাড়তে সত্তর হাজার টাকায় পৌঁছেছে। কণিকার সঙ্গে কিম্বা কণিকার রাজবাড়ির সঙ্গে তাঁর আর সম্পর্ক ছিল না। তিনি কণিকা নাম শুনলে বিরক্ত হতেন। দেনার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। মহাজনেরা নালিশ করতে প্রস্তুত হল। কটকের প্রসিদ্ধ উকিল মধুসূদন দাস রাজাকে মহাজনের জুলুম হতে রক্ষা করবার জন্য কেঁওঞ্ঝর মহারাজার নিকট হতে অল্প সুদে টাকা আনিয়ে সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়ে দিলেন।

দেনার যন্ত্রণা হতে মুক্ত। কিন্তু এখন রাজার একটি মানসিক বিকার উপস্থিত হল। সর্বদা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পালঙ্কে পড়ে থাকতেন। শেষে রাজ অন্তঃপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নানা স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর সেই সুগঠিত সুন্দর শরীর আস্তে আস্তে শুষ্ক হয়ে পড়ল। নানা স্থানে ভ্রমণ করে অবশেষে কলকাতায় গেলেন। সেই মহানগরীতে পতিতপাবন জাহ্নবীকূলে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল।

কটকে অবস্থান

বহুদিন হতে আমার কটকে বাস করার অভিলাষ ছিল। একটা বাড়ি বানাবার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। দৈবাৎ পেয়ে গেলাম, বক্সী বাজারের নিকট একটি বাঙলা বাড়ি কিনে ফেললাম। পরে দেখলাম আমার ন্যায় সামান্য আয় বিশিষ্ট লোকের পক্ষে সেরূপ বাড়িতে বাস করে চালানো মুশ্‌কিল। বৃহৎ বাঙলা বাড়ির মধ্যে অনেকগুলি ঘর। চতুর্দিকে উদ্যান পুষ্করিণীর সঙ্গে পাকা প্রাচীর বেষ্টিত বৃহৎ জমি জায়গা সন্নিবেশিত সাহেবদের থাকার উপযোগী বাড়ি।

অসুবিধার মধ্যে দেশীয় ভদ্র প্রতিবেশীর অভাব। স্কুল, কাছারি পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের ঘর অনেক দূরে। সম্প্রতি বাড়িটা কিনে একটু গোলমালে পড়ে গেলাম। আমি তো থাকব বিদেশে, বাড়ি ভাড়া দেব, কিন্তু মেরামত ইত্যাদি করছে কে? বাড়ির অর্ধাংশ বিক্রয় করে দিয়ে একজন প্রতিবেশী জোটালাম। বাড়ি থেকে মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়া উঠছিল। কুড়ি বাইশ বছর অবধি বাড়িটাকে হাতে রেখেছিলাম। পরে আমার টাকার অভাব হওয়াতে মধুসূদন দাস মহোদয়কে আমার স্বত্বের অর্ধাংশ বিক্রয় করে দিলাম।

স্কুল কাছারির কাছে ঘর প্রস্তুত করাবার জন্য জায়গা খুঁজছিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় বাখরবাদ ধুঁয়া পতরিয়া সাহীতে একটি জায়গা দেখতে পেলাম। পনেরো ষোল গুণ্ঠ[১] পাকা প্রাচীর বেষ্টিত একখানা জায়গা পড়ে আছে। শুনলাম উৎকলের প্রসিদ্ধ জমিদার ভগবান রাএট সিংহের সেখানে বাসা ছিল। তাঁর সম্প্রতি পড়তি অবস্থা, বিক্রয় করে দেবেন। জায়গাটি নিষ্পি বাজেয়াপ্তি[২]। বন্দোবস্ত খাজনা ছিল বার্ষিক দেড়টাকা। জায়গাটা খুব অল্প মূল্যে কিনে নিলাম। সেখানে বাড়ি তৈরি করে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বাস করতে আরম্ভ করলাম। এই সময় আমার অর্থাভাব হেতু, কাঠ কেনা বেচা ও কপাট, চৌকাঠ প্রস্তুত করিয়ে বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জন করছিলাম।

---

১ পঁচিশ গুণ্ঠে এক একর।

২ জমির স্বত্ব।

সন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাস বড়দিনের ছুটির সময় মাদ্রাজ শহরে ভারতবর্ষীয় কংগ্রেস এবং ভারতবর্ষীয় একেশ্বরবাদীদের মহাসভা বসবার কথা স্থির হল। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু কংগ্রেসের সভাপতির পদে ছিলেন। বালেশ্বর ন্যাশনাল সোসাইটি আমাকে কংগ্রেসের ডেলিগেট এবং বালেশ্বর ব্রাহ্ম সমাজ আমাকে একেশ্বরবাদীদের সভার ডেলিগেট পদে মনোনীত করে মাদ্রাজস্থিত সভাগুলিতে পত্র লিখলেন। আমি বারং[১] হতে রেলযোগে মাদ্রাজ গেলাম। মাদ্রাজে আমার এই প্রথম এবং শেষ কংগ্রেস দর্শন। সভায় অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় ছিল রাজনৈতিক। যদিও আমাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাগুলি সফল হবার কোন নিকট সম্ভাবনা নেই তথাপি আমাদের অবস্থার কথা ও অভাব অভিযোগগুলি প্রকাশ না করে চুপ করে থাকা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলবাসী সুশিক্ষিত, স্বদেশবৎসল, মাতৃভূমির দুর্দশা মোচনকামী সুসন্তানদের একতা সূত্রে গ্রথিত করেছে কংগ্রেস। একতার অভাবই ভারতের পতনের কারণ।

আমি একদিন মাদ্রাজের যাদুঘর দেখতে গিয়ে রাস্তার ধারে মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলককে কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথোপকথন করতে দেখলাম। আমি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে লাগলাম। কথাবার্তার পরে আমি যখন তাঁকে নমস্কার করতে যাচ্ছি। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'হাঁ হাঁ কর কি। আমার সঙ্গে শিষ্টাচার করার প্রয়োজন নেই।' একদিন আমি মাদ্রাজ হারবার (পোতাশ্রয়) দেখতে গেলাম, জাহাজগুলিকে ঢেউয়ের উৎপাত হতে রক্ষা করার জন্য সরকার বাহাদুর এই পোতাশ্রয় করিয়েছেন। দুইটি পাথরের বাঁধ তীর হতে বেরিয়ে ক্রমসূক্ষ্মভাবে সমুদ্রের ভিতরে চলে গেছে। দুই বাঁধের অগ্রভাগ সংযুক্ত না হয়ে পৃথক আছে। সেই ফাঁক দিয়ে জাহাজগুলি সব সমুদ্রের ভিতর হতে এসে পোতাশ্রয়ের ভিতর প্রবেশ করে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা বাঁধের উপর পড়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পোতাশ্রয়ের ভিতর আসতে পারে না। পোতাশ্রয়ের কূলে সুন্দর জেটি নির্মিত হয়েছে। সেই জেটির উপরে তার প্রান্ত ভাগ পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হয়েছে। রেলগাড়ি জেটির শেষ অবধি চলাচল করে। উত্তোলন যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজের ভিতর হতে মাল তুলে

[১] কাঠজুড়ি নদীর দক্ষিণে।

আনা হয়। রেলগাড়ির উপর রেখে দিলে, গাড়ি সেই মালসহ শহরের ভিতর নিয়ে আসে।

মাদ্রাজের আর একটি দর্শনীয় বিষয় ছিল 'পেচাপা কলেজ'। মহাত্মা পেচাপা একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। সন ১৭৫৪ সালে তিনি কাঞ্চিপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মের কয়েক মাস পূর্বে তাঁর পিতা বিশ্বনাথ মুদালিয়ার পরলোক গমন করায় তাঁর মাতা নিজেকে বাঁচাবার জন্য মাদ্রাজে পালিয়ে এসে নারায়ণ পিল্লে নামক একজন ধনী লোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দয়ালু হৃদয় পিল্লে পেচাপাকে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত করিয়ে বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়ে ছিলেন। অবশেষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হয়ে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি যে ইষ্টপত্র করে গিয়েছিলেন, তাতে বহুলক্ষ টাকা সাধারণের হিত কার্যে দেওয়া হয়েছে। পেচাপা কলেজ তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তি দিয়ে স্থাপিত এবং পরিচালিত হয়ে আসছে। শহরের প্রান্তভাগে প্রান্তরের মধ্যে মহারানী ভিক্টোরিয়ার মার্বেল পাথরের পাষাণময়ী মূর্তি দেখলাম।

আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর দেখার উদ্দেশে কাঞ্চিপুরম্ অবধি গিয়েছিলাম। কাঞ্চিপুরম্ স্টেশনে নেমে সেখানে শিবকাঞ্চি এবং বিষ্ণুকাঞ্চি তীর্থ দেখলাম। ঐ স্থানের প্রকৃত নাম কাঞ্চিপুরম্। ইংরেজরা এ কাঞ্জিভরম্ বলেন। সেখান হতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর সাত আট ঘণ্টার পথ। কিন্তু আমার সঙ্গী পরিচারক আর অধিকদূর যেতে চাইল না। আমি ফিরে এলাম। কাঞ্চিপুরম্ হতে বেজওয়াড়া লম্বা টিকিট করলাম। বেজওয়াড়া স্টেশনে নেমে কৃষ্ণা নদীতে স্নান করলাম। কৃষ্ণা নদীর উপরে যে লৌহময় পুল আছে সে রকম সুন্দর পুল আর কখনও দেখি নি। পথে ইলোর স্টেশনে নেমেছিলাম, তার পরে কটক।

সন ১৮৯৯ সালে কেন্দ্রাপাড়ার জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ জগদ্দেবের কাছ হতে একটি টেলিগ্রাফ পেয়ে ষ্টীমারযোগে কেন্দ্রাপাড়া চলে গেলাম। আমি অক্টোবর মাসে সাতাশ তারিখে শুক্রবার দিন রাত আটটার সময় সেখানে পৌঁছোলাম। রাধাশ্যাম নরেন্দ্র আর গৌরীশ্যাম নরেন্দ্র এঁরা দুই সহোদর ভাই ছিলেন। এই দুই ভাইয়ের কাছ হতে নিম্নলিখিত বংশ তালিকা অনুসারে বর্তমান জমিদারদের অস্তিত্ব।

রাধাশ্যাম নরেন্দ্র
|
জগন্নাথ ভ্রমরবর রায়
|
বলরাম ভ্রমরবর রায়
শ্যামসুন্দর নরেন্দ্র
ব্রজসুন্দর মর্দরাজ
বৃন্দাবনচন্দ্র হরিচন্দন
গোকুলচন্দ্র শ্রীচন্দন
(পাঁচ ভাই)

গৌরীশ্যাম নরেন্দ্র
|
রামগোবিন্দ জগদ্দেব
|
লক্ষীনারায়ণ জগদ্দেব

আমি গিয়ে দেখলাম কেন্দ্রাপাড়ার জমিদারেরা নাসিকাগ্র পর্যন্ত ঋণ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আছেন। অত্যধিক দেব ও অতিথি সেবা করার দরুণ তাঁদের এই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে।

দেবসেবা বিষয়ে দুই জমিদার বংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। দোল পূর্ণিমা যাত্রা উপস্থিত। একজন লোক এসে কর্তাকে সংবাদ দিল, 'বড়বাবু আজ হুকুম করলেন দোল যাত্রায় পাঞ্চ পণ্ডা[১] গোটি পুঅ[২] আসবে। বায়নার টাকা নিয়ে লোক বেরিয়ে গেল।' উত্তর হল, 'সে কি! আমাদের সাত দল গোটিপুঅ আসবে।' সেই লোক বলল, 'তাদের লোক ভাল ভাল পণ্ডা হাতিয়ে নেবে। বায়না দেওয়া হোক। আমি এই পথ ধরে ছুটে গিয়ে আগে থেকে বায়না করে আসব। তারা ভাল গোটিপুঅ পাবে না।' এই বলে সেই লোক কিছু টাকা নিয়ে বেরুল। কত খরচ হল সে খবর কে রাখে?

একদিন এক ব্রজবাসী সাধু হঠাৎ উপস্থিত হল। সাধু দর্শন মাত্র জমিদার সামন্ত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণত হওয়ায় আর সকল লোক ভক্তি এবং প্রেমে তাঁর পদ-তলে লুটিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার সময় দেবতার সামনে কীর্তন আরম্ভ হল। কীর্তনের শেষে সাধু বললেন, 'দেখুন, দেখুন, কীর্তন শুনে প্রভুর শ্রীমুখ কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।' সমস্ত ভক্তকুল বলল, 'হাঁ হাঁ, ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।' নিকটেই আমার বাসা। আমি সংবাদ পেয়ে গেলাম। কিন্তু কোন রকম জ্যোতি দেখতে

১ একটি পণ্ডা অর্থাৎ চারটে, পাঁচ পণ্ডা মানে কুড়িটা।
২ বালিকাবেশী বালক। তারা নাচে ও গায়।

পেলাম না। সাধু জানালেন, 'বৃন্দাবন ধামে গোচারণের সময় প্রভুর শ্রীমুখ হতে এই প্রকার জ্যোতি বেরুচ্ছিল।' স্থির হল আসছে কাল প্রভুর গোচারণ লীলা উৎসব সম্পন্ন হবে। পরের দিন কতকগুলি মাটির গাই, বাছুর দামুড়ি[১] প্রভৃতি এল। একটি মাটির কৃষ্ণ এবং পাঁচন হাতে কতকগুলি গোপাল বালক আনা হল। এই উৎসবে কর্তার ষাট সত্তর টাকা খরচ হল। তহবিল ত শূন্য। অতি চড়া সুদে টাকা করজ আনলেন। এই ধরনের সব ব্যাপার ছিল।

কেন্দ্রাপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ বংশ যুগলের বিপদের প্রধান কারণ—চতুর্মাস্যে[২] সাধুর দল পালন। এ বিষয়টি সমস্ত ভারতে প্রচারিত থাকায় ভারতের যাবৎ ভণ্ড, শঠ, অলস ও অসাধু সাধুর ভেক ধরে কেন্দ্রাপাড়া মঠে পৌঁছে যেত। সাধু বনে যাওয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। বটগাছের আঠা মাথায় মেখে জটা তৈরি করা দেহে কিছু ধুলো পাঁশ মেখে নিলেই হল। সেরূপ লোকের পক্ষে নেকড়ার টুকরো দিয়ে কৌপীন বানিয়ে নেওয়া কিছু কঠিন কথা নয়। আষাঢ়স্য প্রথম দিবস হতে পুণ্য মাস কার্তিক মাস পর্যন্ত সাধুদের বিশ্রামের সময় ছিল। তাদের সেবার বন্দোবস্ত আবার কি ধরনের হত? ভাত, ডাল, তরকারি ও রুটি আদেশ মাত্র উপস্থিত হত। তাছাড়া বিগ্রহের জন্য লুচি মালপোয়া ও লাড্ডুর স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। উপরন্তু গাঁজা ভাং, তামাক, তামাকপাতা এ সমস্ত সাধুদের নিত্য সেবনীয় ছিল। আবার কেন্দ্রাপড়া উঠানি[৩] সাধু মহাত্মারা তীর্থ দর্শন করতে বেরিয়ে পড়বেন। সেইজন্য পথ খরচার টাকা কাপড় ও কম্বল নিতান্ত আবশ্যক।

জমিদারদের সাধুসেবা হেতু কোন কোন সাধু মহাজন বনে যেত। কর্তা মশায়ের মন্দির হতে চাল, ডাল, ময়দা, চিনি, ঘি খেতে পাওয়া যেত। চাল, ডালে পেট ভর্তি হয়ে যেত। ঘি, ময়দা, চিনিগুলি বাজারে বিক্রয় করে টাকা হস্তগত করতেন। এই উপায় দ্বারা কোনো সাধু অনেক টাকা জমাচ্ছিল। সেই টাকা হতে আবার জমিদারকে কিছু কর্জ দিচ্ছিল। আমি কেন্দ্রাপড়ায় থাকার সময় এইরূপ দুইজন সাধু মহাজন উপস্থিত হল। তারা প্রত্যেকে কর্তামশায়কে পাঁচশত করে টাকা কর্জ দিয়েছিল। তারা বলল যে তারা একটি সাধুর দলের

১ এঁড়ে বাছুর।

২ বর্ষার চার মাস।

৩ ভবঘুরে।

সঙ্গে সেখানে এসেছিল। সেই দল বর্তমানে কটকে আছে। তাদের মূলধন আর সুদ দিয়ে দিলে তারা চলে যাবে। যদি দিতে একদিন কিম্বা একবেলা দেরি হয়, তাহলে কটক থেকে সংঘবদ্ধ দল কেন্দ্রাপড়া চলে আসবে। তাদের এই দলে ষাট জন সাধু তপস্বী ও কতক হাতী, উট, ঘোড়া আছে। সম্প্রতি মহা বিপদ উপস্থিত। সেই সাধুর দল যদি কেন্দ্রাপড়া এসে যায় তাদের জন্য ন্যূনপক্ষে দৈনিক একশত টাকা খরচ হবে। তহবিলও শূন্য। অনেক কষ্টে ধার কর্জ করে মূল টাকার বর্ধিত সুদটা পরিশোধ করি। মূল টাকাটার জন্য একটি নূতন তমসুক করিয়ে দেওয়া হল। শুনলাম এই মহাজন দুজন ইতিপূর্বে পর পর দশবারো বছর অবধি এই সামন্তের মঠে 'চতুর্মাস্যা সাধু' ছিলেন। এই মঠের উপার্জিত টাকায় এখন মহাজন বনে গেছেন। তিন বছর পূর্বে আমি একটি সরকারী রিপোর্টে পড়েছিলাম ভারতের সাধুর সংখ্যা উনচল্লিশ লক্ষ।

আমি কেন্দ্রাপড়ায় উপস্থিত হয়ে জমিদারির তথা ব্যয় এবং দেনার বিষয় তদন্ত করে দেখলাম, জমিদারির সমস্ত প্রকার আয় হতে মহাজনদের প্রাপ্য মূল টাকার সুদ দিয়ে মাত্র সামান্য টাকা অবশিষ্ট থাকে। জমিদারি বিক্রয় না করলে মূল দেনার পরিশোধের কোনো উপায় নেই। এধারে আবার লক্ষ টাকা অবধি ডিক্রিজারী মামলা আদালতে ঝুলছে। আমি বিবেচনা করলাম মহাজনদের সুদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকায় জমিদার যদি সংসার চালাতে স্বীকৃত হন, জমিদারির কতক অংশ বিক্রয় করে দিয়ে ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করে দেওয়া হবে। আর অবশিষ্ট জমিদারি কলকাতার কোনো মহাজনের নিকট বন্ধক রেখে অল্প সুদে টাকা ধার নেওয়া হবে। অতঃপর ধীরে ধীরে মহাজনদের দেনা পরিশোধ করা হবে। আমি ভালরূপ হিসাব করে দেখেছিলাম যে এই উপায়ে অর্ধেক জমিদারী রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু আমার প্রস্তাব মতো ব্যবস্থা অনুসারে কাজ না করে জমিদার পূর্ববৎ সমস্ত খরচপত্র করতে লাগলেন। আমাকে পরিষ্কার রূপে জবাব দিলেন যে, দেবসেবার খরচ তিনি কোনোরকমে কমাতে পারবেন না। আমি কেন্দ্রাপড়ায় নয়মাস মাত্র ছিলাম। জমিদারী রক্ষার কোনো উপায় না দেখে কার্য ত্যাগ করে কটকে চলে এলাম।

কেন্দ্রাপড়া হতে আসার সময় আমার বয়ঃক্রম সাতান্ন বছর হয়েছিল। এর পরে আমি আর কারও অধীনে কার্য গ্রহণ করি নি। এখন থেকে আমি আমার কটক বাখরাবাদের বাড়িতে রইলাম। বহু দিবসের অন্বেষণ এবং বহু যত্নে

বাখরাবাদে সেই গৃহ নির্মাণযোগ্য জমিখানি পেয়েছিলাম। অনেক কষ্ট স্বীকার করে বাড়িখানি তৈরি করেছিলাম। গৃহের চারিদিকে বিবিধ প্রকার পুষ্প ও নানা প্রকার ফলের বৃক্ষে বেষ্টিত থাকায়. সেগুলি কুঞ্জবনের ন্যায় প্রতীয়মান হত। সেই কুঞ্জবনের জন্য ক্ষুদ্র অট্টালিকাটি মনোহর রূপ ধারণ করেছিল। এই গৃহে আমি আমার শেষ জীবনের অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলাম। কোনও দিন রজনীগন্ধার, কোনদিন গোলাপ গুল্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ে যেত। সেই বিষয় নিয়ে আমি কবিতা লেখা আরম্ভ করতাম। অনেক মাস অবধি মন দিয়ে দেখেছি প্রতিদিন সকাল ঠিক নটার সময় দুটি হলদি বসন্ত পাখি[১] এসে পুষ্পোদ্যানের মধ্যে ক্রীড়ায় রত হত। সে বিষয় একটি কবিতা লিখলাম। দুটি কপোত আকাশে কিভাবে যুক্ত হয়ে উড়ে গেল সে বিষয়ে একটি কবিতা লিখলাম। সন্ধ্যার সময় কাঠজুড়ির কূলে পাথরের বাঁধের উপর বসেছি, মনে যে ভাবের উদয় হল, তা একটি কবিতায় লিপিবদ্ধ করলাম, আমি এই কবিতাগুলি একত্র করে 'অবসর সময়ে' পুস্তকখানি প্রকাশ করলাম।

বালেশ্বরে শিক্ষকতার কাজ করার সময় আমার কবিতা লেখার স্পৃহা ছিল। সেখানকার প্রেস হতে একটা মাসিক পত্র বেরুত। আমি সেখানে আমোদ-জনক কবিতা লিখছিলাম। সেই 'বোধদায়িনী পত্রিকায়' আমি একটি গল্প লিখেছিলাম, গল্পটির নাম 'লছমনিআ'। বোধ করি উৎকলে এটাই প্রথম মুদ্রিত গল্প। লোকে এটা আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিল। অবশ্য তা আর কজনই বা। আমি বালেশ্বর হতে চলে এসে যখন গড়জাতগুলিতে কাজ করতে গেলাম, সেই সময় আমার সাহিত্য রচনা বন্ধ হয়ে গেল। আট দশ বছর আমি লেখা ছেড়ে দিলাম। ঢেঙ্কানালে থাকার সময় আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি মারা যায়, আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ করলাম। আমার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মবৎসরে অর্থাৎ ১৮৮১ সালে আমি মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ করলাম। ১৯০২ সালে সে যখন বি. এ পাস করল আমার সেই বছর অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত অনুবাদ শেষ হল। আমি ডোমপাড়ায় দ্বিতীয়বার কর্মকরার সময় আমার স্ত্রী কৃষ্ণকুমারী পরলোক গমন করেন। আমার সে সময়ে নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়েছিল। তাই আমি 'পুষ্পমালা' এবং 'উপহার' এই দুইখণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করেছি। আমার কটক বাসের সময় আমি উপনিষদ্

১ খোকা হোক বা বেনে বৌ পাখি।

পড়তাম এবং তার ওড়িয়া পদ্যানুবাদ করতাম। পা কামড়ানো ব্যারাম ছিল আমার চিরসহচর। বালেশ্বরে একজন প্রসিদ্ধ জমিদারের পুত্র পূর্ণচন্দ্র দাস সে সময়ে আমার কাছে থেকে কটক কলেজে এফ, এ পড়ছিল। আমার পা কামড়ানো রোগে সে আমার অনেক সেবা করেছে। উপনিষদ্ অনুবাদের সময় সে আমায় অনেক সাহায্য করেছে। আমি রোগশয্যায় পড়ে অনুবাদ করতাম এবং কবিতাগুলি মুখে মুখে বলতাম, সে লিখে নিত। সে সময়ে পূর্ণচন্দ্র সাহায্য না করলে উপনিষদ্ অনুবাদ বেরুবার কোনরকম সম্ভাবনা ছিল না।

কটক বাসের সময় আমার উপন্যাস লেখা আরম্ভ হয়। আমি প্রথমে 'রেবতী' নামে একটি গল্প লিখি। 'উৎকলসাহিত্যে'[১] প্রকাশ করার জন্য তা সম্পাদককে দিলাম। আমি এই সময় যে গল্প ও উপন্যাসগুলি লিখতাম তা আমার নামে প্রকাশ না করে 'ধূর্জটি' নামে প্রকাশ করতাম। এই নামটি পছন্দ করে দিয়েছিলেন আমার প্রিয়বন্ধু মধুসূদন রাও। তার পরে 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' নামে গল্প আরম্ভ করলাম। তা ক্রমশ: বাড়তে বাড়তে একটা বড় উপন্যাসে পরিণত হল। এর পরে 'অপূর্ব মিলন' নামে একটি উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করি এবং এই নামে তা 'উৎকল সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়েছিল। স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে যখন ছাপা হল, তার নাম দিলাম 'লছমা'। আমার এই গল্প ও উপন্যাসগুলি পড়ে পাঠকেরা বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন। 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' তাঁরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলেন। এই উপন্যাসে লিখিত রামচন্দ্র মঙ্গরাজের মকর্দমার বিবরণ যখন উৎকলসাহিত্যে প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই সময় মফস্বল হতে কতক অজ্ঞ লোক মকর্দমার বিচার দেখবার জন্য কটক এসেছিল।

সন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমার পুত্র সাবডেপুটি কাজে নিযুক্ত হয়ে বালেশ্বর চলে গেল। আমি সেই সময় কটকের বাড়ি ছেড়ে বালেশ্বরে গেলাম।

১ উৎকল সাহিত্য ছিল সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র। সম্পাদক সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ কর।

বালেশ্বর নিবাস

আমি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বরে এলাম। আজ তেরো বৎসর হল এখানে বাস করছি। আমার স্ত্রী কৃষ্ণকুমারী অনেক বছর হল আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমার পুত্র সরকারী কার্য উপলক্ষে স্থানান্তরে বাস করে। আমার পুত্রবধূ আমার বালেশ্বর নিবাসের অধিকাংশ সময় বিদেশে থাকত। জ্ঞাতি বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি এই দীর্ঘ তের বছর কাল প্রায় একাকী আছি। চিরদিন একাকী থাকা আমার ভাগ্যলিপিতে লেখা আছে। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন ছিলাম, যৌবনে পত্নীহীন হয়ে দূরদেশে ছিলাম। এখন বার্ধক্যে অবধি সন্তান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে বাস করছি। একাকী থাকায় চিন্তা করার যথেষ্ট সময় পাই। আমি চির রোগী হওয়ায় কর্মপটু নই, কিন্তু ব্যাধি বিপদের সময় আমার লেখা একটু ভালো হয়। আমার উদ্যান মধ্যস্থ কৃষ্ণকুমারী সমাধি মন্দির এবং গৃহ নিকটস্থ 'শান্তিকানন' নামক উদ্যান আমাকে এই দীর্ঘ নির্জন বাস কালে শান্তিদান করেছে। এই শান্তি এবং নির্জনতার ক্রোড়ে বসে আমি আমার জীবনের শেষ গ্রন্থমালা রচনা করেছি। 'মামু' 'প্রায়শ্চিত্ত' 'বৌদ্ধাবতার কাব্য' এবং আমার এই আত্মজীবনচরিত এইখানে রচিত হয়েছে।

আমি একাকী থাকার সময় কবি নন্দকিশোর বল বালেশ্বর জেলা স্কুলে হেডমাস্টার নিযুক্ত হয়ে এলেন। দুইজন একসঙ্গে বাস করতে লাগলাম। গ্রীষ্মকালে বাড়ির আঙিনায় দুইটি আরাম কেদারা ফেলে সন্ধ্যা হতে রাত নয়টা দশটা অবধি গল্প করি। গল্পের অধিকাংশ উৎকলের সাহিত্য সম্বন্ধে। আমরা একসঙ্গে থাকার সময় অনেক গল্প ও কবিতা রচনা করেছি। কিছুকাল আমার সঙ্গে থাকার পরে নন্দকিশোরবাবু অন্যত্র চলে গেলেন। সে ধরনের পবিত্র সুখকর নৈশমিলন আমার অদৃষ্টে আর ঘটবে না। উভয়ে সাহিত্য চর্চায় মগ্ন থাকি। উভয়ের কামনা মাতৃভাষার উন্নতি। আবার উভয়ে 'মন্দঃকবি যশোপ্রার্থী।' আমার পক্ষে সেই সৌভাগ্যকাল একেবারে অবসিত হয়ে গেছে।

সন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে একদিন আমি ভেদ ব্যারামে আক্রান্ত হওয়ায় আমার গোমস্তা শ্রীকণ্ঠ পট্টনায়ক ঔষধ ভেবে আমাকে জলের সঙ্গে অলঘুকৃত গন্ধক দ্রাবক (Undiluted Sulphuric Acid.) পান করার জন্যে এনে দিল। এ একটি জীবনঘাতী অগ্নিময় পদার্থ। জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ঔষধের কাজ করে। কিন্তু জলের রং আর দ্রাবকের রং সমান হওয়াতে, দ্রাবকের রূপ দেখে কারও ধারণা হবে না যে এটা জলের সঙ্গে মিশ্রিত না বিশুদ্ধ অবস্থায় আছে। সেইজন্য আমি সেই বিষপান করবার সময় তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারি নি। আমি তা পান করবা মাত্র আমার জিহ্বা হতে উদর পর্যন্ত সব পুড়ে জ্বলে গেল। অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন আমার জীবনের আশা ত্যাগ করে বসেছিলেন। সে সময়ে আমার চেতনা ছিল, কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন করার শক্তি ছিল না। আমি জীবনের আশা ত্যাগ করে পড়েছিলাম। স্থিরভাবে পড়ে থেকে প্রভুর ধ্যান করি। যাই হোক আমার পুত্রবধূর সেবা শুশ্রূষার বলে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম।

এই ঘটনার ঠিক দুই বছর পরে আমার পৃষ্ঠব্রণ পীড়া হল। পৃষ্ঠব্রণ অতি ভীষণ ব্যাধি, কিন্তু পীড়ার পূর্বলক্ষণ জানতে পারামাত্র চিকিৎসা আরম্ভ করায় পীড়া তত যন্ত্রণাদায়ক ও মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে নি। চিকিৎসা চলেছে সেই সময় একদিন সকালে মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর হাতে দুটি পাতা নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে বললেন, 'ফকীরমোহনবাবু, এটি গুহালিয়া পাতা। আমি বলছি আপনি এই পাতা ব্রণের উপর লাগান, নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবেন।' সেই পাতা ব্যবহার করতে স্বীকার হলাম। মহারাজা আমার সঙ্গে কতক্ষণ কথোপকথন করে বিদায় নেবার সময় বললেন, 'ফকীর মোহনবাবু, আমি কাল কলকাতায় যাচ্ছি, ফিরে এসে দেখা হবে।' হায়! বালেশ্বরের পক্ষে কি দুর্ভাগ্যের বিষয়। মহারাজাকে আর ফিরতে হল না। ওলাউঠা রোগে কলকাতায় তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। আমি রোগশয্যায় পড়ে তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনলাম। মহারাজার ন্যায় পরোপকারী ব্যক্তি আমি অল্পই দেখেছি। আমার কোনো বিপদ আপদ অথবা রোগ আক্রমণের কথা শুনলে তিনি আমার কাছে ছুটে আসতেন। কেবল আমার কথাই নয়, শহরের মধ্যে কোনো ভদ্রলোকের পীড়ার সংবাদ শোনা মাত্র, তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে তার উপকার করার জন্য প্রস্তুত হতেন। বালেশ্বরে শিক্ষাবিস্তার, উৎকল

ভাষার উন্নতি সাধন এবং সাধারণের হিতকর কার্যে মহারাজা অগ্রণী ছিলেন।

মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন 'প্রবাসী' নামক বাঙলা মাসিকপত্রে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখলাম। সেখানে একজায়গায় লেখা ছিল যে 'গুহালিআ' নামক লতার পত্রদ্বারা পৃষ্ঠব্রণ উপশম হয়, এটা আর্য মহর্ষিদের জানা ছিল। আমি গুহালিআ লতার অন্বেষণের জন্য লোক নিযুক্ত করেছি, এই সময় মেদিনীপুর নিবাসী দ্বারকানাথ মাইতি নামক একজন জমিদার আমাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন, 'পানিশিউলির পাতার প্রলেপদ্বারা তাঁর একজন আত্মীয়ার পৃষ্ঠব্রণ ভাল হয়েছিল।' আমার পুষ্করিণীতে পানিশিউলি পাতা ছিল। তা নিয়ে এসে বেটে আমার পিঠে বেঁধে দেওয়া হল। অল্পদিন পরে দেখা গেল যে ক্ষত স্থানে কতকগুলি ছিদ্র হয়েছে। এবং সেই ছিদ্রপথ দিয়ে পুঁজ নির্গত হচ্ছে। ভগবানের কৃপায় আমি কিছুদিন পরে আরোগ্য লাভ করলাম।

নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য ও সুখ ভোগ আমার ভাগ্যে নেই। পৃষ্ঠব্রণ রোগ হতে মুক্তি লাভ করার দশ কি এগারো মাস পরে দারুণ যন্ত্রণাদায়ক উরুস্তম্ভ রোগে আক্রান্ত হলাম। আমার বামজানুর কতক অংশ পেকে গিয়ে পুঁজ নির্গত হতে লাগল। অনেকদিন আমি শয্যাগত ছিলাম। আমার সেই ব্যাধির সময় আমি অনেকের কাছ থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি। মহারাজ বৈকুণ্ঠনাথ দের উত্তরাধিকারী কুমার মন্মথনাথ দে আমার খবরাখবর নেবার জন্যে প্রায় প্রতিদিন সকালে আমার নিকট আসতেন এবং সময় সময় আমার জন্য ডাক্তারখানা হতে ঔষধ নিয়ে আসতেন। একদিন মৌলবী আসরফ আলি কাব্যরত্ন আমার জন্য কলকাতা হতে আঙ্গুর নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি পূর্বে যখন বিষপান করে শয্যাগত হয়েছিলাম, উৎকলের একজন প্রসিদ্ধ লেখক এবং আমার যুবক বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় রথ কাব্যতীর্থ বাণীভূষণ আমাকে দেখতে কটক থেকে এসেছিলেন। আমি এই ভীষণ ব্যাধির হাত হতে রক্ষা পেলাম।

সন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে নিঃস্বার্থ উৎকল হিতৈষী উৎকলের একজন পরম সেবক বিহার ও উৎকলের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য গোপবন্ধু দাস মহোদয় কলিকাতা ফেরৎ আমার গৃহে দুইদিন বাস করেছিলেন। সকালে বিদায় নেবার সময় দেখলাম তিনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে, আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে

আছেন। তাঁর নেত্রযুগল হতে অবিরাম অশ্রুধারা নির্গত হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে ধীরে ধীরে আমাকে বললেন, 'আমি দুইদিন এখানে থেকে আপনার অবস্থা বুঝলাম। আপনি নিতান্ত দুর্বল, নিঃসহায় ও একাকী হয়ে পড়েছেন। চাকরদের সেবা আপনার পক্ষে এখন যথেষ্ট নয়। আপনার সেবা ও সাহায্যের জন্য আত্মীয় লোকের পাশে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।' দেশবাসীদের এই প্রকার সহানুভূতি আমার শেষ জীবনের সান্ত্বনা।

আমার অন্তিমকালে দেশবাসীরা আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য সেবা ও দেশ সেবার যথেষ্ট পুরস্কার দান করেছেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি বামড়া হতে 'সরস্বতী' উপাধি পেয়েছি। সুরতরঙ্গিনী সারস্বত সমিতি আমাকে এই উপাধিতে ভূষিত করেছেন। রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব এই সভার সভাপতি ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কটকে সমগ্র উৎকলবাসীদের যে সম্মিলনী হয়েছিল তাতে আমার ন্যায় অধম ব্যক্তিকে সভাপতি পদে বরণ করে দেশবাসী আমাকে যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত করেছেন।

পরিশিষ্ট

ফকীরমোহনের আত্মজীবন চরিত রচনা শেষ হবার অল্পকাল পরে তাঁর জীবনান্ত ঘটে। তিনি ১৪ই জুন ১৯১৮ সালে বালেশ্বর মলিকাশপুরস্থিত ভবনে দেহ রক্ষা করেন। পুত্র মোহিনীমোহন কটকের রেভেনশ কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। পুত্র, পুত্রবধূ হিরণপ্রভা ও আমরা তাঁর পৌত্রী বালেশ্বরের বাড়ীতে যখন পৌঁছলাম তখন পিতামহ ফকীরমোহন রোগশয্যায় এক বিরাট পালঙ্কে শয়ান। আমার মাতা হিরণপ্রভাকে তিনি বাঙলায় স্নেহ সম্বোধন করলেন। ১৩ই জুন দুপুরবেলা যখন আমরা মাতা হিরণপ্রভার সঙ্গে আহারে রত তখন চাকর এসে খবর দিল ফকীরমোহন মাকে ডাকছেন। আমার মা আহার অসমাপ্ত রেখে তাঁর কাছে গেলেন। আমিও ধীরে ধীরে মাকে অনুসরণ করলাম। দেখলাম পিতামহ আর সেই পালঙ্কে শুয়ে নেই, মেঝেতে গদি পেতে তাঁকে শোয়ানো হয়েছে। তিনি নিম্নস্বরে মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। ১৪ই জুন দেখলাম তাঁকে গৃহের অন্য প্রান্তে শোয়ানো হয়েছে। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ছে। মৃত্যুর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। দেখলাম মৃত পিতামহের শয্যাপ্রান্তে পিতা মোহিনীমোহন কাঁদছেন, মাতা হিরণপ্রভা ব্রহ্ম-সংগীত হতে গান করছেন ও পিতামহের সতীর্থ ব্রাহ্ম ভগবানবাবু উপাসনা করছেন।

ফকীরমোহন ছিলেন সাধারণ লোকের তুলনায় দীর্ঘদেহ, গায়ের রং গৌর দীর্ঘনাসা সুদর্শন। তাঁর পালঙ্ক ফরমাশ দিয়ে করানো হত। আমার নিজের চোখে দেখা এবং লোকের মুখে শোনা তিনি সৌম্যমূর্তি পরম রূপবান ছিলেন। দিবাবসানের সঙ্গে পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত শবদেহ জনসমুদ্রের মধ্যে বাহিত হয়ে চলে গেল। আমরা নাতনীরা মশাল হাতে কিছু দূর পর্যন্ত শবানুগমন করেছিলাম।

তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার পিসীমাতা মহিলামণি প্রথম হিন্দু বালিকা স্কুলে পড়তে যান। একটা বন্ধ পালকীতে করে তিনি স্কুলে যেতেন। ১৯১৮ সালের জুন মাসে মলিকাশপুরের বাড়িতে সেই পালকীটা আমি দেখেছি।

ফকীরমোহনের শিক্ষারম্ভ দেরিতে হয় এবং কলেজে পড়াও সম্ভব হয় নি। তাঁর পুত্র মোহিনীমোহন বি. এ. পাশ করার পর সাব-ডেপুটির কাজ করতেন এবং সেই কর্মসূত্রে কটক হতে ওড়িশার কোন এক জেলায় সফরে গিয়েছিলেন। পুত্রের এম. এ. পাশের খবর যখন ফকীরমোহন পেলেন তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভগিনী মীরাকে কোলে নিয়ে বাগানে ছুটে গেলেন এবং অনেকক্ষণ বাগানে বেড়ালেন।

ইংরেজি শেখার জন্য তিনি অসীম কষ্ট করেছেন। চেম্বারস্ অভিধান ও ইংরেজি বই নিয়ে তিনি সারা রাত একটি ঘরে আবদ্ধ হয়ে সাধনা করতেন। এ কথা আমি মোহিনীমোহনের কাছে শুনেছি। বাল্যকালে আমি আলমারিতে একটা চ্যাপটা মতন গোল বড় দোয়াত দেখতাম, পিতাকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেন ফকীরমোহনকে ডোমপাড়া মহারাজ ওই দোয়াতটা দেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত লেখা ওই দোয়াতের সাহায্যে করেন। সেই দোয়াতটি একবার কয়েকজন কলেজের ছাত্র যাদুঘরে রাখা হবে বলে বারিপদায় নিয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের ১৩ জুন মোহিনীমোহনের মৃত্যু। সেই সময় অবধি আমি একটা রূপোর থালা আলমারিতে দেখতে পেতাম, সেই থালাটি ছিল ফকীরমোহনের সরস্বতী উপাধির পদক।

শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ অত্যন্ত উদার ছিল—তাঁর মনে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা ছিল না। আমাদের মা হিরণপ্রভা ছিলেন বাঙালী। ওড়িয়া ভাষায় তিনি কথাবার্তা বলতে ও ছাপার অক্ষর পড়তে পারতেন। কিন্তু ওড়িয়া ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাদের শিক্ষারম্ভে এক সমস্যা উপস্থিত হয়। হিরণপ্রভা বললেন মেয়েদের ওড়িয়া পড়াতে হলে ফকীরমোহন কিম্বা মোহিনীমোহন মেয়েদের শিক্ষার ভার যেন গ্রহণ করেন। পিতা পুত্র দুজনেরই বালিকাদের বর্ণমালা শেখাবার মতো সময় ছিল না। ফকীরমোহন বললেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন তা যে কোন ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব।' ফকীরমোহন আমার মা হিরণপ্রভার হাতে আমাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করলেন। ওড়িয়া ভাষার জন্মদাতা ব্যাসকবি ফকীর-মোহনের সঙ্গে আমরা বাঙলায় কথাবার্তা বলতাম।

ফকীরমোহন ও মোহিনীমোহন—পিতা পুত্রের মধ্যে স্বভাবের সাম্য ছিল না। ফকীরমোহন ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী (তাঁর মল্লিকাশপুরের বাসভবনে একটি

পূজাগৃহ ছিল, তিনি সেখানে নিয়মমত উপাসনা করতেন)। আর মোহিনীমোহন নিরীশ্বরবাদী (তাঁর মতবাদ তিনি লেখার মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন)। ফকীরমোহন মিশুক স্বভাবের, মোহিনীমোহন একাকী নিঃসঙ্গতাকামী চিন্তা বিলাসী ছিলেন। ফকীরমোহন ছিলেন জনপ্রিয় এবং জনসাধারণের মতামতের মূল্য তিনি দিতেন। মোহিনীমোহন জনসাধারণের সমালোচনায় বিচলিত হতেন। তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা সেই যুগে তীক্ষ্ণ সমালোচনার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে সুদূর ইংলণ্ডে খ্যাতি লাভ করেছিল। ফকীরমোহন ছিলেন অমিতব্যয়ী আর মোহিনীমোহন সংযতব্যয়ী, লোকে এমন কি তাঁকে কৃপণ বলত। মোহিনীমোহন দার্শনিক, তাঁর লেখায় কল্পনা কখনও স্থান পায় নি। ওড়িশার জনসাধারণের কাছে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ নিয়ে ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। ফকীরমোহন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হিরণপ্রভা ও তিন নাতনীকে দিয়ে যান। আমি সেই ইচ্ছাপত্র দেখেছি। পুত্র মোহিনীমোহনকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার কারণ তিনি লিখে গেছেন, 'পুত্রের নিষ্ঠুর ব্যবহার হেতু তাহাকে আমি আমার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করিলাম।' আমি মাতা হিরণপ্রভাকে পিতার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন ফকীরমোহন অস্বাভাবিক রকম খরচ করতেন এবং তার ফলে জিনিসপত্র নষ্ট হত। যেমন আম কেনার ইচ্ছে হল একেবারে এক গাড়ী পাকা আম কিনে বসলেন, সে আম পাড়ায় বিলিয়ে, নিজে খাওয়া সত্ত্বেও অনেক নষ্ট হত। আবার সেই নষ্ট আম ফকীরমোহন নিজে খেতেন। মোহিনীমোহন সে সব আম একবার ফেলে দিয়েছিলেন।

ফকীরমোহন ও মোহিনীমোহনের প্রকৃতি বিপরীতমুখী—এ যেন একজনের চরিত্রের প্রতিক্রিয়া আরেকজনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

ফকীরমোহন তাঁর দাম্পত্য জীবনের কথা নিজ মুখেই বলে গেছেন। আত্মীয় স্বজনেরা বলেন ফকীরমোহনের প্রথমাপত্নী লীলাবতী পরমাসুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। ফকীরমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রথমা পত্নীর কি কারণে বনিবনা হয় নি তা সকলের অজ্ঞাত। প্রথমা পত্নী হতে তাঁর একটি কন্যা হয় নাম মহিলামণি। দ্বিতীয় স্ত্রী কৃষ্ণকুমারীর তিনটি সন্তান। প্রথম সন্তান অল্প বয়সে মারা যান, তারপর মোহিনীমোহন ও সরোজিনী। ফকীরমোহন পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। মোহিনীমোহনের পুত্র সন্তান হয় নি তাঁর চারি কন্যা।

ফকীরমোহন গাছপালা বাগান ভালবাসতেন সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সৌখিন ছিলেন—শান্তিকানন তার নিদর্শন। নানা দেশ হতে ফলের বীজ আনিয়ে তিনি শান্তিকাননে লাগান এবং সে বাগান অত্যন্ত রমণীয় ছিল। সেখানে ছিল তিনটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ঘাট বাঁধানো। একটি পুষ্করিণী জনসাধারণের জন্য বাগানে প্রবেশপথের সোজাসুজি চলে গেছে, এর পরের পুষ্করিণী সেনাপতিদের পুরুষদের স্নানের জন্য—শেষের এবং একেবারে ধারের পুষ্করিণীটি অতীব মনোরম, লতা গুল্ম বৃক্ষদ্বারা আবৃত। উদ্যানের প্রবেশপথ হতে এই পুষ্করিণীর ঘাট অবধি পথের দুপাশে ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের সারি। পথটি এই গাছের আড়ালে লুকোনো। এই পুষ্করিণীটি মহিলাদের স্নানের জন্য। এই পুকুরে যাবার পথের ধারে খাঁচার মতো জালির কুটীর। সেই কুটীরে থাকত একটি ময়ূর ও ময়ূরী। সেই কুটীরের কিছু দূরে একটি ছোট কৃত্রিম পাহাড়। পাহাড়ের উপর ছোট একটি মন্দির—মন্দিরটি অতি ক্ষুদ্র। শুনেছি পিতামহী কৃষ্ণকুমারী দেবী সেখানে পুজো করতেন।

উদ্যানের প্রবেশপথ হতে বামে একটি চৌবাচ্চায় লাল নীল মাছ। সারা বাগানটি ফুলে ফলে পূর্ণ। পরিচারক ও সাধারণের স্নানের পুকুরপাড়ে দারোয়ানের পাথরের মূর্তি। প্রবেশপথের দক্ষিণ দিকের গেটের কাছে ফকীর মোহনের চোগা চাপকান সালমা পরা রঙিন মূর্তি। ওড়িশার বাইরে থেকে এক মূর্তিকার এসে এই মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন। ফকীরমোহন ছিলেন ওড়িশার উইলিয়াম কেরি। উদ্যান পালন বিদ্যায় অভিজ্ঞ। মধুসূদন রাওকে লেখা ফকীরমোহনের পত্রে এই উদ্যান পালন সম্বন্ধে আলোচনা ছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে ফকীরমোহনের কোন গোঁড়ামি ছিল না। 'শান্তিকাননের' সর্বধর্মসমন্বয় তার নিদর্শন। শান্তিকাননের প্রবেশদ্বার হতে সোজা যে পথ জনসাধারণের পুষ্করিণীর ঘাটে মিশেছে—সেই পথের বামে বাঁধানো ঘাটের কাছে একটি বেদী এবং সেই বেদীর মাঝখানে নয় কোণা স্তম্ভ আছে। এটি সর্বধর্মসমন্বয়ের স্তম্ভ। এই স্তম্ভে প্রতি গাত্রফলকে নয়টি ধর্মগুরুর মূর্তি বিরাজমান; যেমন বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, রাজা রামমোহন রায়, শ্রীচৈতন্য দেব, শঙ্করাচার্য, গুরু নানক, জগন্নাথ দাস, অজন্তা। প্রতি মূর্তির পাদদেশে সেই ধর্মের মূলমন্ত্র উদ্ধৃত।

বালেশ্বরের বাড়ির লাগাও একটি পুষ্করিণী ছিল। সেই পুকুরের কাছাকাছি একটি বেদী ছিল। ফকীরমোহন সেই বেদীতে বসে কৃষ্ণকুমারীকে তাঁর লেখা পড়ে শোনাতেন। সেই বেদীর উপর কৃষ্ণকুমারী দেবীর সমাধি নির্মিত হয়। বালেশ্বরে তাঁর আরেকটি বিরাট পুষ্করিণী ছিল। নাম বনিয়া পোখরি। সেই পুষ্করিণীটির সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিল। ফকীরমোহনের একটি হাউস বোট ছিল। তিনি কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে সেই হাউস বোটে বনিয়া পোখরিতে নৌ-বিহারে যেতেন।

ফকীরমোহনের দুইটি বাসভবন ওড়িশায় এখনও বর্তমান। তাঁর আদি বাসভবন বালেশ্বরের মল্লিকাশপুরে ভগ্নাবশেষ ওড়িয়া সরকারের অধিকৃত। কটক অন্তর্গত বাখরাবাদে অবস্থিত বাসভবন তাঁর বংশধরের অধিকার ভুক্ত।

মৈত্রী শুক্ল

ফকীরমোহন সেনাপতির রচনাপঞ্জী

১. জীবন-চরিত (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'জীবন-চরিত'-এর ওড়িয়া অনুবাদ); প্রথম সংস্করণ ১৮৬৬; ব্যাপটিস্ট্ মিশন প্রেস, কলিকাতা।

২. ভারতবর্ষর ইতিহাস; প্রথম ভাগ; প্রথম সংস্করণ ১৮৬৯; উৎকল প্রেস, বালেশ্বর।

৩. ভারতবর্ষর ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ; প্রথম সংস্করণ ১৮৭০; উৎকল প্রেস, বালেশ্বর।

৪. অঙ্কমালা; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭০, উৎকল প্রেস, বালেশ্বর।

৪ক. ওড়িয়া ব্যাকরণ; এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল (পৃঃ ৬৫), কিন্তু পাওয়া যায় না। প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

৫. (বাল্মীকি) রামায়ণ (পদ্যানুবাদ);

(১) বালকাণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৪; দেংক উৎকল প্রেস বালেশ্বর। (এই খণ্ডের প্রথম সংস্করণ গ্রন্থকার ঢেঙ্কানালে থাকাকালীন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। এই সংস্করণ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য)

(২) অযোধ্যাকাণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৪, দেংক উৎকল প্রেস বালেশ্বর।

(৩) আরণ্যকাণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৮৮৩; দেংক উৎকল প্রেস বালেশ্বর।

(৪) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৮৮৫, দেংক উৎকল প্রেস বালেশ্বর।

(৫) সুন্দরকাণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৮৮৭; দেংক উৎকল প্রেস বালেশ্বব।

(৬) লঙ্কাকাণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৮৯০, দেংক উৎকল প্রেস বালেশ্বর।

(৭) উত্তরকাণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৮৯৫, দেংক উৎকল প্রেস বালেশ্বর।

৬. মহাভারত (পদ্যানুবাদ);

(১) আদিপর্ব, প্রথম সংস্করণ, ১৮৮৭; উৎকল প্রিন্টিং কোম্পানী প্রেস, বালেশ্বর।

(২) সভাপর্ব, প্রথম সংস্করণ, ১৮৮৭; উৎকল প্রিন্টিং কোম্পানী প্রেস, বালেশ্বর।

(৩) বনপর্ব, প্রথম সংস্করণ ১৯০৪ ; অরুণোদয় প্রেস, কটক।

(৪) বিরাট পর্ব, প্রথম সংস্করণ ১৯০৫ ; মর্দরাজ প্রেস, রম্ভা।

(অন্যান্য পর্বগুলিও ফকীরমোহন অনেক দূর পর্যন্ত অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি প্রকাশিত হয় নি)

৭. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (পদ্যানুবাদ) ; প্রথম সংস্করণ, ১৮৮৭ ; উৎকল প্রিন্টিং কোম্পানী প্রেস, বালেশ্বর।

৮. উৎকল-ভ্রমণম্ (কাব্য) ; প্রথম সংস্করণ ১৮৯২ ; আনন্দপুর প্রেস, কেঁওঝড়।

৯. পুষ্পমালা (কাব্য) ; প্রথম সংস্করণ ১৮৯৪ ; কটক প্রিন্টিং কোম্পানী প্রেস, কটক।

১০. উপহার (কাব্য) ; প্রথম সংস্করণ, ১৮৯৫ ; রায় প্রেস, কটক।

১১. ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ (উপন্যাস) ; প্রথম সংস্করণ ১৯০২ ; উৎকল সাহিত্য প্রেস, কটক।

১২. খিল হরিবংশ (পদ্যানুবাদ) ; প্রথম সংস্করণ ১৯০২ ; উৎকল সাহিত্য প্রেস, কটক।

১৩. উপনিষদ্ সংগ্রহ (পদ্যানুবাদ) ; প্রথম সংস্করণ ১৯০৫ ; উৎকল সাহিত্য প্রেস, কটক।

১৪. অবসরবাসরে (কাব্য) ; প্রথম সংস্করণ ১৯০৮ ; কটক প্রিন্টিং কোম্পানী প্রেস, কটক।

১৫. বৌদ্ধাবতার কাব্য (কাব্য) ; প্রথম সংস্করণ ১৯০৯ ; দেংক উৎকল প্রেস, বালেশ্বর।

১৬. পুনর্মূষিকো ভব (উপন্যাস) ; প্রথম সংস্করণ, ১৯০৯ ; মুকুর প্রেস, কটক।

১৭. পূজাফুল (কাব্য) ; প্রথম সংস্করণ, ১৯১২ ; কলিকতা উৎকল প্রেস।

১৮. প্রার্থনা (সংগীত) ; চতুর্থ সংস্করণ, ১৯১২ ; সামন্ত প্রেস, বালেশ্বর।

১৯. ধূলি (কাব্য) ; প্রথম সংস্করণ, ১৯১২ ; মুকুর প্রেস, কটক।

২০. মামু (উপন্যাস) ; প্রথম সংস্করণ ১৯১৩ ; উৎকল সাহিত্য প্রেস, কটক।

২১. রাত্তিপুঅ অনন্তা (গল্প) ; প্রথম সংস্করণ ১৯১৩ ; মুকুর প্রেস, কটক।

২২. লছমা (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ; প্রথম সংস্করণ, ১৯১৪ ; মুকুর প্রেস, কটক।

২৩. ব্রাহ্মণানাং সন্ধ্যাপদ্ধতিঃ ; প্রথম সংস্করণ ১৯১৪ ; উৎকল সাহিত্য প্রেস, কটক।

২৪. প্রায়শ্চিত্ত (উপন্যাস) ; প্রথম সংস্করণ, ১৯১৫ ; উৎকল সাহিত্য প্রেস, কটক।

২৫. সমবায়-ঋণ-সমিতি-প্রসঙ্গ (পদ্যানুবাদ) ; প্রথম সংস্করণ ১৯১৬ ; উৎকল সাহিত্য প্রেস, কটক।

২৬. ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (পদ্যানুবাদ ; ছান্দোগ্য উপনিষদের সমগ্র বা অবিকল অনুবাদ নয়। বংলা ভাষায় রচিত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্যের 'উপনিষদের উপদেশ' গ্রন্থ অবলম্বনে ছান্দোগ্য উপনিষদের কয়েকটি উপন্যাসের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ) ; প্রথম সংস্করণ ১৯১৬ ; উৎকল সাহিত্য প্রেস, কটক।

২৭. গল্প স্বল্প (স্মৃতিমূলক ও কল্পিত কাহিনীর সংকলন) ; প্রথম সংস্করণ ১৯১৭ ; উৎকল সাহিত্য প্রেস, কটক। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থটি সম্ভবতঃ একখণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল। পরে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ; প্রথম ভাগ অষ্টম মুদ্রণ, ১৯৬৭ ; কটক স্টুডেণ্ট্স্ স্টোর, কটক ; দ্বিতীয় ভাগ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৬৫ ; কটক স্টুডেণ্ট্স্ স্টোর, কটক।

২৮. আত্মজীবনচরিত ; প্রথম সংস্করণ, ১৯১৭ ; শ্রীরাধানাথ কো-অপারেটিভ্ প্রেস, কটক।

সংকলয়িতার মন্তব্য

প্রায় প্রতিটি ভারতীয় ভাষার গদ্যসাহিত্যের আদিযুগ পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়— গদ্যরচনার প্রাথমিক বাহন দুটি : ১. অনুবাদ ২. পাঠ্য পুস্তক। অনুবাদ সাধারণতঃ করা হত সংস্কৃত, ফার্সী, ইংরেজি ও অধিকতর অগ্রসর কোনো আঞ্চলিক ভাষা থেকে। আর নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রবর্গের চাহিদা মেটাবার জন্য রচিত হত পাঠ্য পুস্তক। ওড়িয়া সাহিত্য এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। ফকীরমোহনের

সুদীর্ঘ রচনা-তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তা বোঝা যায়। তাঁর মৌলিক প্রতিভাকে অস্বীকার করবার সাধ্য কোনো সমালোচকেরই নেই। কিন্তু তাঁর মতো প্রতিভাধরকেও বহুল পরিমাণে অনুবাদ ও পাঠ্যপুস্তক রচনার পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। অনুবাদ মূলতঃ সংস্কৃত ও কিঞ্চিৎ বাঙ্‌লার ভাণ্ডার থেকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিত' (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৯)-এর ওড়িয়া অনুবাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যের পথে যাত্রারম্ভ। তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যের অনুরাগী হলেও—বাঙ্‌লা থেকে সরাসরি অনুবাদের দৃষ্টান্ত তাঁর রচনার মধ্যে এই একটিই। অন্য যে দুখানি গ্রন্থ রচনায় তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্য থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়— তা হল 'বৌদ্ধাবতার কাব্য' (১৯০৯) এবং 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্' (১৯১৬)। প্রথমখানি বাঙালী কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ'-এর অবিকল অনুবাদ না হলেও সে গ্রন্থ দ্বারা সম্ভবতঃ কিয়ৎ পরিমাণে অনুপ্রেরিত। দ্বিতীয়টির আকর হল পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী-প্রণীত বাঙ্‌লা গ্রন্থ 'উপনিষদের উপদেশ'; ফকীরমোহন ভূমিকায় এ কথা স্বীকার করেছেন। হয়তো সংক্ষিপ্ত 'উৎকল-ভ্রমণম্' (১৮৯২)-এর উপর দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্য'-এর প্রভাব আবিষ্কার করা অসম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু সংস্কৃত থেকে তাঁর অনুবাদের পরিমাণ বিস্ময়কররূপে বিপুল। সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারতের প্রকাশিত প্রথম চার পর্ব (অন্যান্য পর্বও অনূদিত হয়েছিল যদিও প্রকাশিত হয় নি), হরিবংশ, গীতা, উপনিষদ্— একক প্রচেষ্টার এই অনুপম সিদ্ধির কথা চিন্তা করলে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয়। ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত 'ব্যাসকবি' বিরুধটি তাঁর বিস্ময়বিমুগ্ধ পাঠক সমাজের আন্তরিক শ্রদ্ধারই নিদর্শন। এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগই প্রকাশ পেয়েছে সমসাময়িক বয়ঃকনিষ্ঠ ভক্ত কবি মধুসূদন রাও-এর ছন্দোবদ্ধ প্রশস্তিতে :

জন্মভূমি উৎকলর পরম ভকত !
সুক্ষণে জনম তব আহে পুণ্যব্রত !
আদি কবি বাল্মীকি কবিকুলধন,
কবিগুরু সত্যবতীসুত দ্বৈপায়ন,

উভয়ে বিমল তব ভক্তি দরশনে
দেইছন্তি মহাদরে সুপ্রসন্ন মনে
নিজ নিজ বিশ্বজিণা বীণা তব করে ;
সে বীণা বজাই গাউঅছ আনন্দরে
পুণ্য রামায়ণ মহাভারতর কথা
গম্ভীর মধুর কেতে অমৃত বারতা।
সরল তরল তব সংগীত-তরংগে
হরষে ভসাঅ কবি নানা রসরংগে
উৎকল-ধরণীজন হৃদয়তরণী
ধন্য হেউ বিভুবরে তব সুলেখনী।

(বসন্তগাথা : 'কবি শ্রীফকীরমোহন সেনাপতি')

নিছক পাঠ্যপুস্তকের উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থতালিকায় দুটি নাম করা যায়—'ভারতবর্ষর ইতিহাস' ও 'অঙ্কমালা'। বাদবাকী তাঁর প্রায় সকল রচনাই মৌলিক কথাসাহিত্য ও কাব্যের পর্যায়ভুক্ত। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের ক্লাসিকাল পর্বে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—সমালোচকগণ এ-বিষয়ে একমত। তালিকাভুক্ত দুটি পুস্তিকা উল্লিখিত কোনো বিভাগেরই অন্তর্গত নয়। ব্রাহ্মণানাং সন্ধ্যাপদ্ধতি : মৌলিক রচনা নয় ; প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মার্থীদের নিত্যকর্মে ব্যবহৃত কতগুলি সংস্কৃত মন্ত্রের সংকলন। লক্ষ্য করবার বিষয়, মন্ত্রগুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ থেকেই অধিকাংশ নেওয়া হয়েছে ; নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত 'নমোঽকিঞ্চননাথায়' শীর্ষক শ্লোকটিও এই গ্রন্থভুক্ত। দু-চার ছত্র নির্দেশ ভিন্ন ওড়িয়া ভাষার ব্যবহার কোথাও নেই। গ্রন্থসমাপ্তি হয়েছে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় ব্যবহৃত সুপরিচিত 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' মন্ত্র দ্বারা। পুস্তিকাটি ফকীরমোহনের ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসের নিদর্শন। ছড়ায় লেখা 'সমবায়-ঋণ-সমিতি-প্রসঙ্গে' গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর ছলে লেখা সমবায়-আন্দোলনকে জনপ্রিয় করবার জন্য হাল্‌কা-মেজাজের রচনা। ফকীরমোহনের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকের এই প্রচেষ্টা আমাদের কৌতূহল

ও কৌতুক উদ্দীপ্ত করে সন্দেহ নেই। এর একটু নমুনা দেখলে বোঝা যাবে হালকা চালের ছড়া রচনায় লেখক কি পরিমাণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন :

শিষ্য— শিষ্য পুচ্ছা কলা গুরুংকু চাহিঁ,
কথাএ পুচ্ছিবি বোল গোসাইঁ ;
সমিতি নাম যে যাউছি শুণা,
এ বিষয় কিছি ন গলা জণা।
এহি সমিতির কিবা উদ্দেশ্য,
কিবা সে লোড়ই বোলি বিশেষ।

গুরু— শিষ্য কথা শুণি বোইলে গুরু,
বোলিবুঁ সে কথা যাহা পচারু।
যে কথা ন বুঝি হেউছু বণা,
সে সমস্ত কথা আস্তকু জণা।
সমিতিরে যেতে থিবেটি সভ্য,
সেমানংক হেব যেপরি লাভ ;
যে উপায়ে হেবে রুণরু মুক্ত
বঢ়িব তাহাংক ধন বহুত ;
যেপরি করিবে ধন সঞ্চয়,
সমিতি তাহার করে উপায়।
সমিতির অভিপ্রায় অসল--
লোকংকর হেব যেপরি ভল।

ইত্যাদি।

বর্তমান গ্রন্থতালিকাটি সর্বত্র কালানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত নয়। রামায়ণ ও মহাভারতের খণ্ড-খণ্ড অনুবাদগুলি একত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণে বিভিন্ন খণ্ডের মাঝখানে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ তালিকায় নীচের দিকে চলে এসেছে। তবে সর্বত্র সংস্করণ ও সালের উল্লেখ থাকায় আশা করি কালক্রমের ধারণা করতে অসুবিধা হবে না।

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

গ্রন্থে কতকগুলি ওড়িয়া শব্দ বঙ্গানুবাদে বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙালী পাঠকের সুবিধার্থে সেগুলির বাংলা অর্থ দেওয়া গেল :

অহিরাজ	অজগর সাপ
ওসার	চওড়া
চাঙ্গু	মাদল
ছেলা	ছালা
তিঅর	ধীবর
নিজগড়	সদর, রাজধানী
পঞ্জিয়া	হিসাবনবিশ
পাখলোক	পার্শ্বচর
বিজে	সমাসীন, আবির্ভূত
মণিমা	ঠাকুরানী, প্রভু
শ্রীছামু	মহামহিম

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	
৩৭	৯	'আধুনিক কবি' স্থলে 'উপস্থিত কবি বা দ্রুত কবি'
৪৯	১৫	'ডানা' স্থলে 'ছানা'
৫১	৭	'ন অচেক' স্থলে 'ন'অঙ্কে'
		'১৮৬৩' স্থলে '১৮৬৬'
৭৫	৩	'সম্বাদবাহিকা' স্থলে সম্বাদবাহিকা'
৮২	১৬	'শ্যামানন্দদের' স্থলে 'শ্যামানন্দ দে'র'
১৩১	৯	'স্বল্পমেধাবিশিষ্ঠ' স্থলে 'স্বল্পমেধাবিশিষ্ট'
১৫০	১৫ পাদটীকা	'পেগুরা' স্থলে 'পেণ্ডরা'
১৮১	পাদটীকা	'পাখের লোক' স্থলে 'পাশের লোক'
১৮৪	১৭	'হালটা' স্থলে 'চালটা'
২৫১	১৩	'সিংহভূমি' স্থলে 'সিংভূম'
২৫৭	১৫	'Blliot' স্থলে 'Elliot'
২৬৪	২	'নাভিকুলে' স্থলে 'নাভিফুলে'